পলাশীর পর বক্‌সার

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম প্রকাশ / ৬ আশ্বিন ১৩৬৭ ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কো° (প্রাইভেট) লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

বাঁধাই
তৈফুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

ামার পলাশীর যুদ্ধ বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞ সমালোচক ইঙ্গিত করেছিলেন াখ্যানটিকে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে আরো ভালো হত। কথাটার তাৎপর্য বাধ করি এই যে, বকসার আর পলাশীর যুদ্ধ পরস্পরের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যে, ভয়ে মিলে আসলে একটিই মাত্র পর্ব, একটি অপরটির স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু সম্বন্ধ যতই নকট হোক না কেন, রাজতন্ত্রের দিক থেকে মাপ করতে বসলে সহজেই ধরা পড়ে যায়, লাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেকখানি বেশি।

বক্সার-যুদ্ধের পর থেকেই, নামে না হলেও কাজে, ইংরেজরাই বঙ্গদেশের রাজা হয়ে সলেন। তার কারণ এই যে, যাঁর হাতে রাজস্ব-আদায়ের ভার তিনিই তো রাজশক্তির যথার্থ রক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুবে বাংলার াজভাণ্ডারের চাবিকাঠি ইংরেজদেরই হাতে এসে পড়ল। সেটা আসে বক্সার-যুদ্ধের ঠিক ন-মাস নিশ দিন পরে, আর ঐ যুদ্ধজয়েরই ফলে। পলাশীর যুদ্ধ জিতে ইংরেজরা বঙ্গদেশে মুসলমান াজত্বের বনেদ ভেঙে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাহলেও তখনো নিজেরা রাজদণ্ড ধারণ করেননি, ণিকের মানদণ্ডই হাতে ধরে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। দেওয়ানি পাবার খানিক পরে রা প্রকাশ্যেই রাজবেশ ধারণ করে বার হবার উপক্রম করলেন; বঙ্গদেশে আসন পাকা করে নয়ে, আস্তে আস্তে বঙ্গের বাইরেও তাঁদের প্রতিপত্তি বিস্তারে মন লাগালেন। তখন আর ল্পতে সুখ নাই, ক্ষুধা এমনি প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সর্বগ্রাস না করে সে-ক্ষুধা আর মিটতে য় না।

পলাশী আর বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি নয়, মাত্র সাত বছর চার মাস। কন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশে ইংরেজদের পরাক্রম এমন প্রবলবেগে বেড়ে উঠেছিল যে, াকে দমিয়ে রাখবার ক্ষমতা কি স্বদেশী কি বিদেশী কারো হাতেই আর রইল না। নবাব ীর কাশিম ইংরেজদের ঐ আগে-বাড়াব পথ রোধ করে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কন্তু তাঁর সে-চেষ্টা সফল হয়নি। সেই কারণে বঙ্গদেশের ঐ কয় বছরের ইতিহাস এক প্রকাণ্ড র্থতারই বৃত্তান্ত হয়ে রয়ে গেছে।

'পলাশীর যুদ্ধ'র মতো আমার এই গ্রন্থটিও যদি পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয় হলে কৃতার্থ বোধ করব।

গ্রন্থকার

এই লেখকের :

পলাশীর যুদ্ধ

॥ এক ॥

পলাশীর যুদ্ধ তো হয়েবয়ে চুকে গেল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। তাঁর জায়গায় মীর জাফর নবাব হয়ে বাংলার মসনদে চড়ে বসলেন। এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন রহস্য করে লিখেছেন—আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় মীর জাফরকে বিছানা থেকে টেনে তুলে তাঁর শোবার ঘর থেকে উঠিয়ে দরবারখানায় এনে ফেলা হল। জেগে উঠে চোখ কচলে তিনি দেখলেন, তিনি বাংলার মসনদে বসে। রাজা বনা সোজা, রাজত্ব করাটা কিন্তু মোটেই তামাশার ব্যাপার নয়। ঐখানেই তো হল যত বিপদ।

যৌবনকালে মীর জাফর যোদ্ধা ছিলেন ভালোই, রণকৌশলও বুঝতেন বেশ। কিন্তু এক সময় তার শরীরে যে শক্তি ছিল সেটা ক্ষয়ে এখন অনেক কমতি হয়ে এসেছে। হবারই কথা, কারণ বয়েস তো হল চৌষট্টি পঁয়ষট্টি, তার উপর হরদম নেশাভাঙ, বেধড়ক স্ত্রীসম্ভোগ, আরো অনেক রকমের নোংরামি কাণ্ড। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও মীর জাফরের প্রবৃত্তি ইতরের মতো। গোলাম হোসেন লিখেছেন—মীর জাফর ছোটলোকের মতো তেলেভাজা গরুর মাংস রসিয়ে রসিয়ে খেতে ভালবাসতেন। তখনকার দিনের এদেশী কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান গরুর মাংস খেতেন না। মীর জাফর লেখাপড়ার ধার আদবেই ধারতেন না, রাজকার্যেও যে তাঁর কোনো শিক্ষাদীক্ষা ছিল তা তো কোথাও পড়া যায়নি। আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁকে রাজ্যচালনা-সংক্রান্ত কোনো কাজের ভার কখনো দেননি। আলীবর্দী লোকচরিত্র খুব ভালোই বুঝতেন, যার কাজ যাকে সাজে তিনি সেই কাজ তাকেই দিতেন। মীর জাফরকে তিনি একটু দূরে ঠেলেই রেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে মাখামাখি মোটেই ছিল না।

মীর জাফরের রাজকর্ম চালাবার পথে আর-এক বাধা ছিল। সেটি তাঁর সুযোগ্য পুত্র মীরন, যাঁর পোশাকী নাম মীর সাদেক আলী খাঁ। পৃথিবীতে এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যাতে মীরন পোক্ত না ছিলেন, কি যার থেকে তিনি কখনো পেছপাও হতেন। নরহত্যায় তাঁর দানবীয় আমোদ। তাঁর

কাছে কেউই অবধ্য নয়, তা সে কি ছেলে আর কি বুড়ো আর কিম্বা অবলা স্ত্রীজাতি। বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু ঘটবার পর তাঁর জোব্বার জেব থেকে একটা ছোট নোটবুক পাওয়া যায়। শোনা যায়, এতে নাকি পর-পর তিনশো লোকের নাম টোকা ছিল, যাদের মীরন একে একে খুন করা সাব্যস্ত করেছিলেন। তিনি ইয়ারবর্গকে ডেকে প্রকাশ্যেই বলতেন—আগে তো উপস্থিত যুদ্ধবিগ্রহ খানিকটা ঠাণ্ডা হোক, তারপর এদের সবাইকে একবার দেখে নেব। তখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে গা ঢেলে দেব। তখনই তো ইয়ারকি জমবে ভালো।

সিরাজউদ্দৌলা তাঁর মাতামহ আলীবর্দী খাঁর যেমন দুষ্টগ্রহ ছিলেন ঠিক তেমনই শনি ছিলেন মীরন তাঁর পিতা মীর জাফরের। অলস নেশাখোর দুর্বলচিত্ত মীর জাফর তাঁর এই দুর্দান্ত পুত্রের প্রভাব কিছুতেই এড়াতে পারতেন না। ফলে মীরনের অপকার্তির অধিকাংশই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়ার মতো মীর জাফরের স্কন্ধে এসে পড়েছে। সমসাময়িক লোকেরা সব সময় মাথা ঠিক রেখে বিচার করে উঠতে পারেননি, সব দোষটাই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো মীর জাফরের উপরই চাপিয়ে গিয়েছেন। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে যাঁদের ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে শোনা গিয়েছিল তাঁদেরই আবার এখন বলতে শোনা গেল যে, সে-আমলে তাঁরা এর চেয়ে ঢের সুখে ছিলেন। মীর জাফরের তুলনায় সিরাজকে তাঁদের পীর-পয়গম্বর বলে ভ্রম হতে লাগল। তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে তাঁর উপর কেমন যেন একটা মায়া উথলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত আক্রোশ ঠিক সেই পরিমাণ বেগে গিয়ে পড়তে লাগল নবাব মীর জাফরের উপর। মানুষের স্বভাবই এই—গত দুঃখকে সে দুদিনেই ভুলে বসে, আগত দুঃখকে তার চতুর্গুণ বড় করে দেখতে থাকে।

আরো-একটা ব্যাপার ছিল। মীর জাফর বাংলার নবাবী গদি পাবার লোভে হিতাহিত জ্ঞান একেবারে হারিয়ে বসেছিলেন। না-বুঝে না-সুঝে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লেনদেনের অঙ্কটা বেশ একটু লম্বাচওড়া রকমেরই ধরে দিয়েছিলেন। এরকম ক্ষেত্রে সবাই যেমন ভেবে থাকে তিনিও সেইরকমই ভেবে নিয়েছিলেন—অর্থাৎ ধরে নিয়েছিলেন যে, এখানকার ইংরেজদের কর্তা কর্নেল ক্লাইভকে খুশি রাখতে পারলেই তিনি রেহাই পেয়ে যাবেন, কোম্পানীকে দেয় টাকাটা সত্যি সত্যি দিতে হবে না, ওটা কাগজকলমেই রইল। এইরকমটাই তো পুর্বে পুর্বে এদেশে সর্বত্রই ঘটে এসেছে। লুঠপাঠ মারপিট করেই যে খা

পাবার তাই পেয়েছে, আপসে সন্ধিচুক্তি করে কেউই সবটা পুরোপুরি কখনো পায়নি। ইংরেজদের সবেতেই যে বিপরীত কাণ্ড, সেটা বেচারী মীর জাফর আগের থেকে জানবেনই বা কি করে? একটা ব্যবসাদার কোম্পানী যে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে রাজ্য ফাঁদবার তালে আছে, সে-কথা অনেক মাথাওয়ালা লোকও তখন ভালো করে বুঝে উঠতে পারেননি, বুড়ো মীর জাফর তো কোন ছার। তাছাড়া এসব বিষয়ে তাঁর মাথাটা যে খুব পরিষ্কার ছিল, সে-কথা তো কোনো ইতিহাসের পুঁথিতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

তবে ক্লাইভকে খুশি করবার সবকটা উপায়ই মীর জাফর আঁকড়ে ধরেছিলেন, একটাকেও বাদ দেননি। কিন্তু এখানেও টুপিওয়ালাদের এক অদ্ভুত রীতি। ক্লাইভ কর্তা হয়েও সর্বময় কর্তা নন। আরো অনেক কেষ্টবিষ্টু আছেন, তাঁদেরও যথাযোগ্য প্রণামী না দিলে কাজ হাসিল হয় না। আবার সবাই টাকা নিয়ে অম্লানবদনে সেটা পকেটে পোরেন, কিন্তু কোম্পানীর টাকার একটু নড়চড় হলেই হুঙ্কার ছাড়তে আরম্ভ করে দেন। হাতে টাকা নেই বললে, মুখ বেঁকিয়ে মুখের উপরই জবাব দিয়ে বসেন—ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। মীর জাফরের একূল ওকূল দুকূল ভাসবার উপক্রম হল।

সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষ লুঠ করে যা পাওয়া গিয়েছিল সবই নৌকো-বোঝাই করে কলকাতা চালান দেওয়া হল। তা সে পাঁচ-সাতটা নৌকো নয়, গোনাগুন্তি দুশো। মালের নৌকো তদারকের জন্যে বাদশাহী সড়কের উপর দিয়ে বিলিতি ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মার্চ করতে করতে ইংরেজ অফিসারদের তাঁবে চলল একরাশ দেশী সেপাইশাস্ত্রী। চুঁচড়ো চন্দননগরের ভিতর দিয়ে তারা যখন যাচ্ছে তখন ডাচ্ আর ফ্রেঞ্চদের বছরখানেক আগেকার কথা মনে পড়ে গেল—কলকাতা লুঠ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঠিক এমনি করে বুক ফুলিয়ে দামামা বাজাতে বাজাতে এই পথ দিয়েই তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে চলেছিলেন।

টাকার নৌকো কলকাতা পৌঁছতে সেখানকার লোকেদের মুখে হাসি আর ধরে না। সমস্ত খুইয়ে ইংরেজরা এতদিন নিঝুম হয়ে একটেরে পড়েছিল। এখন টাকার চেহারা দেখে চাঙা হয়ে উঠে বিষম মাতামাতি লাগিয়ে দিল। গোরাপল্টনরা তো যা টাকা কখনো চোখে দেখেনি সেই পরিমাণ টাকা এক সঙ্গে হাতে পেয়ে পিপে-পিপে মদ টেনে এমনই বেপরওয়া বেলেল্লাগিরি লাগিয়ে দিল যে তার ফলে ইংরেজ ফৌজের অর্ধেকের উপর লোক যে যেখানে ছিল সেইখানেই মাটি আঁকড়ে পড়ল, তেড়েফুঁড়ে কাউকে আর উঠতে হল না।

ক্লাইভ কিন্তু কাজ ভোলবার পাত্র নন। এত হৈহুল্লোড়ের মধ্যে কোম্পানীর টাকা আদায়ের জন্যে তিনি মীর জাফরকে তাগাদার উপর তাগাদা দিতে লাগলেন। কিন্তু সুবিধা তেমন করতে না পেরে শেষে স্টেট ব্যাংকার জগৎশেঠদের মুরুব্বী পাকড়ালেন। অনেক ধস্তাধস্তির পর রফা হল যে কড়ারের টাকার অর্ধেক তখনি তখনি নগদে আর সোনাদানায়, বাকি অর্ধেক তিন বছরের মেয়াদে সমান কিস্তিতে দেওয়া হবে। এই হিড়িকে মীর জাফরের প্রধানমন্ত্রী রায় দুর্লভরাম নিজের দস্তুরির ব্যাপারটারও একটা ব্যবস্থা করে নিতে ভুললেন না, পিছন দিক থেকে তিনিও বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে তুষ্ট না করে উপায় নেই, কারণ তাঁর হাত দিয়েই যত সরকারী টাকার আনাগোনা। ঠিক হল যে, ইংরেজরা যে-টাকা আদায় পাবেন মুখ্যমন্ত্রী তার উপর শতকরা পাঁচ টাকা করে কমিশন কেটে নেবেন।

মীর জাফর বাংলার গদি পেতে-না-পেতেই তাঁর আত্মীয়কুটুম্ব যে যেখানে ছিলেন সকলেই কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় একে একে মুর্শিদাবাদে এসে জমায়েত হতে লাগলেন। যাঁরা দূরে বসেই শুধু মনে মনে মীর জাফরের নবাবি পাবার শুভকামনা করেছিলেন তাঁরাও আর-কিছু না হোক এক-একটা সরকারী চাকরি দাবি করে বসলেন। চাকরি দেওয়া তো অনেক দূরের কথা, মীর জাফর টাকাটা-সিকেটাও কাউকে প্রাণ ধরে দিতে পারলেন না। নবাব বনলে কি হয়, মীর জাফরের মন-মেজাজ কোনো কালেই নবাবী ধরনের দরাজ ছিল না। পূর্বে সামান্য যেটুকু দানধ্যান ছিল নবাব হতে তাও গেল। বন্ধুবান্ধবরা এই নিয়ে অনুযোগ করতে থাকলে তিনি বলতেন, আগে নদী ছিল নবাব আলীবর্দী খাঁর। সেই নদী থেকেই জল তুলে আমি লোককে জল দান করতুম—ফুরোবার ভাবনা-চিন্তা আমার ছিল না। এখন নদী আমার। কখন যে নদী শুখোয়, জল ফুরোয়—এই হল এখন আমার মস্ত মাথাব্যথা।

ক্লাইভ যে ফাঁদ পেতেছিলেন মীর জাফর তাতেই পা দিয়ে বসলেন। আর না দিয়েই বা যান কোথায়? রাজভাণ্ডার উপুড় করে ঝেড়ে-ঝুড়ে সবই তো ইংরেজদের দিতে হয়েছে। টাকার অভাবে সৈন্যসামন্তের মাইনে আর দিতে পারা যাচ্ছে না, তারা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। প্রার্থীরা বিমুখ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে যে মীর জাফরের জয়গান করতে বসে গেলেন না, এ-কথা বলাই বাহুল্য। বরঞ্চ উলটে বিদেশী বণিকদের সাহায্যে নবাবী গদি দখল করার জন্যে তাঁরা মীর জাফরের বদনামই রটাতে লাগলেন। বলে বেড়ালেন, বাংলাদেশে পূর্বে কেউ যা কখনো করেননি, মীর জাফর কিনা তাই করলেন।

ভাঁড়ের রাজা মীর্জা শামসুদ্দীন তো মীর জাফরের এক নতুন নামকরণই করে ফেললেন—কর্নেল-সাহেবের মদ্দা গাধা।

খরচ কমাবার জন্যে মীর জাফরকে অধিকাংশ সৈন্য বরখাস্ত করে দিতে হল। রাজ্যরক্ষার জন্যে নির্ভর করতে হল ঐ ইংরেজদেরই উপর। আপদ-বিপদে পদে পদে ডাক পড়তে লাগল ইংরেজ গোরাদের আর ইংরেজদেরই তাঁবেদার দেশী লাল পল্টনদের। মীর জাফর ভেবেছিলেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—ইংরেজ-কাঁটা দিয়ে তিনি সিরাজ-কাঁটা তুলবেন, কণ্টকোদ্ধার হলেই তিনি গাঙ পেরিয়ে কুমিরকে কলা দেখাবেন। তারপর মনের সুখে নবাবি। কিন্তু কাঁটা যে চিরকালের মতো গলায় বিঁধে থাকবে, সে-কথা কে ভেবেছিল? যে-ফাঁস মীর জাফর স্বহস্তে গলায় লাগালেন সে যে একেবারে নাগপাশ, একটু এদিক-ওদিক করলেই আরো চেপে বসে। ফাঁসকলে বাঁধা পড়ে মীর জাফর যতই ছটফট করেন ইংরেজদের প্রতিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে ততই বেড়ে যেতে থাকে।

এতদিন শুধু কারবারী লোক বলে এদেশের মানুষরা ইংরেজদের খানিকটা অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে। এখন চাকা উল্টে গেল। তাই একদিন যাঁদের নিজেদের ব্যবসার সামান্য একটু সুবিধা করে নেবার জন্যে রাজধানীতে গিয়ে নবাব উজীর আমীর ওমরাহ দেওয়ান বক্সীর দরবারে ধন্না দিয়ে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হত এখন সেই ইংরেজদেরই কাছে এঁদের সবাইকে ছুটতে হচ্ছে। পলাশীর যুদ্ধ জেতবার দরুন ইংরেজের ভয়ে সবাই থরহরি কম্প। তাঁদের প্রসন্নমুখ দেখবার জন্যে সর্বত্র হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এদেশের লোকেদের কাছে ক্লাইভই ইংরেজ-শক্তির প্রতীক। তাঁরা কাউন্সিল সিলেক্ট কমিটি গভর্নর প্রেসিডেণ্ট—এসব কিছুই বোঝেন না, জানেন শুধু একা কর্নেল ক্লাইভকে, যিনি পলাশীর যুদ্ধ জিতেছিলেন। তাই রামনামের মতো ক্লাইভের নাম আপামর সবাইকারই মুখে।

দেনার জ্বালায় অস্থির হয়ে মীর জাফর সেই সাবেকী চাল ধরলেন—অর্থাৎ যার হাতে টাকা আছে তারই উপর হুকুম করলেন—হয় টাকা বের কর, নচেৎ জাহান্নমে যাও। বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যাঁরা এতদিন আরাম করে বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে ছিলেন তাঁরা সকলেই আল্লা আল্লা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। তবে এসব নিতান্ত মামুলি ব্যাপার। সকলেই জানতেন ধন মান উচ্চপদ সবই দুদিনের খেলা, কে যে কখন শক্তিমান হয়ে উঠে সেসব ছিনিয়ে নেয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সুতরাং তাঁরা এখন মীর জাফরের হাতে নাকাল হতে ক্লাইভের শরণাপন্ন হলেন। প্রথম চোটটা হিন্দুদেরই উপর পড়ল। ক্লাইভও

তাঁদের মাভৈঃ বলে আশ্বাস দিয়ে তাঁদের মুরুব্বী হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁদের হয়ে মীর জাফরের সঙ্গে লেগে পড়লেন।

অবস্থাটা যা দাঁড়াল সেটা ক্লাইভেরই সৃষ্টি করা। কিন্তু পাছে লোকের এ-দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই জন্যে আসল ব্যাপারটা চাপা দিয়ে ক্লাইভ রটিয়ে দিলেন যে, মীর জাফর ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী, তিনি পণ করেছেন, হিন্দু রাজকর্মচারী আর রাখবেনই না—সমস্ত বড় বড় পদ থেকে হিন্দুদের হটিয়ে মুসলমানদের বসাবেন। শুধু তাই নয়, আরো প্রচার করতে লাগলেন—একমাত্র ভয় ছাড়া মুসলমানরা আর কিছুরই বশ নন, তাঁরা বোঝেন শুধু গায়ের জোর, তাঁদের কাছে না আছে ন্যায়ধর্মের বন্ধন, না আছে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন, না আছে আত্মীয়কুটুম্বিতার বন্ধন। কৃতজ্ঞতার বালাই তাঁদের নেই বললেই চলে। যে-হাত বরাবর খাইয়ে এসেছে সেই হাতকেই কেটে উড়িয়ে দিতে তাঁদের মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা-সংকোচ হয় না। হিটলারের জন্মাবার বহু পূর্বেই ক্লাইভ জানতেন যে, সত্য মিথ্যারই আর-এক নাম। মিথ্যাকে জোর গলায় বার-বার প্রচার করতে পারলেই তা সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আসলে দুইয়ের মধ্যে তফাত কিছুই নেই, শুধু লোককে বিশ্বাস করাতে পারলেই হল। মিথ্যাকে লোকের মনে সত্য বলে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে পারলে সেইটেই হয় সত্য, আবার সত্যকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করাতে পারলে সত্য হয়ে দাঁড়ায় মিথ্যা। তাইতেই তো দেখা যাচ্ছে পরের পর বহুদিন ধরে মস্ত বড় বড় ঐতিহাসিকেরাও ক্লাইভের এইসব উক্তিকে সত্য মনে করে তাদের পুনরাবৃত্তি করে ছাপার অক্ষরে লিখে গেছেন।

তাহলে কথাটা আর-একটু খোলসা করে বলতে হয়। নানা কারণে আলীবর্দী খাঁ দেশী মুসলমানদের ততটা বিশ্বাস করতে পারতেন না বলে তাঁর আমলে অনেক হিন্দুই বড় বড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরা যে টাকা মাইনে আর উপরিতে পেতেন তার সবটা খরচ করতেন না, খানিক জমাতেন। ঐ কারণে ক্রমে ক্রমে তাঁদের হাতে ধনদৌলত বৃদ্ধি পেতে লাগল। টাকার খাঁকতি হতেই মীর জাফরের দৃষ্টি প্রথমেই তাঁদেরই উপর পড়েছিল। কিন্তু সেটা হিন্দুবিদ্বেষের ফলে মোটেই নয়। মুসলমানদেরও যাঁরা বড় পদে ছিলেন তাঁদেরও উপর অত্যাচার বড় কম হয়নি। সাদা কথা এই যে, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ তখনো একটা প্রবলেমের আকার ধারণ করেনি, ওসব ব্যাপার তখনো কারো মাথায় ঢোকেনি। কারণ অনেক দিন ধরে বহু অনাচার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে আসাতে হিন্দুদের কাছে ওসব গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। মাত্রা বেশি হয়ে উঠলে পিঠে একটার উপর আর একটা কুজো

চাপিয়ে তাঁরা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকতেন, বিদ্বেষ করার মতো সামর্থ্যটুকুও তাঁদের ছিল না। নিরুপায়ের এই একান্ত উপায়হীনতাকেই বেশির ভাগ লোকে সহনশীলতা বলে মনে করে নেন। ইংরেজরা এরই নাম দেন—টলারেশন।

পলিটিক্সে এই ভেদনীতির আমদানি করেন ইংরেজরাই। ক্লাইভ এর সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর পরবর্তী গভর্নর ভাইসরয় সকলেই এটাতে ইতরবিশেষ ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। অথচ কার্যকালে যখনই এই নীতির ফল এক কদর্য আকার ধারণ করেছে তখনই তাঁরা সাফাই গেয়ে দোষটা কখনো হিন্দুর ঘাড়ে কখনো মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে বেশ আরাম বোধ করে গেছেন। মীর জাফর নবাব হয়ে সরকারী কাজ যাঁদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন তাঁদের নামের ফিরিস্তির উপর শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। দুটো বড় সরকারী কাজে মীর জাফর তাঁর যে দুই অন্তরঙ্গ পারিষদকে বসিয়েছিলেন -যাঁদের জ্বালায় তাঁর সমস্ত প্রজা অস্থির হয়ে উঠে-ছিলেন তাঁদের একজনের নাম মুনিলাল আর একজনের নাম চুনিলাল। নাম শুনে তাঁদের অহিন্দু বলে যে কারো সন্দেহ হতে পারে সেটা তো বিশ্বাস হয় না।

তবে একটা কথা এই সঙ্গে বলে নেওয়া দরকার। হিন্দু রাজকর্মচারীরা বেশ বুঝতে পারছিলেন বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়ে এল, সারা ভারতেও 'অভিনব জাতের সাহেবলোকদের' রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হতে বড় বেশি দেরি নেই। এটা তাঁদের বিচক্ষণতার বলে কি দূরদৃষ্টির ফলে, সেটা ঠিক বোঝা না গেলেও, ইতিহাসের স্রোত যে কোন দিকে বইতে লেগেছে তা তাঁরা বিলক্ষণ ধরতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের এই সত্যটা ভালো করে সমঝে উঠতে আরো-অনেকটা সময় লেগেছিল—বড় সহজে হয়নি। ফলে নবাবের নিমক খেয়েও তাঁর হিন্দু কর্মচারীরা ইংরেজকেই নিজেদের রক্ষাকর্তা বলে মনে করতে লাগলেন। এটা তো চাকরিরই একটা অঙ্গ। চাকরিতে কেউ কখনো অস্তগামী সূর্যের ভজনা করে না, উদীয়মান রবিরই অর্চনা করে। ক্লাইভ মুসলমানদের সম্বন্ধে যে কটূকাটব্যগুলো করে গেছেন সে কি শুধু মুসলমানদের সম্বন্ধেই বলা চলে? হিন্দুদের বেলায় কি তা খাটে না? এদেশে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ভয়ের না বশীভূত? কাজ হাসিল করার দরকার পড়লে অন্য কিছুর বন্ধনের দোহাই কি হিন্দুরাই মেনে চলেছেন? আসল কথা এই যে, সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মহাপুরুষ অনেক সাধুসন্ত অনেক পীর-পয়গম্বরই মানুষকে হিতোপদেশ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু তার ফলে মানুষ খুব যে

বেশি শুধরে গেছে তা বলে তো মানব-ইতিহাসের কোথাও তার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ঘরে বাইরে সর্বত্র ক্লাইভের হাতে বাধা পেতে পেতে মীর জাফরের মতো অল্পবুদ্ধির লোকও শেষে বুঝতে পারলেন যে, তিনি একেবারে জাঁতিকলে পড়ে গেছেন, তার থেকে আর বেরোবার কোনো উপায় নেই। তখন রাজকার্যে তাঁর সামান্য যেটুকু উৎসাহ ছিল তাও আর রইল না, তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্লাইভের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাঙের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন, অষ্টপ্রহর আমোদপ্রমোদে ডুবে রইলেন। মীর জাফরের যে এতটা অধোগতি হবে তা ক্লাইভ ঠিক ভেবে উঠতে পারেননি। কিন্তু করবেন কি? যাঁকে হাতে ধরে তিনি নিজে বাংলার মসনদে বসিয়েছেন তাকে কি মুখে আর সেখান থেকে হটান? শুধু মীরনই মাঝে মাঝে তড়পাতে লাগলেন যে, অমন ভেড়ুয়া বাপকে খুন করেও যদি বাংলার গদি দখল করতে হয় তাহলে তাতেও তিনি রাজি, ভয় কেবল ক্লাইভকে। নবাব বানাবার মায়াকাঠি যাঁর হাতের মধ্যে তিনি যে মীর জাফর গেলে তাঁর জায়গায় মীরনকেই নবাব করবেন তার নিশ্চয় কি? তাই মাঝে মাঝে মীর জাফরকে একটা তাড়া লাগিয়ে তাঁকে সজাগ করে তোলার চেষ্টা ছাড়া তিনিও আর বেশি-কিছু করে উঠতে পারলেন না।

এতক্ষণ যা বলা হল সেটা মনে করে রাখলে এই সময়কার ঘটনাগুলোর তাৎপর্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ইংরেজদের এদেশে রাজ্য-বিস্তারের উদ্যোগপর্বে বাংলাদেশের বুকের উপর বসে ক্লাইভ কি করে বোড়ের চাল চালতে লাগলেন—এ তারই বিবরণ।

॥ দুই ॥

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ হয়ে যে কজন ফরাসী গোলন্দাজ পলাশীর মাঠে ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছিল তারা সবাই তাদের সর্দার সাঁফ্রের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা বীরভূমের জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচল। ঢাকায় ফরাসী কুঠিয়াল কুঁর্তাও তাঁর লোকজন সঙ্গে নিয়ে সেই জঙ্গলেই গিয়ে ঢুকলেন। তারপর সবাই একত্র হয়ে মেদিনীপুর থেকে কটকে পড়ে অবশেষে দক্ষিণাপথে ফরাসী জেনারল বুশীর সঙ্গে গিয়ে মিশলেন। বাকি রইলেন শুধু ফরাসিস জাঁ ল, আর তাঁরই জনকয়েক স্যাঙ্গোপাঙ্গ।

পলাশীর যুদ্ধের একটু আগেই ইংরেজদের ছলনায় ল-সাহেবকে কাশিম-বাজারের কুঠি ছেড়ে পাটনার ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ হয়ে যেতে হয়েছিল। ক্লাইভ তাঁকে সিরাজের কাছে থাকতে দেওয়াটা ভালো হবে বলে মনে করেননি। অবশেষে সিরাজউদ্দৌলা যখন দেখলেন যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নেই তখন তিনি ল-সাহেবকে পাটনা থেকে তলব করে পাঠালেন। খরচপত্রের দরুন তাঁকে দশ হাজার টাকা দেবার জন্যে পাটনার খাজাঞ্চিখানায় নবাবী পরোয়ানা চলে গেল। কিন্তু সরকারী ব্যাপারে এখনো যা তখনো তাই ছিল। সরকারের পাওনা টাকা আদায়ে বিন্দুমাত্র তর সয় না, কিন্তু অন্যের ন্যায্য প্রাপ্য টাকা বের করতে গেলেই সরকারের গায়ে জ্বর আসে, তখন একটার পর একটা হাজারো বায়নাক্কা।

গড়িমসি করতে করতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। টাকার অভাবে ল ঠিক সময় পাটনা থেকে বেরোতে পারলেন না। তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত চলে আসতেই শুনলেন—পলাশীর যুদ্ধ খতম, সিরাজউদ্দৌলা পলাতক। দ্বিধা না করে ল-সাহেব যদি আর কুড়ি মাইল মাত্র এগিয়ে যেতেন, তাহলে পথে সিরাজউদ্দৌলাকে ধরতে পারতেন, হয়তো বা তাঁকে জল্লাদদের হাত থেকে উদ্ধার করতেও সক্ষম হতেন। কিন্তু যেরকম দিনকাল পড়েছে তাতে ল স্বস্থান ছেড়ে বেশি দূর যাওয়াটা কোনোমতেই বুদ্ধির কাজ হবে না মনে করে মাত্র দুদিন তেলিয়াগড়িতে অপেক্ষা করেই পাটনায় ফিরে গেলেন।

তখন পাটনার ডেপুটি গভনর রাজা রামনারায়ণ। রামনারায়ণের বাবা

রঙ্গলাল আলীবর্দী খাঁর আমলে পাটনার সরকারী দপ্তরে সামান্য কেরানীর কাজ করতেন। ছেলেকে সেইখানেই পাঁচ টাকা মাসমাইনের একটা কাজে ঢুকিয়ে দেন। জাত্যংশে এঁরা শ্রীবাস্তব কায়স্থ, লেখাপড়া হিসেবনিকেশের কাজে খুবই পটু। তার উপর রামনারায়ণের ফার্সীবিদ্যা অগাধ। ফার্সী ভাষায় তিনি যেমন বলতে-কইতে তেমনি লিখতে-পড়তে পারেন। তাঁর লেখা ফার্সী চিঠি লোকে আদর্শ মেনে নকল করে রাখত। ফার্সী চুর্ণ-কবিতা রচনায় রামনারায়ণ সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা ফার্সী শ্লোক পড়ে লোকে তা খোদ পারস্যদেশের কোনো গুণী কবির রচনা বলে ভ্রম করে বসত।

এ-হেন করিতকর্মা কৃতবিদ্য ব্যক্তি বেশি দিন চোখের আড়ালে লুকনো থাকে না, নজরে পড়ে যায়ই যায়। তবে এখনকার মতো তখনো জীবনে উন্নতি করার পথে—বিশেষত সরকারী কাজে—মুরুব্বীর জোর থাকার দরকার হত। রামনারায়ণের সুবিধা ঘটে গেল যখন আলীবর্দী খাঁর প্রিয়পাত্র দেওয়ান রাজা জানকীরাম বিহারের ডেপুটি গভর্নর হয়ে পাটনায় এলেন। রামনারায়ণ সহজেই জানকীরামকে পেট্রন পাকড়ে ফেললেন। কি করে উপরওয়ালাকে বশ করতে হয় সে-বিদ্যাতেও রামনারায়ণ কারো চেয়ে কম ছিলেন না। সুতরাং দেখা গেল, মৃত্যুর পুর্বে জানকীরাম তাঁর জায়গায় নিজের ছেলে দুর্লভরামকে ছেড়ে রামনারায়ণকেই বিহারের ডেপুটি গভর্নর করবার জন্যে আলীবর্দী খাঁর কাছে সুপারিশ করে গেছেন। সেই থেকে ঐ-পদে বহাল থেকে রামনারায়ণ মনের সুখে রাজকার্য চালিয়ে আসছেন।

জানকীরামের মতো রামনারায়ণও আলীবর্দী খাঁর বিশেষ অনুগত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার উপরও তাঁর যথেষ্ট মায়া ছিল, কখনো তাঁর অনিষ্টচিন্তা করেননি। ঠিক এই কারণে দুর্লভরাম সিরাজের বিরুদ্ধে মীর জাফরের চক্রান্তের কথা রামনারায়ণকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি, তাঁকে দলে টানবার চেষ্টাও করেননি। রামনারায়ণ ফরাসীদের সিরাজউদ্দৌলার সত্যিকার হিতকামী বলে জানতেন। সবাই-এর কথা বলতে পারিনে, কিন্তু ফরাসিস ল-সাহেব যে সিরাজের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সর্বদাই তাঁর মঙ্গলকামনা করতেন—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ল-সাহেব যখন পাটনা-কুঠির সর্দার হয়ে এলেন তখন রামনারায়ণ তাঁকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করলেন।

তেলিয়াগড়ি থেকে ফিরে এসে ল-সাহেব পাটনার সকলকে জানিয়ে দিলেন পলাশীর মাঠে ইংরেজদের জয় হয়েছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা শত্রুর কবলে। এইরকম গোলমেলে অবস্থায় ল-সাহেব অনেক কাজে আসতে

পারেন মনে করে রামনারায়ণ তাকে নিজের বশে রাখলেন। কিছুদিন পরেই খবর এল ঘাতকের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু রামনারায়ণ তখনি তখনি নতুন নবাব মীর জাফরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না, বেয়েচেয়ে দেখতে লাগলেন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে চুপ করে বসে না থেকে তাঁর অধীনে যেসব বড় বড় জমিদার ছিলেন তাদের সবাইকে হাত করবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলেন। অনেকেই কানাঘুসো করতে লাগল, রামনারায়ণ নাকি কি জানি কি মতলবে প্রতিবেশী অযোধ্যারাজ্যের স্ববাদার নবাব স্বজাউদ্দৌলার সঙ্গে কথা চালাচালি করছেন।

ক্লাইভ পণ করেই ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ফরাসী লডিয়েদের একেবারে নির্মূল করে ছাডবেন। সামান্য যে-কজন ব্যবসার খাতিরে পড়ে থাকবে, তাদের জন্যে ক্লাইভের ভয় নেই। তারা তো ঢোঁড়া সাপ হয়ে ইংরেজদের পদানত হয়েই থাকবে। নবাব-বাদশা উজীর-নাজিরদের এখন তিনি আর বড়-একটা পরোয়া করেন না। কিন্তু ইওরোপীয়নদের মধ্যে অন্য আর কারো না হোক, ফরাসীদের সম্বন্ধে যে ক্লাইভের মনে বিলক্ষণ ভয় ছিল, সেটা ধরে ফেলতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। তাই ক্লাইভ যখনই জানতে পারলেন যে ল-সাহেব সিরাজউদ্দৌলার উদ্দেশে পাটনা ছেড়ে বেরিয়েছেন তখনি তাঁকে ধরবার জন্যে মীর জাফরকে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। মীর জাফর তখন সবেমাত্র একদিন হল বাংলার মসনদে বসেছেন, বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তিনি অত দূরে সৈন্য পাঠাতে রাজি হলেন না। তাঁর সৈন্যরাও অনেক দিন মাইনেপত্র পায়নি, তাদের পক্ষে পাটনায় গিয়ে রামনারায়ণের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াটা একটুও বিচিত্র নয়, সে ভয়ও তাঁর ছিল। রামনারায়ণের বিস্তর টাকা, টাকা ছড়াতে তাঁর কোনোই অসুবিধা নেই। কিন্তু ক্লাইভ যা সংকল্প করেছেন তার থেকে একপাও পিছবার লোক তিনি নন। তিনি মেজর আয়ার কুটকে পাটনায় মার্চ করে যেতে হুকুম দিলেন। তাঁর সঙ্গে দিলেন আড়াইশো ইংরেজ পল্টন, তিনশো দেশী সেপাই, ছুটো বড়-বড় কামান আর বিস্তর গোলাগুলি। মেজর কুট তাঁর দলবল নিয়ে পাটনার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

কিন্তু সব সাজসরঞ্জাম জোগাড় করে চল্লিশখানা নৌকো বোঝাই করতে করতে বেশ-খানিকটা দেরি হয়ে গেল। শেষতক যাত্রা যখন শুরু হল তখন পাঁজিতে বোধহয় কোনো ঘোর অশুভ মুহূর্ত লেখা ছিল। কেননা দেখা গেল, পদে-পদেই একটা-না-একটা বিপদ উপস্থিত হচ্ছে। খানিক দূর যেতে-না-যেতেই নৌকোগুলোর বেশির ভাগ ভেঙেটুটে একশা। তার উপর গোড়া থেকেই

অনেকগুলো দাঁড়িমাঝি সরবো-সরবো করছিল, মাঝ পথে এক জায়গায় সুযোগ পেতেই চম্পট দিল। ওদিকে আবার গুনটানার লোকেরও অভাব। দুদিনের পথ বাড়তে চারদিন লেগে যায়।

আয়ার কুট ভেবেছিলেন একবার রাজমহল পৌছতে পারলে তাঁর কষ্টে খানিকটা লাঘব হবে। কারণ সেখানকার ফৌজদার বা ম্যাজিস্ট্রেট মীর দায়ুদ নতুন নবাব মীর জাফরের আপনার এক ভাই। কিন্তু কেবল মিষ্টি কথা ছাড়া মীর দায়ুদের কাছ থেকে আর-কিছু পাওয়া গেল না। তিনি ইংরেজ ফৌজদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একশো-কুড়ি ঘোড়সওয়ার জোগাড় করে এনে হাজির করেছিলেন বটে, কিন্তু দুমাসের মাইনের টাকা আগাম হাতে না নিয়ে তাদের কাপ্তান বললেন—পাদমেকং ন গচ্ছামি। আয়ার কুট কি আর করেন, তাদের আশা-ভরসা ত্যাগ করেই তিনি নৌকো মেরামতের কাজে মন লাগালেন। কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করাটা আমাদের ধাতে সয় না, তড়িঘড়ি করলেই আমাদের পিলে চমকে ওঠে, কাজও তাতে পণ্ড হয়। হাঁকডাক করে তাগাদার-পর-তাগাদা দিয়েও ছদিনের আগে মেরামতি সারা হল না। মীর দায়ুদ দাড়ি নেড়ে মোলায়েম ফার্সী বয়েত আউড়িয়ে হাতে-হাতে চাঁদ পাওয়াতে থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় স্রেফ ঢু ঢু।

দেখেশুনে সবাই মনে করেছিলেন আয়ার কুট বোধহয় এতটা তখ্‌লিফ ওঠাবার চেষ্টা করবেন না, ঢের হয়েছে বলে কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। কিন্তু কুটদের মতো সেনাপতিরা যে কি ধাতুতে গড়া তা তো এদেশী লোকের তখনো ভালো করে মালুম হয়নি? কর্তব্য কর্ম থেকে এঁদের নিরস্ত করা অত সহজ ব্যাপার নয়। পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত মার্চ করতে করতে আয়ার কুট ভাগলপুর পৌছলেন। সেখানে পা দিয়েই শুনলেন ল-সাহেব তাঁর লোকজন নিয়ে ঠিক চারদিন আগেই পগার-পার। একে ঘোর বর্ষাকাল, রসদ পাওয়া ভার, তায় বিদেশ-বিভুঁই, পথঘাট অজানা অচেনা—আয়ার কুটের ফৌজের কষ্টের একশেষ। রাস্তার মাঝে মুঙ্গের দুর্গে ঠাঁই মিলবে কুট মনে করেছিলেন, কিন্তু ফৌজদার উটকো বিপদ ঘরের ভিতর টেনে আনাটা সুবিধার কথা নয় মনে করে কুটকে কেল্লায় ঢুকতে দিলেন না। বাইরে তাঁবু গেড়ে কোনোরকমে রাত কাটিয়ে আবার সকাল থেকে মার্চ। নদীতে যেতে যেতে কতক নৌকো ডুবল, খানিক বালিতে আটকে রইল, কতক আবার গুন ছিঁড়ে অচল। পথে দারুণ কষ্টভোগ করে মেজর আয়ার কুট অবশেষে সসৈন্যে পাটনায় এসে পৌছলেন। তখন ল পাটনা ছেড়ে ছাপরায়।

আয়ার কুট বরাবরই একটু মাথাগরম-গোছের লোক। এই জন্যে মাথাঠাণ্ডা ক্লাইভের সঙ্গে তাঁর বনেও বনতো না। গোড়া থেকেই তাঁর রামনারায়ণের সঙ্গে খিটিমিটি বেঁধে গেল। সব-কিছু অঘটনের জন্যে আয়ার কুট রামনারায়ণকেই দোষী ঠাওরাতে লাগলেন—মুখের উপব সেটা বলে ফেলতেও কসুর করলেন না। রামনারায়ণ অবশ্য প্রথমে একটু আলগোছে থেকে বেয়ে-চেয়ে দেখছিলেন যে, কুটের আসল মতলবটা কি ?—তাঁকে গদি থেকে উচ্ছেদ করা, না শুধু ল-সাহেবকে গ্রেফতার করা ? ওদিকে মীর জাফরের দুই আত্মীয় আয়ার কুটের দু-কানে দুই টিয়াপাখির মতো আওড়াতে লাগলেন, রামনারায়ণ অতি বদলোক, তাঁর মতলব মোটেই ভালো নয়, তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সড করে তাঁকেই বাংলাব মসনদে বসাবাব তালে ফিরছেন। কুটকে ওসকাবার বিশেষ দরকাব ছিল না, রামনাবায়ণের বিরুদ্ধে তো তিনি শুরু থেকেই তেতে আছেন। রাজা রামনারায়ণের বিপক্ষে যে যা বলে তিনি সেটাকেই একদম বেদবাক্য বলে ধরে নেন।

আয়ার কুটের ডেসপ্যাচ পড়ে ক্লাইভও বামনারায়ণকে দুশমন বলে ঠাওরালেন। যদিও পরে তাঁর এই মত একেবারে বদলে গিয়েছিল, কিন্তু তখন পর পর কুটের নালিশে খানিক বিবক্ত হয়েই তিনি রামনারায়ণকে পাটনা থেকে হঠাবার হুকুম দিলেন। কিন্তু হুকুম আসার আগেই আয়ার কুট সমস্ত বাদ-বিসম্বাদে ধামা চাপা দিয়ে ল-কে ধববার জন্যে ছাপরায় ছুটলেন। অতিকষ্টে সেখানে পৌছে শুনলেন, ল তার আগেই সেখান থেকে সরে পড়ে কাশীতে গিয়ে কাশীরাজ বলবন্তসিংহের আশ্রয় নিয়েছেন। আয়ার কুট আর এগোতে পারেন না। আর দু-পা গেলেই নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজত্ব আরম্ভ। কর্মনাশা নদী পেরিয়ে তাঁর এলাকায় পা ফেললেই সর্বনাশ। তাহলে সুজাউদ্দৌলারই সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। কুট থেমে গিয়ে এখন কি কর্তব্য সেই বিষয়ে ক্লাইভের নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন।

ছাপরায় বসে বসে নিজের পকেটে কি করে দু-পয়সা আমদানি করা যায় তারই ফিকিরে কুট-সাহেব ঘুরতে লাগলেন। বেশি কষ্ট পেতে হল না। বিহারপ্রদেশের মধ্যে ছাপরার সোরা সবচেয়ে বিখ্যাত। ইওরোপে তখন বারুদের জন্যে সোরার প্রচুর চাহিদা। আয়ার কুট এই সোরার উপর দিয়ে বেশ-খানিকটা বাণিজ্য করে নিলেন। কামালেনও বড় মন্দ না। সাধে কি নেপোলিয়ন দুঃখ করে বলেছিলেন—ইংরেজ জাতটাই দোকানদারের জাত। কিছুদিন পরে ক্লাইভের অর্ডার এল, আর এগিও না—ফের।

পাটনায় ফিরে আয়ার কুট দেখলেন, রামনারায়ণ একেবারে অন্য মানুষ। সর্বদা জোড়হাত করে ইংরেজদের সুখ-সুবিধার তদারকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পূর্বের গরম ভাব কোথায় উড়ে গেছে, এখন একেবারে মাটির মানুষ। এইসব যুবক সাহেব আমাদের বুড়ো শিবঠাকুরের তুল্য—ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট-তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে। রামনারায়ণের নম্র ব্যবহারে মিষ্টি কথায় দামী-দামী উপহারদ্রব্যে আয়ার কুটের মন গলে একেবারে জল হয়ে গেল।

আয়ার কুটকে অন্যদিকে চলতে দেখে মীর জাফরের দুই আত্মীয় একটু হতভম্ভ হয়ে গেলেন। তাঁদের অত চেষ্টা যে বৃথা হয়ে যায়। ঐ দুজনের মধ্যে ধূর্তমিতে মহম্মদ আমীন অন্যজন মীর কাজেমের চেয়ে ঢের বেশি পাকা। ফন্দিবাজিতে তাঁর মাথাও খেলে ভালো। তিনি এক ফার্সী চিঠির নকল বের করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে আসল চিঠিটা রামনারায়ণের লেখা, আর তাতে রামনারায়ণ নবাব সুজাউদ্দৌলাকে লিখছেন, তিনি যেন বাংলাদেশ জয় করতে শিগগিরই বেরিয়ে পড়েন।

বাধ সাধলেন মীর জাফর নিজেই। মীরনের কথায় তিনি কুটকে জানিয়ে দিলেন মীর আমীনের সব কথাই বেবাক ঝুটো। মেজর-সাহেবের ঘাড়ে চড়ে তিনি বিহারের ছোট নবাব বনবার ফন্দিতে আছেন। আয়ার কুট যেন এসব ব্যাপারে মাথা না-গলিয়ে শিগগিরই মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। মীর জাফরের এই উপদেশ যে রামনারায়ণের উপর প্রীতিবশত—একথা যেন কেউ ভুলেও মনে না করেন। আসলে রামনারায়ণের অঢেল ধনরত্ন অন্যের হাতে পড়ার সম্ভাবনাটুকুও পিতাপুত্রের কেউই সহ্য করতে পারছিলেন না। সেই ধনদৌলত মেরে নেওয়ার অধিকার যদি কারো থাকে তাহলে সেটা একমাত্র তাঁদেরই। রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করতে হয় তো তাঁরা পাটনায় গিয়ে নিজের হাতেই তা করবেন, অন্য কেউ সেদিকে হাত বাড়াবে কেন?

পাটনায় কনফারেন্স বসল। আয়ার কুটের ডাকে মহম্মদ আমীন, মীর কাজেম, রামনারায়ণ একত্র হলেন। কুটের মধ্যস্থতায় তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। একপক্ষ কোরান অপরপক্ষ ব্রাহ্মণ মুখের সামনে রেখে, তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ করলেন সেদিন থেকে মনোমালিন্য আর কিছুই রইল না। কিন্তু জোর করে কি আর প্রেম হয়? প্রেম কি এতই সুলভ? লোকে জানত এসব শপথ শুধু ভাঙিবারই তরে। যাই হোক, এই শান্তিপর্ব শেষ করে আয়ার কুট মুর্শিদাবাদে ফিরলেন। তাঁকে দেখে মীর জাফর আর মীরন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন। তাঁদের কারো ইচ্ছা ছিল না, ইংরেজরা তাঁদের

চোখের সামনে থেকে বেশি দূরে থাকেন। টুপিওয়ালাদের আদবেই বিশ্বাস নেই—তারা কখন যে কি করে বসে, তা কেউ বলতে পারে না।

রামনারায়ণ আর একটুকুও কালহরণ করলেন না, মীর জাফরকে নবাব বলে মাথা-নোয়ানোর কাজটা খুব চটপটই সেরে ফেললেন। কিন্তু সেটা বাইরের ঠাট। অন্তর থেকে কায়স্থপুঙ্গব রামনারায়ণের বুঝতে একটুও দেরি হল না যে, হাওয়া বদলেছে। স্রোত এখন উল্টো দিকে বইছে। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন, এখন ইংরেজদের পড়তা পড়েছে, তাঁদের ঠেকাতে পারে এমন শক্তি এদেশে কারো নেই। সুতরাং সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ইত্যাদি সাধুবাক্য স্মরণ করে রামনারায়ণ সেদিকেই মন লাগালেন।

॥ তিন ॥

আমার কুট পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদে পৌঁছনোর পর দিনই ক্লাইভ কলকাতা ফিরে চললেন। মাদ্রাজ থেকে খারাপ খবর এসেছে। কলকাতা ফেরার আগেই ক্লাইভ বুঝতে পেরেছিলেন মীর জাফর আর দুর্লভরাম দুই প্রাণের বন্ধুর ভালবাসায় চিড় খেয়েছে। শুধু তাই নয়, ছোট নবাব মীরনও তাঁর বাপকে ক্রমাগত দুর্লভরামের বিরুদ্ধে তাতাচ্ছেন। প্রেম পাকা ফুটির মতো ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম। সাধে কি কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র খেদ করে বলে গেছেন—বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে-দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।

দায়ে ঠেকে দুর্লভরাম ইংরেজের অত্যন্ত অনুগত হয়ে পড়েছেন। ক্লাইভও তাঁর পিতৃদত্ত নাম কিঞ্চিৎ বিকৃত করে তাঁর আদরের নাম দিয়েছেন—রয়দুলুভ। তিনি পরিষ্কার দেখলেন দুর্লভরামকে মীর জাফরের মুখ্যমন্ত্রীর পদে টিঁকিয়ে রাখতে পারলে ইংরেজদেরই লাভ। সরকারী টাকাকড়ি সবই প্রথমে তাঁর হাতে এসে পড়ে, সুতরাং তিনি ইংরেজের দিকে থাকলে মীর জাফরের কাছ থেকে কোম্পানীর টাকার সবটাই আস্তে আস্তে ঠিক আদায় হবে। আর সেই সঙ্গে দরবারের অনেক গুপ্তকথাও দুর্লভরামের মারফত জানা যাবে। তাই যাবার আগে ক্লাইভ তার দুই সাগরেদকে—উইলিয়ম ওয়াটস্ আর লুক্ স্ক্রাফ্টনকে—ডেকে বলে দিয়ে গেলেন, গোলমালের একটু আভাস পাওয়ামাত্রই তাঁরা যেন কাশিমবাজার থেকে পল্টন নিয়ে এসে দুর্লভরামের সহায় হন।

দুর্লভরাম রাজা জানকীরামের বড় ছেলে। চুঁচড়োর দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সোমবংশাবতংস। নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে বাঙালী হিন্দুদের অনেকেরই কপাল খুলে গিয়েছিল। জানকীরামও হীনাবস্থায় মুর্শিদাবাদে এসে সামান্য সরকারী কাজে ভর্তি হয়ে আস্তে আস্তে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছিলেন। উন্নতি এতই করেছিলেন যে, কালক্রমে উড়িষ্যার আর তারপরে বিহারেরও ডেপুটি গভর্নর হয়েছিলেন। দুর্লভরাম বাপের মতো অতটা কাজের লোক না হলেও বাপেরই তো বেটা, কুছ নেই তো থোড়া থোড়া। চাড় দিয়ে দিয়ে জানকীরাম ছেলেকে অনেকদূর উঁচুতে তুলেছিলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ে দুর্লভরামকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কাজেকাজেই মীর জাফরের

সঙ্গে তাঁকে বন্ধুত্ব পাতাতে হয়েছিল। অদৃষ্ট মন্দ হলে বন্ধুও জোটে সেইরকমের। অবশেষে মীর জাফরের সঙ্গে মিশে ক্লাইভের সহায়তায় দুই বন্ধুতে মিলে কেমন করে কৌশলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার গদি থেকে হঠালেন—তার ইতিহাস সকলেরই জানা।

দুর্লভরামের হাতে দু-পুরুষ ধরে জমানো এন্তার টাকা। তার উপর সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফলে পুরস্কার পেয়েছেন সুবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদ। তাতেও, কি প্রকাশ্যে আর কি গোপনে, আমদানি বড় মন্দ নয়। মাইনে বলে বেশ-একটা প্রাপ্তি তো আছেই, তাছাড়া এদিক থেকে ওদিক থেকে উপরি যা আসছে, খাতাপেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসলে তার পরিমাণ আট ঘর ছাড়িয়ে যায়। এততেও তবু আকাঙ্ক্ষা মেটে না, আরো চাই আরো চাই। বাঙালী হিন্দুর গায়ে জোর নেই বটে, কিন্তু মাথা তার বিলকুল সাফ—বিশেষ করে কুটিল পাকচক্রে। দুর্লভ এক আঁচেই বুঝে নিয়েছিলেন বঙ্গদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে-খেলা চলছে তার রঙের টেক্কা ইংরেজের হাতে। তাই তিনি আর দেরি না করে দিল্লীশ্বরকে ছেড়ে কর্নেল ক্লাইভকেই জগদীশ্বর মেনে তাঁর ভজনা করতে শুরু করে দিলেন।

ক্রমশ দুর্লভরামকে মুরুব্বী করে নবাব-দরবারে গোপনে গোপনে ইংরেজদের অনুগত একটা দল গড়ে উঠতে লাগল। প্রকাশ্যে না হোক তলে-তলে জগৎশেঠরাও এই দলে যোগ দিলেন। ভাঙের ঘোরে মীর জাফর সব ব্যাপারটা তলিয়ে না বুঝলেও সেটা তস্য পুত্র মীরনের চোখ এড়াল না। এসব বিষয়ে মীরনের চক্ষুলজ্জা ছিল না। তিনি দুর্লভরামকে একেবারে পেড়ে ফেলার চেষ্টায় রইলেন। দুর্লভরামও অতি সন্তর্পণে চলাফেরা করতে লাগলেন। তাঁর তাঁবে তাঁর নিজের মাইনে-করা সেপাইশান্ত্রী দশ হাজার। তারা দিনরাত পাহারায় থাকে বলে মীরন সহজে তাঁর কিছু করে উঠতে পারলেন না।

কলকাতা ফেরার আগে ক্লাইভ আরো দেখে গেলেন যে, মীর জাফর আর মীরন দুয়ে মিলে মেদিনীপুরের ফৌজদার অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাজারাম সিংহের সর্বনাশ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। রাজারামও আলীবর্দী খাঁর আমলের রাজকর্মচারী। সিরাজউদ্দৌলারও খুব বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে তাঁর গোয়েন্দাদপ্তরের অধ্যক্ষ হয়ে বসেছিলেন। রাজারামও সাতজনকে ডেকে শোনাবার মতো টাকা করেছেন, স্বনামে বেনামে জমিদারিও কিনেছেন অনেক। এ-লোককে উৎখাত করে তাঁর ধনদৌলত হুজুরে বাজেয়াপ্ত

করা কেন না হবে? মেদিনীপুর ফৌজদারির হিসেবনিকেশ করার জন্যে রাজারামকে মুর্শিদাবাদে তলব করা হল। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্লভরামও একটা লোক-দেখানো চিঠি ঐ সঙ্গে ছেড়ে দিলেন—রাজারাম যেন শীঘ্রই হজুরে হাজির হন। তবে আসলে তিনি রাজারামের বন্ধু, টানটা তাঁরই দিকে।

রাজারাম চালাক লোক, তার উপর এতদিন ধরে গোয়েন্দাগিরি করে এসেছেন। তিনি সহজেই দুর্লভরামের চিঠির মর্মার্থ বুঝে নিলেন। তাই নিজে না গিয়ে তাঁর ছেলে মথুর আর তার ছোট ভাই নারায়ণকে আমমোক্তার করে মুর্শিদাবাদের দরবারে পাঠালেন। বলা বাহুল্য রাজধানীতে পা দিতে-না-দিতেই তাঁদের গ্রেফতার করে গারদে পুরে দেওয়া হল। ক্লাইভ কলকাতায় চলে গেলেন দেখে দুর্লভরাম গোপনে চর-মারফত রাজারামকে বলে পাঠালেন, যে-করেই হোক তিনি যেন ক্লাইভের পায়ে গিয়ে পড়েন।

কলকাতায় পদার্পণ করা মাত্রই ক্লাইভ জানতে পারলেন দক্ষিণ দেশে ফরাসীদের হাতে ইংরেজদের অবস্থা ক্রমশ সঙিন হয়ে উঠছে। ইওরোপে ইংরেজদের আর ফরাসীদের মধ্যে সাত বছর ধরে যে-যুদ্ধ চলেছিল সেটার শুরু হয় ১৭৫৬ সালে। ভারতবর্ষে সেই যুদ্ধের ঢেউ এসে পৌছয় যখন ক্লাইভ নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে কলকাতার পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত। বঙ্গদেশে সেই যুদ্ধের প্রথম পর্বে ক্লাইভ আর অ্যাডমিরল ওয়াটসন দু-জনের চেষ্টায় চন্দননগর জয়। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল দক্ষিণ দেশে মাদ্রাজের কাছে, পলাশীর যুদ্ধের পর। মাদ্রাজের ইংরেজ কুঠি থেকে কলকাতায় খবর এল যে একঝাঁক ফরাসী মানোয়ারী জাহাজ মাদ্রাজ উপকূলে দেখা দিয়েছে। কাউণ্ট লালী তাঁর খাস রেজিমেণ্ট সঙ্গে নিয়ে ফরাসীদের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন।

কথা ছিল, ক্লাইভ কলকাতা উদ্ধার করেই মাদ্রাজ থেকে আনা কোম্পানীর সেপাই পল্টন নিয়ে মাদ্রাজেই ফিরে যাবেন, কারণ কোম্পানীর মাদ্রাজ গভর্মেণ্টই হল ক্লাইভের মনিব, সেইখানেই তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র। কোম্পানীর কার্যোদ্ধারের জন্যে ক্লাইভকে দিনকতকের জন্যে বাংলা গভর্মেণ্টের কাছে ধার দেওয়া হয়েছিল মাত্র। দেরি হচ্ছে দেখে মাদ্রাজের গভর্নর পিগট-সাহেব ক্লাইভকে ফিরে আসবার জন্যে তাগাদার-পর-তাগাদা দিতে লাগলেন, কিন্তু তাতে কোনোই ফল হল না। ক্লাইভ তাঁর সংকল্প থেকে একটুও বিচ্যুত হলেন না। বঙ্গদেশে তিনি যে খেল দেখাতে শুরু করেছেন তার শেষ হতে তখন অনেক বাকি। তাছাড়া কল্পতরুর সন্ধান তিনি এই বঙ্গদেশেই পেয়েছেন—যাকে একটি বার নাড়া দিলেই আশার অতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। শুধু একটু

কষ্ট করে কুড়নোর যা ওয়াস্তা, সঙ্গে সঙ্গেই ক্লুপকেট ফুলে ওঠে। এমন মজা জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও মড়া কি সোজা কথা?

ক্লাইভ কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। শুধু দয়া করে মাদ্রাজের গভর্নরকে লিখে পাঠালেন—টাকা যত লাগে বলো, কলকাতার তহবিল থেকে সে পাঠানো হবে, তার জন্যে ভাবনা কিছুই নেই। তবে মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের সঙ্গে যেসব বৃটিশ বাজসৈন্য এসেছিল মেজর আয়ার কুটের কর্তৃত্বে তাদে মাদ্রাজে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আর অ্যাডমিরল ওয়াটসন যেসব যুদ্ধে জাহাজ বঙ্গদেশে এনেছিলেন সেসবও অ্যাডমিরল পোককের অধীনে মাদ্রাজে ফিরে চলল। বেচারী ওয়াটসন কলকাতার জলহাওয়ার গুণে পলাশীর যুদ্ধে মাস দুয়েকের মধ্যে এখানেই মাটি নিয়েছিলেন।

এই সময় মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম ক্লাইভকে ধরে পড়লেন। চি লিখে জানালেন, তিনি তো কোনোই দোষ করেননি, তবে কেন শুধু শুধু তাঁ উপর নবাবের এমন বিষদৃষ্টি? তিনি মীর জাফরকে নবাব বলে মানতে সর্বদা রাজি, তাঁকে মান্য করে চলতে সদাই প্রস্তুত। তবে কোন্ অপরাধে নবাব তাঁ ভাইকে আর ছেলেকে মুর্শিদাবাদের হাজতে পুরসেন? চিঠির শেষে জানালেন—নবাবের আশ্রয়ে যদি তাঁব স্থান না হয় তাহলে মেদিনীপুরে বিস্তর পাহাড়-পর্ব বন-জঙ্গল আছে যেখানে তাঁর স্থানের অভাব হবে না। সেখান থেকেই তি দিনের-পর-দিন বিদ্রোহ চালিয়ে যাবেন, লোকবল ধনবল অস্ত্রবল তাঁরও কি কম যায় না। তবে যদি নবাবের মন ফেরে, তাহলে এক লাখ টাকা দণ্ড দিে তিনি সব মিটিয়ে নিতে তৈরি আছেন।

মীর জাফরের কথায় ক্লাইভও প্রথমে রাজারামের উপর বিমুখ হয়েছিলেন মীর জাফর ক্লাইভকে বুঝিয়েছিলেন, রাজারাম ইংরেজদের শত্রু। নবা সিরাজউদ্দৌলা তাঁরই মধ্যস্থে দক্ষিণে ফরাসী জেনারল বুসীর সঙ্গে কথা চালাচালি করেছিলেন, যাতে জেনারল তাঁর সৈন্যসামন্ত দক্ষিণ দেশ থেকে বঙ্গদেশে নিয়ে এসে ফেলে ইংরেজদের জব্দ করে দেন। আর পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার পরেও রাজারাম লাঁক্রে আর তাঁর সঙ্গীদের মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণে পাচার করে দিয়েছিলেন। তারই সাহায্যে ফরাসীরা এতদিনে বুসীর কাছে পৌঁছে গেছেন ক্লাইভ যেন রাজারামকে কিছুতেই আশকারা না দেন। কিন্তু ক্লাইভ দেখলেন এদেশীয় মালদার লোকেদের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের এই আর-এক সুযোগ উপস্থিত। তিনি সে-সুযোগ ছাড়লেন না। রাজারামকে লিখে দিলেন, তিনি সম্প্রতি চন্দননগর রওনা হচ্ছেন, রাজারাম যেন সেইখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা

করলেন। মীর জাফরকেও লিখে পাঠালেন, নবাব যেন রাজারামের ব্যাপারট আপসে মিটিয়ে নেন।

ক্লাইভের চিঠি পেয়ে মীর জাফর একটু বেকায়দায় পড়লেন। খোজা হাদী বলে তাঁর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তিনি মেদিনীপুরের ফৌজদারির খেলাত দিযে ইতিপূর্বেই সেখানে রওনা করে দিয়েছিলেন। গোপনে বলেও দিয়েছিলেন রাজারামের সমস্ত ধনসম্পত্তি হস্তগত করে যেন সোজা মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। এখন ক্লাইভকে তাঁর এইসব ঘরোয়া ব্যাপাবে হাত চালিয়ে তাঁর সমস্ত প্ল্যান মাটি করে দিতে উদ্যত দেখে, নবাব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু করবেন কি? অদৃষ্টক্রমে ঠিক সেই সময়েই পুর্নিয়ায় এক বড-রকমের বিদ্রোহ দেখা দিল। নবাব তো অর্থাভাবে নিজের ফৌজ কমিয়ে এনে এখন ইংরেজ ফৌজের উপরই নির্ভর করতে শুরু করেছেন। এখন কর্নেল-সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে এসব উৎপাতের হাত থেকে তিনি রক্ষা পাবেন কি করে? সুতরাং অন্দরে বসে হাজার গরম হতে থাকলেও বাইরে ঠাণ্ডা হয়ে ক্লাইভকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মীর জাফর ক্লাইভকে লিখে জানালেন, বাজারাম যদি সত্যি লাখ টাকা দিতে ইচ্ছুক হন তাহলে আর দেরি না করে টাকাটা সঙ্গে নিয়ে শিগগিরই যেন মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে দেখা দেন। যদি বোঝা যায় রাজারাম সত্যিই আগের থেকে শুধরিয়েছেন আর নবাবের অধীনে থেকে তাঁকে মেনে চলতে রাজি, তাহলে তিনি তাঁকে এ-যাত্রা ক্ষমা করে মেদিনীপুরের ফৌজদারিতে বহাল রাখবেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুভাবে অনুযোগ করতেও ছাড়লেন না যে ক্লাইভ খোজা হাদীর কাছে নবাবকে কি রকম অপ্রস্তুতে ফেললেন। ক্লাইভ সে-কথায় কান না দিয়ে রাজারামকে সব খুলে লিখে দিলেন। রাজারাম ক্লাইভের সঙ্গছাড়া হয়ে একলা মুর্শিদাবাদে যাওয়াটা আদবেই সুবুদ্ধির কাজ বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি চন্দননগরে এসে হাজির হলেন। ইচ্ছা, ক্লাইভের সঙ্গে একত্রই মুর্শিদাবাদ রওনা হবেন।

আলীবর্দী খাঁর নবাবী আমলে তাঁব মেজো জামাই সৈয়দ আহমদ পুর্নিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুব পর তাঁর ছেলে শৌকতজঙ্গ কর্তা হন। এই শৌকতজঙ্গই সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে লডাই করতে এসে মনিহারির যুদ্ধে প্রাণ হারান। তখন সিরাজউদ্দৌলা তাঁর প্রিয়পাত্র মন্ত্রী কাশ্মিরী মোহনলালকে পুর্নিয়ার ফৌজদারি দেন। মোহনলাল মুর্শিদাবাদে বসে মন্ত্রিত্ব করতেন আর পুর্নিয়ার ফৌজদারি কাজ চালাতেন তাঁর ছেলে আর তাঁর বিশ্বাসী দেওয়ান

অচলসিংহকে দিইয়ে। পলাশীর যুদ্ধের পর সবই ওলোট-পালোট। অনেকের মতো অচলসিংহও ভাবলেন, বুঝি এমন সুযোগ আর কখনো আসবে না। তিনি কৌশলে মোহনলালের ছেলেকে কয়েদ করে হাজীব আলী বলে তাঁর এক ভালো যোদ্ধা বন্ধুকে পুর্নিয়ার গদিতে চাপিয়ে নিজে তাঁর দেওয়ান হয়ে বসলেন। বন্ধুকে সিংহাসনে সাক্ষীগোপাল রেখে নিজেই কর্তাত্বি চালাবেন—এই ছিল তাঁর মনের বাসনা।

এর পর অবশ্য মীর জাফর আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। পুর্নিয়ায় একবার যেতেই হয়, নইলে মান-সম্ভ্রম সব খোয়া যায়। কিন্তু বিপদ হল সেপাইদের নিয়ে। বাকি-বকেয়া মাইনে চুকিয়ে না দিলে তারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অন্যত্র একপাও নড়তে রাজি হল না। উল্টে টাকার জন্যে নবাবকে শাসাতে থাকে। মীর জাফর দুর্লভরামকেই এসব কু-এর গোড়া বলে ঠাওরালেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী, সরকারী টাকাকড়ি যা-কিছু সবই তো তাঁর হাত দিয়েই আসে যায়। দরকারের সময় তিনি যদি টাকার জোগান দিতে না পারেন তাহলে তাঁর মন্ত্রিত্ব করার দরকার কি? সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পৈতৃক চুঁচড়োয় ফিরে গেলেই তো হয়। বিপদ বুঝে দুর্লভরাম বাড়ির অন্দরমহলে গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন, আর দরবারে যাবার নামও করেন না। ঝগড়াটা পেকে ওঠবার আগেই কাশিমবাজার কুঠি থেকে ওয়াটস এসে মাঝে পড়ে বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। সকলের সামনে দুই পুরানো সেঙাতে কোলাকুলি করে আবার মিতালি পাকা করলেন। কিন্তু যাঁদেরই চোখ ছিল তাঁরাই দেখলেন, এ হল গিয়ে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আগুন নেবেনি, তাতে ছাই চাপা পড়ল মাত্র।

ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে মীর জাফর ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদে আসার জন্যে জোর তাগাদা করে পাঠালেন। তিনি বুঝছিলেন ক্লাইভ না এলে আর রক্ষা নেই। সব দিক সামলানো তাঁর কর্ম নয়। ক্লাইভকে সহায় না করে কোথাও অভিযানে বেরোনো মানে পাগলামি কাণ্ড করা। পুর্নিয়ার দিকে তো যাওয়া নয়ই, কারণ সে-দেশ তো তাঁর কাছে একেবারে অচেনা অজানা, বুড়ো বয়সে সেদিকে পা বাড়াবার স্পৃহা তাঁর একটুও নেই। কিন্তু ক্লাইভের বেরোতে দেরি হতে লাগল। তাঁরও সৈন্যসামন্তের জোগাড় নেই। বর্ষার শেষে দক্ষিণ বাংলায় অসুখের হিড়িক পড়ে যায়। তাইতেই তো কথার সৃষ্টি—আটুই ভাদর থেকে আটুই অঘ্রান, যমের বত্রিশ দাঁত জানে বুদ্ধিমান। রোগটা আর-কিছু নয়, আমাদের বহু পরিচিত ম্যালেরিয়া। তখন অবশ্য এ-নামও

ছিল না আর এ-রোগের চিকিৎসাও বের হয়নি। সাহেবরা তাঁদের বইয়ে রোগের যা বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা পড়ে বোঝা যায় হুবহু ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। এদেশের লোকেরা এ-রোগে ভুগে ভুগে চর্মসার হয়ে কোনোরকমে ধুকপুক করে চলতে থাকে, কিন্তু ঠাণ্ডা দেশের লোককে এ-রোগ একবার ধরলে আর রক্ষা নেই, মরণং ধ্রুবম্।

কিন্তু সেই বছর ইংরেজরা রোগে ততটা মরল না, যতটা মরল যথেচ্ছাচারের ফলে। মীর জাফরের ঘাড ভেঙে খয়রাত বলে যে-টাকা আদায় হয়েছিল তাতে করে উঁচু থেকে নীচু স্তরের সবাইকার হাতে অল্পবিস্তর রেস্ত জমে গিয়েছিল। সেইজন্যে দেখা গেল সর্বত্রই টাকাব ছিনিমিনি খেলা চলেছে। এদেশে যেসব ইংবেজ আসত তাদের অধিকাংশ ছিল বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে। এরা সবাই ছিল উপোসী ছারপোকা। এদেশে এসে হঠাৎ একসঙ্গে এত টাকার মুখ দেখে তাদেব সংযমেব বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। অসংযমের মাত্রা এতদুব বেড়ে গেল যে তাব ফলে এল লোভ, এল পাপ। আর শেষে পাপের ফলে মৃত্যু। তাই ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ রওনা হতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন।

ওদিকে পুর্নিয়াব গদি দখল করে বসলেও হাজীর আলী খাঁ ভালো করেই জানতেন যে নবাবের সঙ্গে একটা আপস-রফা না করতে পারলে কিছুতেই শেষরক্ষা হবে না। তিনি মীব জাফবের সঙ্গে এক সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। প্রস্তাব শুনে ছোট নবাব মীরন তখনই মিটমাট করে নেবাব পরামর্শ দিলেন, কারণ এতে বলক্ষয়ও নেই, ধনক্ষয়ও নেই—ঘরে বসেই কিস্তিমাত। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড কথা এই যে তাহলে আর ক্লাইভের শরণাপন্ন হতে হয় না। ক্লাইভকে এসবের ভিতর ঢুকতে দিতে মীরনেব ঘোব আপত্তি। কিন্তু মীর জাফর তাঁর প্রভু কর্নেল ক্লাইভকে না-বলে না-কয়ে কি করে আর তাতে মত দেন? তিনি যে ক্লাইভকে আসতে লিখে দিয়েছেন, ক্লাইভও লিখেছেন তিনি এলেন বলে, ইতিমধ্যে নবাব যদি দরকার মনে করেন তাহলে কাশিমবাজারে যে ইংরেজ ফৌজ আছে আপাততঃ তাই সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করে দিতে পারেন, ক্লাইভ তাঁকে পুর্নিয়ার পথে ধরবেন।

তবুও মীর জাফর একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। মীর জাফরের আসল অভিযান তো রাজা রামনারায়ণের বিরুদ্ধে। রামনারায়ণের মতো এক রাঘব-বোয়ালের তুলনায় হাজীর আলী তো একটা চুনোপুঁটি মাত্র। বলা যায় না, বেশি দেরি করে ফেললে রামনারায়ণ কখন যে নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ

দিয়ে এক অঘটন ঘটিয়ে তোলেন তার ঠিকানা নেই। তখন রামনারায়ণের বিশাল ধনরত্ন অযোধ্যার নবাবেরই ভোগে লাগবে, বাংলার নবাব মীর জাফর তার এক কানাকড়িও ভাগ পাবেন না। সুতরাং ক্লাইভ এলে তাঁকে পাটনায় নিয়ে যাওয়া চাই। কিন্তু পুর্নিয়াতেও তো লোক পাঠানো দরকার, সেখানেও বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে। অথচ মীর জাফর তাঁর আশেপাশে এমন কোনো লোক দেখতে পাচ্ছেন না যাকে বিশ্বাস করে লড়াইয়ে পুর্নিয়া পাঠাতে পারেন। যারা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতক তারা তো কখনো অন্যকে পুরো বিশ্বাস করতে পারে না।

কি করি কি করি বলে মীর জাফর যখন দোমনা, ঠিক সেই সময় তাঁর সামনে হাজির হলেন এক ব্যক্তি—যাঁর নাম খাদেম হোসেন। খাদেম হোসেন একটি একের নম্বর ওঁচা লোক। নেশাভাঙ নোংরামি লোচ্চামি গুণ্ডামি ডানপিটেমিতে এ-ব্যক্তি হাড়ে-হাড়ে পোক্ত। এদেশের সর্বত্র তখন এইরকম লোকদেরই প্রাধান্য। মীর জাফরের সমবয়সী, তাঁর ছেলেবয়েসের ইয়ার। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময়ে মীর জাফরকে বেশ-খানিকটা সাহায্যও করেছিলেন। মীর জাফর নবাব হতে খাদেম হোসেন তাঁকে মামু মামু বলে ডাকতে আরম্ভ করেছেন, যেন কতই নিকট আত্মীয়। আত্মীয়তা এমন-কিছু ছিল না যা নিয়ে গর্ব করা যায়। খাদেম হোসেন মীর জাফরের ভগ্নীপতির রক্ষিতার ছেলে—সম্বন্ধ এই। কিন্তু তাতে কি? বড়লোকের সঙ্গে নিতান্ত তুচ্ছ সম্বন্ধের জের টেনে নিকট আত্মীয়তার প্রচার করা মানুষের আজকালকার অভ্যাস নয়, বহুদিনের।

খাদেম হোসেন একসময় আলীবর্দী খাঁর মেজো জামাই পুর্নিয়ার ছোট নবাব বা ডেপুটি গভর্নর সৈয়দ আহমদের কর্মচারী ছিলেন। পুর্নিয়ার হাড়হদ্দ সব তাঁর জানা। তার উপর হিসেবপাটের ব্যাপারে তাঁর মাথা বেশ সাফ থাকায় তাঁর কাছে খাজনা আদায়-অনাদায়ের হিসাবে জট পাকানো কারো সাধ্য ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে খাদেম হোসেন ছলে-বলে-কৌশলে দু-পয়সার মালিক হতে পেরেছিলেন। এইরকম লোক যখন নিজে সেধে এসে পুর্নিয়ার গদি চেয়ে বসলেন তখন মীর জাফর তাতে না-করতে পারলেন না। মীরন এই লোকটার উপর আদবেই খুশি ছিলেন না, কিন্তু যখন শুনলেন খাদেম হোসেন পুর্নিয়া-অভিযানের সমস্ত খরচ নিজের ট্যাঁক থেকেই চালাবেন তখন তাঁর আপত্তির বেগটা অনেক কমে এল।

খাদেম হোসেন পুর্নিয়ার ফৌজদারি খেলাত পেয়ে গেলেন। কিন্তু তার গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্যে মীরন মীর জাফরেরই এক সহোদর

ভাইকে খাঁদেম হোসেনের সেনাধ্যক্ষ করে সঙ্গে দিলেন। খাদেম হোসেন মনের আনন্দে নৃত্য করতে করতে রাজমহলের দিকে ছুটলেন। সেইখানে নবাবী সৈন্য আর তাঁর নিজের সৈন্যের জড়ো হবার কথা। সেখান থেকে একসঙ্গে গঙ্গা পেরিয়ে তিনি যাবেন পুর্নিয়া অধিকার করতে, মীর জাফর যাবেন আরো পশ্চিমে পাটনায়।

এই সময় ঢাকাতেও একটা ছোট-খাটো উৎপাত লেগে গিয়েছিল। আলীবর্দী খাঁর ঠিক আগের নবাব সরফরাজ খাঁর এক ছেলেকে ঘিরে ঢাকার কতক লোক একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করে শোরগোল লাগিয়ে দিল। কিন্তু সেটা বেশি দূর গড়াতে পারল না। ওখানকার ইংরেজ কুঠির পল্টনদের সাহায্যে ঢাকার ডেপুটি গভনর এক মিনিটেই সব গোলমাল থামিয়ে দিলেন।

মীর জাফর কিছু নগদ টাকা ছেড়ে, কিছু মিষ্টি কথা বলে সৈন্যসামন্তদের একরকম ঠাণ্ডা করে মুর্শিদাবাদ থেকে বাইশ মাইল এগিয়ে গিয়ে গিরিয়ার মাঠে তাঁবু ফেললেন। ক্লাইভ এসে সেইখানে তাঁর সঙ্গে মিলবেন। তখন একত্র পাটনায় গিয়ে রামনারায়ণের ঘাড় মটকাবেন—এই সংকল্প তাঁর মনে মনে রইল। শহররক্ষার ভার পড়ল ছোট নবাব মীরনের উপর। মুখ্যমন্ত্রী দুর্লভরাম বাড়ি ছেড়ে আর বেরোন না, অসুখের ভান করে ঘরের ছেলে ঘরেই পড়ে থাকেন। তাঁর মাইনে করা হাজার সেপাই তাঁকে পাহারা দেয়।

॥ চার ॥

যাঁহাতক নবাব মীর জাফর মুর্শিদাবাদ ছেড়ে বেরোলেন তাঁহাতক মীরন শহরে এক প্রচণ্ড হুলুস্থুল বাধিয়ে বসলেন। সর্বত্র প্রচার করে দিলেন পাটনা থেকে খবর এসেছে, রাজা রামনারায়ণ তাঁর সেপাইশান্ত্রী লোকলশকর নিয়ে তৈরি হচ্ছেন আর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা সদলবলে পাটনায় পৌঁছে গেলেন বলে। দুজনে মিলে একজোটে শিগগিরই বাংলাদেশ আক্রমণ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মীরন আরো রটালেন যে, দিল্লীশ্বর মীর জাফরকে নবাবী পদ থেকে বরখাস্ত করেছেন আর রায় দুর্লভরাম এই ফাঁকে গোপনে সিরাজউদ্দৌলার সব-ছোট ভাই মীর্জা মেহদীকে বাংলার মসনদে বসাবার তোড়জোড় করছেন। মীর্জা মেহদী নিরীহ নিষ্পাপ এক বালকমাত্র। এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয়, এখনো তার মা-দিদিমার একেবারে কোলছাড়া হননি। মীরন সেই রাত্রেই গুণ্ডা লাগিয়ে এই অসহায় ফুটফুটে-চেহারার ছেলেটিকে তাঁর মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনিয়ে দুটো কাঠের তক্তার মাঝে চিপে ফেলে তাঁকে পিষে মেরে ফেললেন। ইয়ারবর্গকে ডেকে বললেন—আরে, সাপ মেরে কি কেউ আর সাপের বাচ্চা জিইয়ে রাখে?

কাশিমবাজার কুঠি থেকে ক্রাফটন-সাহেব এসে পড়ে নগরের শান্তিরক্ষা করলেন। বেচারী মীর্জা মেহদীর হত্যাকাণ্ডে লোকেরা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। তার উপর কানাকানি চলছিল যে মীরন নাকি আলীবর্দী খাঁর বৃদ্ধা বেগম আর তাঁর দুই মেয়ে—ঘসেটি বেগম আর আমিনা বেগম (সিরাজউদ্দৌলার মা)—এই তিনজনকে একসঙ্গে কতল করেছেন। আলীবর্দী খাঁর উপর দেশের সবাকার তখনো অগাধ শ্রদ্ধা, চরিত্রগুণে তাঁর বেগমেরও উপর প্রচুর ভক্তি। আলীবর্দীর পরিবারবর্গের এই ভাগ্যবিপর্যয়ে কি হিন্দু আর কি মুসলমান সবাই বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। তার উপর এইসব হত্যাকাণ্ড। কাশিমবাজার থেকে ইংরেজ পল্টন না-এসে পড়লে সেইদিনই মীরনের এস্পার-ওস্পার একটা-কিছু ঘটে যেত। তবে আসলে তখনো বেগমদের মেরে ফেলা হয়নি, জবাইয়ের জন্যে বন্দী করে রাতারাতি নৌকোয় চড়িয়ে ঢাকায় পাচার করে দেওয়া হয়েছিল।

স্ক্রাফটন এসে মীরনকে করে জেরা করতে সব মিথ্যে ফাঁস হয়ে গেল। কোথা থেকে মীরন এতসব আজগুবি কথা আমদানি করলেন জিজ্ঞেস করায় তিনি সোজা জগৎশেঠদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখতে লাগলেন। শেঠেরা এসে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁরা এসব বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না, প্রচার করা তো দূরের কথা, আপনা-আপনির মধ্যে উচ্চারণও করেননি। স্ক্রাফটনের বুঝতে একটুও দেরি হল না যে, দুর্লভরামকে ধ্বংস করার মতলবে এসব মীরনেরই কারসাজি। দুর্লভরাম নিজে অবশ্য তা অনেক আগের থেকেই বুঝেছিলেন। তিনি আরো বেশি করে ইংরেজদের শরণার্থী হয়ে পড়লেন। তাঁরা অভয় দিলে তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেও পেয়ে যেতে পারেন, নচেৎ মীরনের হাতেই তার শেষ।

ঠিক এই সময় ক্লাইভ চন্দননগর থেকে রাজারামকে সঙ্গে করে নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছলেন। ক্লাইভ সোজা গিরিয়ায় না-গিয়ে মুর্শিদাবাদে আসছেন শুনেই মীরন তাঁকে খুশি করার জন্যে রাজারামের ভাই নারায়ণকে আর তাঁর ছেলে মথুরাকে জেল থেকে খালাস দিয়ে দিলেন। রাজারাম মুর্শিদাবাদ পৌঁছলে এমন তাঁর আদর-আপ্যায়ন লাগিয়ে দিলেন যেন তিনি কতকালের পুরনো বন্ধু। মীরনের মনে যাই থাক না কেন, বাইরে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তিনি ক্লাইভের দাসানুদাস। অভিনয়ে মীরনকে কারো পারার জো ছিল না। মাঝে মাঝে এমনি ভালোমানুষির মুখোশ পরে বসতে পারতেন যে দেখলেই মনে হত যে এ-ব্যক্তি ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানেন না।

মীরন রাজারামকে ছেড়ে দিয়ে দুর্লভরামকে নিয়ে পড়লেন। রোজই দুর্লভরামের বিরুদ্ধে ক্লাইভকে তাতাতে লাগলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সর্বনাশ করার জন্যে এক নতুন ফন্দি মাথা ঘামিয়ে বের করে ফেললেন ক্লাইভের কানে মন্ত্র ঝাড়তে লাগলেন, কটকের মারাঠা সর্দার শিবভট্টের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুর্লভরাম নাকি মীর জাফরকে বাংলার নবাবি থেকে হটাবার ফিকিরে আছেন। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। আসল ব্যাপার এই যে, বর্গীর জ্বালায় অস্থির হয়ে আলীবর্দী খাঁ বাংলাদেশের চৌথের বদলে উড়িষ্যা প্রদেশটা মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু মেদিনীপুরটাকে উড়িষ্যার থেকে বার করে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন। শিবভট্ট সিরাজউদ্দৌল্লার আমল থেকেই মেদিনীপুরের চৌথ দাবি করে ক্ষণে ক্ষণে মুর্শিদাবাদে লোক পাঠাতেন। সিরাজের পর মীর জাফর নবাব হলে সেই একই কথা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দুর্লভরামের

সঙ্গে বোঝাপড়া করার উদ্দেশে শিবভট্টের লোকেরা মুর্শিদাবাদ যাতায়াত করতে লাগলেন। এই থেকে মীরন তিলকে তাল করে হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন।

কিন্তু ক্লাইভের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। অনেক সুদক্ষ অভিনেতার মতো মীরনও মাঝে মাঝে একটু ওভারঅ্যাক্টিং করে ফেলতেন। ক্লাইভ মীরনের কথাগুলো কান পেতে শুনলেন বটে, কিন্তু তাতে কান দিলেন না। মীরন যতই দুর্লভরামের বিরুদ্ধে জোর হুমকি ঝাড়তে থাকেন, ক্লাইভ ততই বেশি করে দুর্লভরামের দিকে ঢলে পড়েন। পলিটিক্সে দুর্লভরামকে এক চৌকস ব্যক্তি ঠাউরিয়ে ক্লাইভ তাঁরই পরামর্শ-মতো উঠতে-বসতে লাগলেন, মীরনকে সাতহাত এড়িয়ে চললেন। পাটনার ডেপুটি গভর্নর রাজা রামনারায়ণের উপর ক্লাইভের এতদিন যে খারাপ ধারণা ছিল সেটা দুর্লভরামের কথায় আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল। দুর্লভ ক্লাইভকে বোঝালেন, বিহার গভর্মেন্টের নাড়িনক্ষত্র সব রামনারায়ণের নখদর্পণে। সেখানকার দুর্ধর্ষ জমিদাররা সবাই তাঁর বশ। তাঁর সুশাসনে প্রজাও সন্তুষ্ট। তাছাড়া রামনারায়ণের নিজেরও অজস্র ধনবল লোকবল, তাই এই ডামাডোলের বাজারে তাঁকে তাঁর স্বস্থানে বসিয়ে রাখলে নবাবের পক্ষে মঙ্গল বই অমঙ্গল নেই। ইঙ্গিতে এও জানাতে ছাড়লেন না যে নবাবের কাছে তাড়া খেয়ে রামনারায়ণ যদি সত্যিই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার হাতে হাত মেলান, তাহলে সেটা কি মীর জাফরের পক্ষে খুব সুখকর হবে। ক্লাইভ কথাটাকে সার বলে মেনে নিলেন। তিনি তাঁর স্বাভাবিক দূরদৃষ্টিতে স্পষ্টই দেখতে পেলেন মীর জাফরকে তাঁবে রাখতে গেলে রামনারায়ণকে অবশ্যই হাতে রাখতে হয়।

কিন্তু দুর্লভরামকে ঘর থেকে কিছুতেই বার করতে পারা গেল না। ভয় ছিল মীর জাফর আর মীরন বাপবেটায় যা তার পেছনে লেগেছেন তাতে পথে বেরোলেই তাঁর পৈতৃক প্রাণটা আর আস্ত থাকবে না। অসুখ বাড়াবাড়ির ভান করে দুর্লভরাম একেবারে বিছানা নিলেন। চুপচাপ অন্দরে বসে থাকলে অবশ্য মান খানিকটা খোয়া যায়, কিন্তু প্রাণটা কোনোক্রমে টিঁকে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু পাছে ক্লাইভ তাঁর ছুতো ধরে ফেলতে পারেন তাই তাঁকে বলে পাঠালেন—এই সময় রাজকার্যের চাপ এত বেশি যে এখন রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র গেলে সরকারী কাজ অচল হয়ে পড়বে, সব কাজ সেরে তিনি পরে বেরোবেন। মনে মনে ভরসা ছিল, ততদিনে নিশ্চয়ই মীর জাফরের সঙ্গে একটা-কিছু বোঝাপড়া হয়ে যাবে।

ক্লাইভ দুর্লভরামকে আর চাপ না দিয়ে নিজেই মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সুবিধার কথা এই যে, কাশিমবাজারে যেসব গোরা পল্টন ছিল তারা ওয়াটস, স্ক্রাফটন, ওয়ারেন হেস্টিংসের চোখের সামনে থাকায় বেলেল্লাগিরি করে অসুস্থ হয়ে পড়েনি। ক্লাইভ তাদেরই সঙ্গে নিয়ে চললেন। গিরিয়ার মাঠে পৌঁছে দেখলেন মীর জাফর তার আগেই রাজমহলের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। ক্লাইভ সেই দিকেই ছুটলেন। রাজমহলের কাছাকাছি পৌঁছে বেখুশ ভাব দেখিয়ে মীর জাফরের ছাউনির থেকে খানিকটা তফাতেই তাঁবু গাড়লেন। ক্লাইভ এসে গেছেন শুনে মীর জাফর পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। নবাবকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে ক্লাইভ তাঁর সমস্ত ফৌজ এক ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে কুচকাওয়াজ শুরু করে দিলেন। রকম-সকম দেখে মীর জাফর ভয়ে একশা হলেন, কি আনন্দে দিশেহারা হলেন, তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে একটু যেন হকচকিয়ে গিয়েই হঠাৎ দশ হাজার টাকা পকেট থেকে বের করে ক্লাইভের সেপাই-পল্টনের মধ্যে বেঁটে দেবার জন্যে বখশিশ করে ফেললেন। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে ক্লাইভের তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, রামনারায়ণ কত-বড় একটা শয়তান। তাঁকে টিট করবার জন্যে এখনি পাটনা যাওয়ার দরকার। পুর্নিয়া সম্বন্ধে তিনি অন্য ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে এখন আর যাবার প্রয়োজন নেই। মিনতি করতে লাগলেন, কর্নেল-সাহেব যেন দয়া করে তাঁর সঙ্গে পাটনা চলেন।

ক্লাইভ এই সুযোগই খুঁজছিলেন। মৌকা পেয়ে তিনি নবাব মীর জাফরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, চুক্তি-মতো কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার আর-এক কিস্তির অর্থাৎ তেইশ লক্ষ টাকা শোধের মেয়াদ পার হয়ে গেছে, এই টাকার একটা ভালো ব্যবস্থা না হলে তাঁর পক্ষে আর একপাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। টাকা না পেলে কলকাতার কাউন্সিল তাঁকে ইংরেজ ফৌজ কিছুতেই সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবেন না। আর শুধু এরই জন্যে মুখ্যমন্ত্রী দুর্লভরামের এখানে উপস্থিত থাকার দরকার, কারণ তাঁরই হাত দিয়ে তো সরকারী টাকার আনাগোনা। মীর জাফর আর কি করবেন? মুখ হাঁড়ি করে বললেন—তাহলে তাঁকে আসতে লিখে দেওয়া হোক। কথাটা মীর জাফরের মুখ দিয়ে বেরোলো মাত্রই ক্লাইভ সেইরকম লিখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিয়ে পাঠালেন মন্ত্রীমহোদয়ের ভালোমন্দ সবেরই জন্যে তিনি নিজে জামিন রইলেন।

সেই চিঠি পাওয়ামাত্র দুর্লভরামের অসুখ সেরে গেল। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে সাজগোজ করতে লেগে গেলেন। দুদিনের মধ্যে দশ হাজার সেপাই

সমেত তিনি রাজমহলের পথ ধরলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন তাঁর নায়েব নন্দকুমার রায়। এ-ব্যক্তির মাথা যেমন সাফ পলিটিক্সে, তেমনি পরিষ্কার ফাইন্যান্সে। সিরাজউদ্দৌলার আমলে নন্দকুমার সরকারী চাকরিতে হুগলির ফৌজদারী তক্ উঠেছিলেন। ইংরেজের অভ্যুদয় সুনিশ্চিত জেনে আরো উন্নতির আশায় সিরাজের নুন খেয়েও তাঁর শত্রুতা করেন। সে-কালে কৃতজ্ঞতাকে একটা ধর্ম বলে কারো ধারণা ছিল না। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হবার পরও নন্দকুমারের শ্রীবৃদ্ধি হল না। এমন কি হুগলির ফৌজদারিটাও হাত-ছাড়া হয়ে গেল। সেটা হাতিয়ে ফেললেন মীর্জা ওমর বেগ। নন্দকুমার কাজের মানুষ, চুপচাপ করে বসে থেকে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া তাঁর ধাতে সয় না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী দুর্লভরামকে ধরে পড়লেন। কায়স্থ দুর্লভরাম শরণাগত ব্রাহ্মণকে আশ্রয় না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

দুর্লভরাম এলে পর মীর জাফর প্রথম কদিন তাঁকে কাছে ঘেঁসতে দিলেন না, দূরে ঠেলে রাখলেন। তখন ক্লাইভ এসে মীর জাফরকে বোঝাতে লাগলেন সুবাদারের সঙ্গে তাঁর দেওয়ানের মুখ-দেখাদেখি না থাকলে রাজকার্য যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এরকম এক অস্বস্তিকর অবস্থার এখনই শেষ হওয়া উচিত। মীর জাফর তো স্থির করেই রেখেছিলেন এইবার দুর্লভরামকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করবেন। কিন্তু ক্লাইভ এমনি ভাব দেখাতে লাগলেন যে এরকম একটা অসম্ভব কথা কোনোক্রমে উঠতেই পারে না। যাই হোক, দুর্লভরাম কাছাকাছি গা-আড়াল দিয়ে ছিলেন, ক্লাইভের ইঙ্গিত পেয়ে ভিতরে এসে নবাবকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। আবার সেই পুরনো প্রেমাভিনয়। কোলাকুলির পর দিব্যি গেলে দুজনে দুজনকে জানালেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কারো মনে কোনো গ্লানি নেই। আসলে সত্য যেখানে নেই সেখানেই শপথ দিব্য প্রভৃতির প্রয়োজন হয় বেশি করে। সত্যের ঠাঁই তো মুখে নয়, বুকের ভিতরে। তাই নিরাভরণতাই হচ্ছে সত্যের স্বরূপ।

যাই হোক, বুদ্ধিমান ক্লাইভ কৌশলে সে-যাত্রাতেই কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার ব্যবস্থাটা করিয়ে নিলেন। দুর্লভরাম দেওয়ানী দপ্তর থেকে নগদ সাড়ে বারো লাখ টাকা বের করে সোজা ইংরেজদের হাতে তুলে দেবার পে-অর্ডার তখনি মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। বাকি সাড়ে দশ লাখ টাকার বরাত দিলেন বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদ, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, আর হুগলির ফৌজদার ওমর বেগ—এই তিনজনের উপর। অর্থাৎ কিনা, পৌষ কিস্তির মালগুজারির টাকা

হুজুর সরকারে হাজির না করে যেন কলকাতার কাউন্সিলের মালখানায় জমা করে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী রায় দুর্লভরামও এমন-কিছু ফেলনা গেলেন না, তিনিও দস্তুরি বাবদ নিজের ভাগে ঐ টাকার উপর পাঁচ পারসেন্ট পেয়ে গেলেন।

গঙ্গা পেরিয়ে ওদিকে খাদেম হোসেন রাজমহল থেকে একটু করে এগোতে এগোতে পুর্নিয়ায় গিয়ে উঠলেন। এর আগেই তিনি তাঁর পূর্বের পরিচিত হোমরা-চোমরাদের সবাইকে জানিয়ে দিযেছিলেন তিনি আসছেন, নবাব মীর জাফর আলী খাঁ বাহাদুর তাঁকে পুনিয়া-ফৌজদাবির খেলাত দিয়েছেন। আরো জানালেন তিনি গিয়ে বসলেই সবাইকে যথাযথ বখশিশ দিয়ে খুশি করে দেবেন। হাজীর আলী তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে শহরের বাইরে সুড়ঙ্গ কেটে তারি মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্য বলতে সেপাই-বরকন্দাজ কিছুই নয়, কতকগুলো চাষাভুষোর হাতে ঢাল তলোয়ার লাঠি সড়কি দিয়ে সাজিয়ে সৈন্য করা হয়েছে। তারা যেমনি ভীতু, ঠিক তেমনি দুর্বল। একটু-কিছু গুরুতররকম দেখলেই হাতিয়ার ফেলে চোঁ-চা দৌড মারে—তাতে তাদের বিন্দুমাত্রও লজ্জা-শরম নেই।

খাদেম হোসেন পাঁচ হাজার পয়দল সেপাই আর দু-হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে আসছেন শুনেই এইসব ভূতভয়গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত-মস্ত বীরপুরুষরা বাঁশ-পাতার মতো কাঁপতে শুরু করে দিল। হাজীর আলী এদের ঠাণ্ডা করার জন্যে মোহনলালের ধনরত্ন লুঠে যা পেয়েছিলেন তারই খানিকটা বের করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ফলে টাকাও গেল লোকও ভাগল।

ওদিকে খাদেম হোসেনও অনেকটা এগিয়ে এসে থমকে গেলেন। ভীতু তিনিও বড কম নন। তাঁরও মনে বিষম ভয়, না-জানি শত্রুপক্ষের কতখানি বল? তিনি মীর জাফরকে খবর পাঠিয়ে দিলেন বাকি যেসব নবাবী সেপাই তাঁর সঙ্গে দেবার কথা ছিল তাদের যেন অবিলম্বে রাজমহল থেকে পুর্নিয়ায় পাঠানো হয়। তিনি তখনো জানতে পারেননি যে হাজীর আলীর সৈন্যরা ছোড়ভঙ্গ। তারা খবর পেয়েছে ইংরেজ পল্টন রাজমহল পৌঁছে গেছে। আর তাদের রোখে কে? সেনাপতিদের অনেকেই খাদেম হোসেনের চিঠি পেয়ে নিজের নিজের দল ভাঙিয়ে নিয়ে গভীর রাত্রে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছেন।

মীর জাফর খাদেম হোসেনের চিঠি পেয়ে ব্যাপারটা উল্টো বুঝলেন। তিনি ভাবলেন, খাদেম হোসেন নিশ্চয় কি-একটা কিস্তিমাতের তালে আছেন। আশঙ্কা হল, বুঝি-বা সুবিধা পেয়ে খাদেম হোসেন শত্রুপক্ষের

সঙ্গে যোগই দিয়ে বসেছেন। তিনি খাদেম হোসেনের সে-চিঠির জবাব না দিয়ে নিজের ভাই মীর কাজেমকে হাজীর আলীর সঙ্গে লড়ে যেতে হুকুম করে পাঠালেন। মীর কাজেমকে লড়াইয়ের তোড়জোড় করতে দেখে খাদেম হোসেনের চৈতন্য উদয় হল। আর স্থাণু হয়ে না থেকে তিনি উঠে পড়ে হাজীর আলীকে তাড়া করলেন। হাজীর আলীর লোকজনের বেশির ভাগই তখন পলাতক। নিজেও ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। কতক্ষণ আর যুঝবেন? ও-পক্ষ গোলাগুলি ছোঁড়বার আগেই তিনি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। অচলসিংহ তো নামেই সিংহ—যুদ্ধের সময় শেয়ালেরও অধম। লড়াইয়ের নাম শুনে অবধিই লুকিয়ে আছেন। তাকে টেনে বের করতে খুব বেশি দেরি হল না। খাদেম হোসেন সোজা গিয়ে সৈয়দ আহমদের চারমহলা বাড়ি দখল করে বসলেন। এক নিমেষে সমস্ত পুর্নিয়া তাঁর কবজায় এসে গেল।

পুর্নিয়াজয়ের খবর পেয়ে মীর জাফর নিশ্চিন্ত হয়ে পাটনাযাত্রার উদ্যোগ করতে লেগে গেলেন। এই সময় মীর জাফরকে হাতে পেয়ে ক্লাইভ তাঁকে স্পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করে বসলেন—পাটনা যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা কি? ক্লাইভ বেশ জানতেন যে মীর জাফর রাজ্য-পরিদর্শনে বেরোননি, রাজা রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করবার জন্যেই তাঁর পাটনাযাত্রা, কিন্তু দুলভরামের পরামর্শে রামনারায়ণকে তাঁর স্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে মহাত্মা ক্লাইভ এই একটা চাল চাললেন, সকলের সামনেই এ-বিষয় একটা ফয়সালা করে নেবার মতলবেই ক্লাইভের এই পায়তারা কষা।

মীর জাফর বিষম ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তাঁর উভয়সংকট। মনের কথাটা খুলে বলতে পারেন না যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা, রামনারায়ণকে হটিয়ে বিহার-গভর্মেণ্টের ভার তাঁর দাদা মীর কাজেমের হাতে সমর্পণ করা। আবার কথাটা একেবারে বেমালুম চেপে যেতেও পারেন না, তাহলে ক্লাইভ ধরে নেবেন যে রামনারায়ণকে স্বপদে বহাল রাখতে নবাবের কোনোই আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কিছু তো বলতেই হয়। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে ক্লাইভ না হলে তাঁর একপা কোথাও এগোনো সম্ভব নয়—তিনি এমনি করে নিজের হাত-পা নিজেই বেঁধেছেন। কিন্তু তবুও তিনি গ্যাঁইগুঁই করতে লাগলেন, একটা-কিছু পরিষ্কার মীমাংসা করলেন না।

অনেক কথা-কাটাকাটির পরও ক্লাইভ যখন দেখলেন কথাটা তেমন এগোচ্ছে না তখন তিনি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। ভয় দেখালেন রাজা রামনারায়ণ যদি সত্যি-

সত্যি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দেন, তখন তাঁদের ঠেকাবে কে? বিহারের সব মাতব্বর জমিদারই রামনারায়ণের অনুগত। রামনারায়ণ গেলে মীর জাফর হাজার ডাকলেও তাঁদের কাউকে নিজের দিকে আনতে পারবেন না। ভয় আরো বেশি করে ঢোকাবার জন্যে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, গতিক যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে বোধ হয় তাঁকে সব সেপাই পল্টন নিয়ে দক্ষিণ দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। তখন প্রাণের বন্ধু নবাব-সাহেবকে রামনারায়ণ, সুজাউদ্দৌলা, জাঁ ল—এঁদের সকলের সঙ্গে একা একাই লড়তে হবে। আর বেশি-কিছু বলতে হল না। সুর দু-পর্দা নামিয়ে মীর জাফর জানালেন, রামনারায়ণ যদি তাঁর তাঁবে থেকে তাঁকে নবাব বলে মেনে চলেন তাহলে তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন। এটা নবাবের শুধু মুখের কথা, মনে মনে বললেন—একবার তো কোনো ক্রমে পাটনায় পৌঁছনো যাক, তারপর দেখে নেওয়া যাবে কে কার মুণ্ডপাত করে।

খুশি হয়ে ক্লাইভ রামনারায়ণকে লিখে পাঠালেন—তৈরি থাকো। নবাব-বাহাদুর পাটনার কাছাকাছি পৌঁছলেই তুমি তাঁর তাঁবুতে এসে দেখা দেবে, কাতরভাবে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। তোমার ধন-প্রাণ-মান সবেরই দরুন আমি জামিন রইলুম। কোনো ভয় নেই। মীরজাফরও ক্লাইভকে দেখাবার জন্যে গোবিন্দমল্ল বলে এক বিশ্বাসী কর্মচারীকে আগেভাগে পাটনায় পাঠিয়ে দিলেন। নবাব সেখানে পৌঁছবার আগেই যেন তিনি রামনারায়ণের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গোড়া থেকে সব ঠিকঠাক করে রাখেন।

পাটনাযাত্রা শুরু হল। ক্লাইভ তাঁর গোরা পল্টন আর কালা সেপাই নিয়ে আগে আগে চলেছেন, মাঝখানে হাতির পিঠে মুখ্যমন্ত্রী রায় দুর্লভরাম, তাঁকে ঘিরে হাতিয়ারবন্ধ হয়ে চলেছে তাঁর খাস সৈন্যসামন্ত লোকলশকর। তারপর নবাবের কামানবারুদ গোলাগুলি রসদরোশনাই সাজসরঞ্জাম। সবশেষে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার-সাহেব নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলী মহবত্ত খাঁ বাহাদুর আর তাঁর সঙ্গে চলেছে হরেক রং-এর হরেক ঢং-এর একপাল বাইজী কসবী নাচওয়ালী তবলচী সারেঙ্গী।

একটা বছর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। ১৭৫৭ সাল গিয়ে ১৭৫৮ সাল এসে হল।

পাঁচ ॥

বামনারায়ণ ধবেই নিয়েছিলেন, এবাব তাঁব শেষদশা, মীব জাফবেব হাতে তাব ধন প্রাণ দুই-ই যাবে। তিনি আত্মবক্ষাব উদ্যোগে লাগলেন। পাটনা ঢোকাব মুখে তিবিশ মাইলেব মধ্যে যেখানে যত পুল সাঁকো ছিল সেও সং লোক লাগিয়ে ভেঙে সাফ কবিযে দিলেন। তাবপব ফতোয়া থেকে পাটনা পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় চৌকিদাব বসিয়ে এমন ব্যবস্থা কবলেন যাতে তাঁব হুকুম ছাড়া শহব থেকে কেউ যেন বেরোতে না পাবে, আব ঢুকতেও না পারে। বামনাবায়ণ এব আগেই মীব জাফবেব দূত গোবিন্দমল্লকে প্রচুর টাকাকড়ি কবলিয়ে তাকে হাতেব মুঠোব মধ্যে এনে ফেলেছেন। বামনাবায়ণ তখনো জানতে পাবেননি যে, তাঁব সম্বন্ধে ক্লাইভেব মত বদলিয়েছে।

এইরকম টাল-বেটাল চলছে, এমন সময় ক্লাইভেব অভয়বাণী নিয়ে এক চিঠি এসে পৌছল। চিঠি পড়ে বামনাবায়ণ সব তোড়জোড় তখনি বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে অকপটে ক্লাইভেব হাতে সঁপে দিয়ে জবাব লিখে দিলেন। জানিয়ে বাখলেন, তিনি শিগগিব কর্নেল সাহেবেব ক্যাম্পে গিয়ে চক্ষু সার্থক করে আসবেন। সাহেব যা বলবেন তিনি তাই কবতে প্রস্তুত। তিনি রাখলে রাখতে পাবেন, মাবলে মাবতে পাবেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দমল্লকে যা বলবার বলে গোপনে শলাপরামর্শ দিয়ে নবাবেব ছাউনিতে পাঠিয়ে দিলেন। ক্লাইভকে লেখা চিঠি তাঁবই মাবফত চলে গেল।

নবাবকে দেখা দেবাব আগে গোবিন্দমল্ল কৌশলে নবাবেব খাসমুনশীকে দলে টেনে নিলেন। গোবিন্দমল্ল জানতেন, নবাব মীব জাফব খাঁ আব যাব ধার ধাবেন না কেন, লেখাপড়াব ধার ধারা তাঁর ধাতে সয় না। সেই সঙ্গে এও জানতেন যে, প্রত্যহ দুপুবে খাওয়া-দাওয়াব পর একমাত্রা ভাঙ চড়িযে যখন তিনি ঝিমতে থাকেন, তখন তাঁব কাছ থেকে কাজ হাঁসিলের শুভক্ষণ। তিনি ঠিক সেই সময়ই হাজির হয়ে নবাবকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। জোড় হাত করে নিবেদন কবলেন, বাজা রামনারায়ণ বলে পাঠিয়েছেন যে, কর্নেল ক্লাইভ নিজে যদি তাঁকে ডেকে পাঠান তাহলেই তিনি আসবেন, নচেৎ যা থাকে কপালে বলে একহাত দেখবার জন্যে তৈরি আছেন। তাতে শেষ পর্যন্ত কি হে

দাঁড়াবে তা কিছুই বলা যায় না, কারণ রামনারায়ণের বল নবাববাহাদুরের প্রায় কাছাকাছি যায়।

নেশার ঘোরে মীর জাফর এতে অমত করার কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তাক বুঝে গোবিন্দমল্ল পকেট থেকে একটা চিঠির খসড়া বের করে নবাবের চোখের সামনে ধরে বললেন—তাহলে এইরকম একটা চিঠি কর্নেল-সাহেবকে দিইয়ে রামনারায়ণকে লেখানো যাক। নবাব মাথা ধরার ভান করে খানিক উঃ আঃ করে জানালেন, মাথার যন্ত্রণায় তিনি চোখে কিছুই ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না। গোবিন্দমল্লকে খসড়াটা পড়ে শোনাতে বললেন। গোবিন্দমল্ল যা পড়ে শোনালেন সেটা খসড়ার ধারেপিঠেও যায় না, সেটা একটা মামুলী চিঠি। নবাব শুনে তখনি তথাস্তু বলে খাসমুনশীকে তলব করলেন। মুনশী এলে তাঁকে খসড়াটা ফেয়ারকপি করে গোবিন্দমল্লের হাতে দিতে বলে দিলেন। বলেই তিনি শুতে চলে গেলেন। গোবিন্দমল্ল ফেয়ারকপিটা হাতে পেতেই সোজা ক্লাইভের তাঁবুতে গিয়ে সেটা তাঁকে দিলেন।

ক্লাইভ নিজে এইরকমই একটা চিঠি রামনারায়ণকে পাঠাবেন বলে মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন। এখন তাতে নবাবের সায় আছে দেখে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন। ফেয়ারকপির হুবহু একটা নকল করিয়ে তার উপর সই করে শীলমোহর মেরে দিলেন। খাসমুনশীর হাতের লেখা ফেয়ারকপিটা সযত্নে ডেসপ্যাচ বক্সে তুলে রাখলেন। গোবিন্দমল্ল ক্লাইভের চিঠি হাতে নিয়ে সোজা পাটনা রওনা দিলেন, আর নবাবের তাঁবুর দিকে ঘেঁষলেন না। তাঁর মুখ থেকে সব ব্যাপার শুনে আর স্বচক্ষে ক্লাইভের চিঠি পড়ে রামনারায়ণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করা স্থির করে ফেললেন। কর্নেল-সাহেব স্বয়ং যখন তাঁর প্রাণমানের জামিনদার হয়েছেন তখন আর ভয় কি? পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে একটা শুভদিন দেখে তিনি পাটনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ক্লাইভ যখন তাঁর সেপাই-পল্টন নিয়ে পাটনার কাছ-বরাবর এগিয়ে এসেছেন তখন রামনারায়ণ ইংরেজ ছাউনিতে গিয়ে কর্নেল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। গোবিন্দমল্ল যদিও তাঁকে সর্বাগ্রে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তবু রামনারায়ণ আগেভাগে কর্নেল ক্লাইভকেই সেলাম ঠুকে রাখা উচিত বিবেচনা করলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের পলিটিক্সের দাবাখেলায় ইংরেজরাই এখন বোড়ের কিস্তি। ক্লাইভ প্রচুর সমাদরে হাত বাড়িয়ে রাজা রামনারায়ণকে গ্রহণ করলেন। মিষ্টি কথা বলে তাঁকে একেবারে

গলিয়ে দিলেন। সুবে বাংলাব আর-একটি প্রধান ইংরেজদেব হাতধরা হয়ে পড়লেন।

ক্লাইভেব সঙ্গে বোঝাপড়া কবে উইলিয়ম ওয়াটসকে সঙ্গে নিয়ে বামনাবায়ণ নবাবেব তাঁবুতে হাজিব হলেন। গোড়ায় একেবাবে একলা গিয়ে নবাবেব হাতে-পড়াটাকে তিনি কোনোক্রমেই বুদ্ধিব কাজ বলে মনে কবলেন না। নবাবও পেটেব কথা মুখে না এনে বামনাবায়ণকে আদব-আপ্যায়ন কবে কুশল প্রশ্ন কবলেন। শিষ্টাচাবপর্ব শেষ হবাব পব নির্দেশ দিলেন, বামনাবায়ণ যেন নিজেব লোকজন নিয়ে নবাবের পিছন পিছন চলতে থাকেন। সবাই সহজে ধবে নিতে পাবল, নবাব-দববাবে বামনাবায়ণের খাতিব এখন কতটুকুন। আর পলিটিক্স নিয়ে যাবা ঘাঁটাঘাঁটি কবেন তাঁদেব বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না যে ইংবেজদেব কাছ থেকে বামনাবায়ণকে দূবে সবিয়ে বাখাটাই নবাব-বাহাদুরেব আসল উদ্দেশ্য। তবে তাতে বামনাবায়ণেবও একটা সুবিধা হয়ে গেল— ক্লাইভ সতর্ক হয়ে বোজই খোঁজখবব নিতে লাগলেন, বামনাবায়ণ ঠিক আছেন কি না।

পাটনা এসে গেল। প্রথমে ইংবেজদেব শহবে ঢুকতে দেখলে পাছে লোকেব মনে ধাবণা জন্মে যায় যে ইংবেজ ফৌজ নবাবী ফৌজেব অনেক উঁচুতে, তাই মীব জাফব তাড়াতাড়ি তাব এক বিশ্বাসী সৈন্যাধ্যক্ষকে শহবে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে নবাব শহবে পা দেবাব আগে যেন কাউকেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া না হয়। কিন্তু ক্লাইভ এসে যখন সসৈন্যে নগবেব ভিতব যেতে চাইলেন তখন সৈন্যাধ্যক্ষ খোজা হাদী তাকে নবাবেব হিতৈষী বন্ধুলোক জেনে আব না-কবতে পারলেন না। ক্লাইভ অবশ্য শহবেব মাঝখানেই তাঁবু গাড়লেন না, ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে পাটনাব পশ্চিম প্রান্তে যেখানে ইংবেজদেব কুঠি ছিল সেইখানেই তাঁব ছাউনি ফেললেন। ক্লাইভ এক চালে মীব জাফরেব সমস্ত প্ল্যানই মাটি কবে দিলেন।

বাগে ফুলতে ফুলতে পোড়া হাঁড়িব মতো মুখ কালো কবে নবাব মীব জাফর পাটনা শহবে ঢুকলেন। পিছন পিছন বাজা বামনারায়ণ। নবাব যা মনে কবেছিলেন ঠিক তাই ঘটল। ব্যাপার দেখে লোকদেব মনে হল, আসলে ক্লাইভই বিজয়ী বীর, মীর জাফর তাঁব এক ক্ষুদ্র সেনানায়ক মাত্র। নবাব তো ক্লাইভের কিছু করতে পারেন না, তাই তাঁব যত কোপ সব গিয়ে পড়ল বেচারী রামনারায়ণের উপর। মনে মনে ক্লাইভকে শাপ-শাপান্ত করে মীর জাফর মতলব আঁটলেন. বাগে পেলে ক্লাইভের পেটোয়া রামনারায়ণকে তিনি একহাত

দেখে নেবেন। পাছে রামনারায়ণ গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে একটা কোনো বিশ্রী কাণ্ড করে বসেন সেই ভয়ে নবাব-সাহেব ক্লাইভকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর দলবল নিয়ে বাঁকিপুর চলে যান। আবার দুদিন পরে খবর দিলেন, নবাব স্বয়ং বাঁকিপুরে থাকা মনস্থ করেছেন, ক্লাইভ যেন দানাপুরে গিয়ে ওঠেন। সেখানকার জলহাওয়া অতি উত্তম, কর্নেল-সাহেব সেখানে আরামেই থাকবেন। গোঁল পাকছে বুঝতে পেরে ক্লাইভ বেশি দূর না গিয়ে গঙ্গার মধ্যিখানের একটা চরে আড্ডা গাড়লেন।

পাটনা শহরে পা দিতে-না-দিতেই মীর জাফর রামনারায়ণের কাছ থেকে বিহার প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের হিসেব তলব করে বসলেন। প্রমাদ গুনে রামনারায়ণ তাঁর অবস্থাটা গোপনে ক্লাইভের কর্ণগোচর করালেন। ক্লাইভ এইরকমই একটা-কিছু হবে বলে আশঙ্কা করছিলেন। তিনি নন্দকুমারের মারফত মীর জাফরকে বলে পাঠালেন, নিজের ও দেশের মঙ্গল চাইলে নবাব-বাহাদুর যেন এইসব দুরভিসন্ধি সত্বর ত্যাগ করেন। শুনে মীর জাফর রাগে ফেটে পড়ে চিৎকার করে নন্দকুমারকে বললেন—কর্নেল-সাহেব ভেবেছেন কি? এত বড় একটা রাজত্ব আমি অন্যের হাতে তুলে দি। আর আমার নাড়ির সম্পর্কের লোকেরা রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াক? বাংলার মসনদে বসে আমি তাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি? মীর জাফরের মতলব পাটনার ডেপুটি গভর্নরগিরিতে তাঁর বড় ভাই মীর কাজেমকে বসানো।

নন্দকুমার ফিরে গিয়ে ক্লাইভকে সব কথা খুলে বললেন। আসল ঘটনার উপর যে খানিকটা রং চড়ালেন সেকথা বলাই বাহুল্য। ক্লাইভ যখন যেমন তখন তেমন। নরম হতে যেমন জানেন তেমনি আবার গরমও হতে পারেন। তাঁর এক হাত নবাবের পায়ে আর-এক হাত তার গলায়, পায়ে ধরতে যতক্ষণ গলা টিপতেও ততক্ষণ। আর লোক পাঠানো বৃথা জেনে তিনি মীর জাফরকে এক চিঠি লিখে বসলেন। তাতে খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন যে কলকাতা ছেড়ে অত দূর পাটনায় আসতে তিনি গোড়ায় নারাজই ছিলেন। নবাবের ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদে মাথা গলাতে তাঁর কোনোই ইচ্ছা ছিল না। শুধু নবাব-সাহেবের অনুরোধে পড়েই তিনি এতদূর এসেছেন। নবাব তাঁকে ধরেই রামনারায়ণকে আশ্বাস দিইয়েছেন। নবাবেরই কথায় রামনারায়ণের ভালোমন্দর জন্যে তাঁকে দায়ী হতে হয়েছে, তাঁকে অভয় দিয়ে নবাবের কাছে আনিয়েছেন। এখন তাঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে নবাব যদি বিপরীত ব্যবহার করেন—ক্লাইভকে

দিইয়েই যদি ক্লাইভের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করান, লোকসমাজে তাঁকে যদি শঠ বলে প্রমাণ করতে চান—তাহলে সেসব নবাবী কাণ্ড হতে পারে, কিন্তু তা ঠিক ইংরেজদের রীতি নয়।

সবই ক্লাইভের ছল। পাটনায় না-আসবার ইচ্ছা, এদেশের পলিটিক্সে নামবার অনিচ্ছা—সবই মিথ্যে। কার্যোদ্ধারের জন্যে না-পারেন এমন কোনো কাজ ক্লাইভের জানা ছিল না। তাঁর ষোলো আনা ছেড়ে আঠারো আনা চেষ্টা যাতে নবাবের রাজ্যের সমস্ত বড-বড় ঘাঁটিতে ইংরেজদের অনুগত দেশী লোকেরা কায়েম হয়ে বসেন। এদেশের এক দল লোককে অপর দলের পিছনে লাগিয়ে রেখে সূক্ষ্মভাবে ব্যাল্যান্স অভ্ পাওয়ারের কারবার নিজেদের হাতে রাখতে ইংরেজরা পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। আর এই লুকোচুরি-খেলার সদার-খেলুড়ে ছিলেন কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ, যিনি পরে হন লর্ড রবার্ট ক্লাইভ, ব্যারন অভ্ প্ল্যাশী।

ক্লাইভের চিঠির সুরটা একটু বেশি গরম দেখে মীর জাফর খানিক ঘাবড়ে গেলেন। ব্যাপারটা যে আসলে কি, সেটা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তাই নিয়ে সাতসতেরো কি যে ভাবতে লাগলেন তা নিজে-নিজেই জানেন। ক্লাইভের রামনারায়ণকে লেখা চিঠির আসল বৃত্তান্ত তো তাঁর জানা ছিল না। রামনারায়ণকে কি লেখা হয়েছে জানতে চাইলে ক্লাইভ তাঁর ডেস্প্যাচ বক্স খুলে সেই ফেয়ারকপিটা বের করলেন। মীর জাফর সেটা পড়িয়ে নিতে গিয়ে যা শুনলেন তাতে একেবারে থ বনে গেলেন। গোবিন্দমল্ল তাকে কি শোনালেন আর খাসমুনশী খসড়া থেকে কি ফেয়ারকপি করলেন? তিনি দুজনকেই জোর তলব করলেন। গোবিন্দমল্ল এসে হাতজোড় করে জানালেন—হুজুরের মর্জি-মতোই তো খসড়া করা হয়েছিল আর সেই খসড়াই তো মুনশী-সাহেব অবিকল ফেয়ারকপি করে দেন, আর ঠিক সেইটেই তো তিনি কর্নেল-সাহেবের কাছে পেশ করেন। হুজুরকে সব সময়ই সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় কিনা, তাই এই সামান্য চিঠির কথাটা বোধ হয় হুজুরের স্মরণ নেই। গোবিন্দমল্লের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে মীর জাফর ধাঁধা খেয়ে গেলেন। ভাবলেন, বুঝি-বা কোনো-এক সময় তিনি সত্যিই ঐ খসড়াই মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু এখন তো তা আর কিছুতেই মনে পড়ছে না।

যাই হোক, মীর জাফর তবু ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু তা বেশি দিনের জন্যে নয়, কারণ শিগগিরই নাগপুরের মারাঠী রাজা জানোজী ভোঁসলের প্রধান কটাকের ডেপুটি গভর্নর শিবভট পাটনায় এসে দেখা দিলেন।

ভদ্রলোকের মতো তাঁর মুখে সব সময় একই কথা—মেদিনীপুরের চৌথ দাও। এই তো গেল এক বিপদ আবার ওদিকে, কর্মনাশা নদী পেরোলেই ওপারে ওত পেতে বসে আছেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। ফরাসী কাপ্তান জাঁ ল এখন তাঁরই আশ্রয়ে আছেন। ল-সাহেবের গোরা পল্টন সংখ্যায় কম হলেও লড়াইয়ে ইংরেজদের সমান দড়। শিবভট্ট যদি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে বসেন তাহলে তো দফা রফা। এ-অবস্থায় কর্নেল-সাহেবকে কিছুতেই চটানো চলে না। তাছাড়া ইংরেজ জাতের উপর মীর জাফরের মন এখন যতই বিরূপ হয়ে উঠুক না কেন, ক্লাইভের উপর তাঁর মনে সত্যিকারের টান ছিল। ক্লাইভ তাঁর জন্যে কি কম করেছেন? ক্লাইভ সহায় না থাকলে কি করে তিনি সুবে বাংলার নবাব বনতেন? কে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিয়েছিলেন? সে তো ওই কর্নেল-সাহেবই। আপদে-বিপদে কে তাঁকে রক্ষা করে এসেছেন? ক্লাইভ ছাড়া তার কে আছে আর? সকলেই তো তাঁর উপর বিরূপ। গণ্যমান্য সবাই তো একে একে তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন, শুধু কর্নেল-সাহেবই তাঁকে ছাড়েননি। কিন্তু মীর জাফর ঘুণাক্ষরে টের পাননি তাঁর সম্বন্ধে ক্লাইভের সত্যিকারের ধারণাটা কি! ক্লাইভ চিঠিতে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের কাছে রসিয়ে রসিয়ে নবাবের চরিত্রের যা গুণকীর্তন করে গেছেন সেটা আর যাই হোক না কেন, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতো একটা ব্যাপার মোটেই নয়।

মীর জাফর আর কালহরণ না করে দরবার ডেকে বসলেন। প্রচার করে দিলেন, সেই দরবারে রামনারায়ণকে পাটনার ডেপুটি গবর্নরের খেলাত দেওয়া হবে। কিন্তু দানের মধ্যেও মীর জাফরের বেনে-বুদ্ধি। রামনারায়ণকে সরাসরি পাটনার গদিতে না-বসিয়ে বসালেন নিজের উপযুক্ত পুত্র মীরনকে। তাঁর অনুপস্থিতে রামনারায়ণ তাঁরই নায়েব হয়ে রাজ্যশাসন করবেন। এতে হল কি—রাজ্যের সব দায়ধাক্কা রামনারায়ণই পোয়াবেন, মীরন মুর্শিদাবাদে বসে বসে আরামে বিহারের রাজস্বের একটা মোটা অংশ ভাগ পেতে থাকবেন, তার জন্যে তাঁকে কড়ে আঙুলটুকুও নাড়তে হবে না। এত হাঙ্গাম-হুজ্জুতের মধ্যেও মীর জাফর হিসেবনিকেশের কথাটা ভোলেননি। কিন্তু ব্যাপারটাকে আর-বেশি না রগড়িয়ে রামনারায়ণের কাছ থেকে নগদ সাতলাখ টাকা আদায় করে পকেটে পুরে বিহার-রাজস্বের বাকি-বকেয়া সব রোকশোধ করে নিলেন। বড়-বড় জমিদারেরা যাঁরা দরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও নজরানা বলে যা আদায় হল তার অঙ্কটাও কিছু কমের দিকে নয়।

কিন্তু বেনে-বুদ্ধিতে ইংরেজদের কাছে আমাদের নবাব-বাদশারা তো দুগ্ধ-পোষ্য শিশু। ক্লাইভ যখনি লক্ষ্য করলেন, প্রচুর নগদ টাকা হাতে পেয়ে মীর জাফরের মন-মেজাজ শরিফ আছে তখনি তিনিও কোম্পানীর তরফ থেকে নবাব-দরবারে এক আর্জি পেশ করে বসলেন। বিহার প্রদেশে তখন প্রচুর পরিমাণে সোরা পাওয়া যেত। সবচেয়ে ভালো পাওয়া যেত ছাপরা জেলায়। হুগলির বিখ্যাত আর্মানী সওদাগর, খোজা ওয়াজেদ, নবাব-সরকারে ঘুষঘাষ দিয়ে এই সোরার মেয়াদী ইজারা প্রতিবারই নিজে পেয়ে যেতেন। সোরার ব্যবসায় তখন অসম্ভব লাভ। এতে বারুদ তৈরি হত বলে সেকালে ইওরোপে এর চাহিদা ছিল খুব বেশি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে ক্লাইভ যখন ঐ সোরার জমা চেয়ে বসলেন তখন মীর জাফর একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। খাজনার সঙ্গে পেশকাশ বলে তাঁর আমলা যে উপরি দু পয়সা আদায় হত সেটা তো তিনি কর্নেল সাহেবের কাছে চাইতে পারেন না, শুধু ন্যায্য খাজনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে ন্যায্য পাওনায় কেই বা সন্তুষ্ট থাকতে পারত? নবাব থেকে আরম্ভ করে পাইক-পেয়াদা নগদি কেউই উপরি না পেলে পাওয়ার কোনো স্বাদই বুঝতে পারত না। অথচ ক্লাইভের কাছে উপরি চেয়ে মীর জাফর খাটো হতে পারেন না। নবাবকে দোমনা হতে দেখে ক্লাইভ এক আঁচেই বুঝে নিলেন ব্যথাটা কোথায়। তিনি ন্যায্য খাজনার সঙ্গে বছরে বিশ হাজার মন করে সোরা নবাবকে ফাউ দিতে স্বীকার হয়ে সব বন্দোবস্ত পাকা করে নিলেন।

এইবার সকলে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করতে লেগে গেলেন। সুবিধা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী দুর্লভরাম ফাঁকতালে গয়ায় গিয়ে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান কাজটা সেরে এলেন। নবাব মীর জাফরও বিহারশরিফে পীরের দরগায় শিন্নি চড়াতে গেলেন। সকলে ফিরব ফিরব করছে ঠিক অমনি সময় মীর জাফরের নামে দিল্লির বাদশার মোহর-করা নবাবী সনদ এসে হাজির হয়ে গেল। এতদিন তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সুবার গদিতে বসে নবাবি করতে থাকলেও সুবেদারিতে পাকা হতে পারেননি, এইবার তাও হলেন। চারিদিকে ঘটা পড়ে গেল। মীর জাফর শখ করে নবাব আলীবর্দী খাঁর মহাবতজঙ্গ টাইটল নিজে নিলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন, এই টাইটল নিলেই লোকে তাঁকেও আলীবর্দী খাঁর মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করবে। হায় রে দুরাশা। কি হিন্দু আর কি মুসলমান কাউকে নিঙড়িয়েও মীর জাফর কখনো এক ফোঁটা ভক্তি আদায় করতে পারেননি। এখন থেকে মীর জাফরের গালভরা পোশাকী নাম হল—

সুজা-উল্-মুল্ক হুসেনউদ্দৌলা মীর মুহম্মদ জাফর আলী খাঁ মহাবতজঙ্গ বাহাদুর।

ক্লাইভও ফেলনা গেলেন না। তিনিও বাদশার কাছ থেকে ছ-হাজারী মনসাবদারি পেয়ে দিল্লির এক ওমরাও বনে গেলেন। এর আগেই দক্ষিণে থাকার সময় তিনি আর্কটের নবাবের কাছ থেকে টাইটল পেয়েছিলেন সাবুতজঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধে অপরাজেয়—এইবার দিল্লির বাদশা টাইটল দিলেন নওশেরউদ্দৌলা, অর্থাৎ কিনা বীরপ্রবর। ক্লাইভ ফার্সী অক্ষরে এই নামের এক শীলমোহর বানিয়ে নিলেন। কিন্তু খুশি না হয়ে ক্লাইভ এতে খুঁতখুঁত করে বেড়াতে লাগলেন। ওমরাও তো হলেন বটে, কিন্তু জাইগির কই? জাইগির ছাড়া শুধু কাগজে-কলমে ওমরাও বনে লাভটা কি হল? এই সব ফাঁকা টাইটলে তো আর পেট ভরবে না?

এখন আর বাইরের শত্রু একটিও রইল না। ক্লাইভ পাটনা পর্যন্ত এসে গেছেন শুনে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা চুপ, মারাঠারাও কোনো উচ্চবাচ্য করে না। মীর জাফরের নবাবিটাও ভেস্তে যাবার জোগাড় হয়েছিল, সেটাও ক্লাইভের চেষ্টায় দিল্লির দরবার থেকে পাকা হয়ে এল। এখন আর মীর জাফরকে পায় কে? তিনি এইবার ক্লাইভের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির মতলব ভাঁজতে লাগলেন—কর্নেল-সাহেব একবার পাটনা থেকে বেরোলেই হয়, তখন মীর জাফর দেখে নেবেন কে রামনারায়ণকে রক্ষা করে, কে তাঁর দাদা মীর কাজেমকে পাটনার গভর্নরি থেকে ঠেকিয়ে রাখে? মীর জাফর একবার পাটনা থেকে বেরোন, আবার ফিরে আসেন।

ক্লাইভের চোখে ধুলো দেওয়া মীর জাফরের কর্ম নয়। ক্লাইভ এ সব বিষয়ে ধুরন্ধর। তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে এমন লোক তখন বঙ্গদেশের ত্রিসীমানায় ছিল না। তিনি বগড় দেখে যেতে লাগলেন। মীর জাফর পাটনা থেকে বেরোন, সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভও অন্যদিক থেকে খানিক দূর এগোন। আবার মীর জাফর শহরে ফিরলে তিনিও অন্য পথ দিয়ে সেখানে ফিরে আসেন। ক্লাইভ জানেন মীর জাফরকে চোখে চোখে না রাখলে তাঁর অসাধ্য কোনো অকাজ-কুকাজ নেই। কিন্তু খেলা ভালো জমল না। কেননা, ক্লাইভ আগের থেকেই আটঘাট সব বেঁধে রেখেছেন। নবাবকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিয়েছিলেন যতদিন ধরে ইংরেজ ফৌজ নবাবের কাজে কলকাতার বাইরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তিনি তার খরচ বাবদ মাস মাস এক লাখ করে টাকা গুনে যাবেন। যত দিন যাচ্ছে টাকার অঙ্ক ততই বেড়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই

দু-মাসের টাকার খেলাপও হয়ে গেছে। মীর জাফর এতদিনে ইংরেজদের একটু চিনেছেন। তারা সব ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পাওনা টাকার এক কানাকড়িও ছাড়তে হলে ভিরমি যেতে থাকে।

অবশেষে মীর জাফর খেলায় ইস্তফা দিলেন। এই সেদিন এক হাজার যণ্ডাকার্কা ভোজপুরিয়াকে ক্লাইভ তাঁর দেশী লাল পল্টনে ভর্তি করে নিয়েছেন। এদেরও ভাতা মীর জাফরের ঘাড় থেকে আদায় হবে। আর কথাটি না কয়ে সুবোধ বালকের মতো মীর জাফর সুড়সুড় করে গঙ্গার উপর সাজানো ময়ূরপঙ্খী বজরায় গিয়ে উঠলেন। পাত্র-মিত্র সবাই একে একে নৌকো চড়ে মুর্শিদাবাদ রওনা হলেন। মাঝে মাঝে নৌকো থেকে পথে নেমে মীর জাফর বনে-উপবনে শিকার খেলেন। মাঝে মাঝে কুঞ্জবনে ঢুকে কসবী নাচওয়ালীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদেও মত্ত হয়ে ওঠেন। কোনো তাড়া নেই। ধীরে সুস্থেই নবাব-বাহিনী রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

ক্লাইভের পাটনা-অভিযান আসলে একটা মিলিটারী ক্যাম্পেন নয়, তাকে পলিটিকল ক্যাম্পেন বলে উক্তি করলে সেটা একটুও অত্যুক্তি হবে না। তাও আবার একেবারে নিখরচায়। সব খরচার জোগান দিলেন নবাব মীর জাফর খাঁ বাহাদুর। ক্যাম্পেনের ফল ভালোই হল। বিদূষক মীর্জা শামসুদ্দীন মীর জাফরকে যে ক্লাইভের মদ্দা গাধা বলে রহস্য করেছিলেন সেটা যে মোটেই হাসিঠাট্টার কথা নয়, একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি, তা বেশ ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেল। ডেপুটি গভর্নর, জায়গিরদার, জমিদার, সরকারী চাকুরে, ফৌজী জঙ্গী থেকে আরম্ভ করে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই একাধারে বুঝে নিয়েছিলেন এখন কার্যোদ্ধারের জন্যে কার কাছে ছুটতে হবে, কোন্ মহাবৃক্ষকে সেবা করলে ফলচ্ছায়া দু-লাভই কে ঠেকাতে পারে?

॥ ছয় ॥

এদিকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে বসে ছোট নবাব মীরন ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা দেখতে শুরু করে দিলেন। একবার যেন শুনলেন, রামনারায়ণ নবাবের ছাউনিতে পা দেওয়া মাত্র নবাব তাকে কোতল করেছেন। পর মুহূর্তেই আবার শুনলেন, টিকারির রাজা সুন্দরসিংহ নাকি দুর্লভরামের উসকানিতে গভীর রাতে নবাবের তাঁবুতে ঢুকে ঘুমন্ত নবাবকে তলোয়ারের এক কোপে দু-খানা করে ফেলেছেন। শেষে নবাবের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে গেলেন যে তার দু দুটো প্ল্যানই মাঠে মারা গেছে। অর্থাৎ ক্লাইভ মহারাজা দুর্লভরামকে সর্বদা চোখে চোখে রাখায় নবাব তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেননি, আর নবাবের সমস্ত ফন্দির জাল ছিঁড়ে ক্লাইভ রাজা রামনারায়ণকে পাটনার ডেপুটি গভর্নরিতে কায়েম করে বসিয়ে দিয়েছেন—নবাবকে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে।

এমন অবস্থায় কি করি কি করি বলে মীরন যখন মনে মনে সাতপাঁচ ভেবে বেড়াচ্ছেন তখন আবার খবর এল, মহারাজা দুর্লভরামকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দোরগোড়া ভগবানগোলায় পৌঁছে গেছেন আর নবাব-বাহাদুর অনেকখানি পিছনে পড়ে ঢিকুতে ঢিকুতে আসছেন। এই খবর পাওয়া মাত্র মীরন সারা শহরে এক প্রচণ্ড হৈ-হল্লা লাগিয়ে দিলেন। সর্বত্র রাষ্ট্র করে দিলেন তাঁকে ধরে বন্দী করবার উদ্দেশ্যেই দুর্লভরামকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে এগিয়ে আসছেন। লোকে সত্যমিথ্যা বিচার না করেই ভয়ে একশা। দেখতে দেখতে দোকানপাট বাজারহাট ঘরদোর সব বন্ধ হয়ে গেল। বড়লোকেরা তাঁদের ধনরত্ন পরিবারবর্গ সামাল দিতে শহর ছেড়ে দূরে পালাতে লাগলেন। এমন কি অত বড় মহাজন জগৎশেঠেরাও বেগতিক বুঝে কাজ-কারবার বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভিতর চুপচাপ বসে রইলেন।

মীরন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মুরাদবাগ ছেড়ে মতিঝিলে গিয়ে উঠলেন। চারিদিকে বলে বেড়াতে লাগলেন যে তিনি আর রাজধানীতে ফিরছেন না, নবাব-বাহাদুরের কাছে চলে যাচ্ছেন। আত্মরক্ষার জন্যে যদি তাঁকে ক্লাইভের সঙ্গে লড়াইও করতে হয়, তাতে তিনি একটুও পেছপাও নন। ব্যাপার শুনে

ক্লাইভ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ইয়া এক ধমক লাগিয়ে মীর জাফরকে পত্রাঘাত করলেন। তাতে বললেন, এরকমটা হলে তিনি আর এক দণ্ডও বঙ্গদেশে থাকবেন না, দক্ষিণে চলে যাবেন। ক্লাইভের চিঠি পেয়ে শিকেবখেলা হাসিমস্করা বঙ্গতামাশা মীর জাফরের মাথায় উঠল। আপাতত সেসব স্থগিত রেখে তিনি অর্ডার দিলেন—কুইক্ মার্চ।

গোলমালের খবর পেয়ে ততক্ষণে নবাব দরবারের নতুন ইংরেজ রেসিডেন্ট লুক স্ক্রাফটন কাশিমবাজার থেকে মতিঝিলে এসে মীরনকে মাথাঠাণ্ডা করতে উপদেশ দিতে লাগলেন। স্ক্রাফটনের কথায় মীরন খানিকটা শান্ত হয়ে ক্লাইভের কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন। ক্লাইভ হাঁ না কিছুই বললেন না, রাগে গুম হয়ে রইলেন। মীর জাফরের মুর্শিদাবাদ ফেরা পর্যন্তও অপেক্ষা করলেন না, তাঁর পৌঁছবার দুদিন আগেই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন।

আসলে ক্লাইভের কলকাতা ফেরাটা খুবই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুর্শিদাবাদ পৌঁছতেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে দক্ষিণে ফরাসীরা আস্তে আস্তে বেশ চাগিয়ে উঠেছে। ইংরেজদের জাহাজী ফৌজের সঙ্গে ফরাসী মানোয়ারী জাহাজের বেশ-একচোট ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে, তাতে ইংরেজরাই খানিকটা কাবু হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ক্লাইভ মিথ্যে রবে রটালেন যে, ইংরেজরা ফরাসীদের দু-দুটো যুদ্ধের জাহাজ ডুবিয়ে ছেড়েছেন। লোকদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মিথ্যে রটালেও এ-অবস্থায় ক্লাইভের দক্ষিণে না-গেলে আর চলে না, কারণ তখনো তিনি মাদ্রাজ গভর্মেণ্টেরই তাঁবেদার। কিন্তু কলকাতা ফিরেও ক্লাইভ ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর মনে মনে দারুণ আশা যে কোম্পানী তাঁকে বাংলাদেশেই রাখবার একটা বন্দোবস্ত করবেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে না-গিয়ে তাঁর ডান হাত কর্নেল লায়নেল ফোর্ডের সঙ্গে পাঁচশো গোরা পল্টন আর দু-হাজার দেশী সেপাই দিয়ে তাঁকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিলেন। আর কোম্পানীর খাতে মীর জাফরের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় হয়েছিল তার সবটাই উজাড় করে সেদিকে চালান করে দিলেন।

এই সময় ক্লাইভকে নিয়ে কলকাতার সাহেব-মহলেও একটু সাড়াশব্দ পড়ে গিয়েছিল। জুন মাসের শেষাশেষি হারডউইক বলে কোম্পানীর এক জাহাজ লণ্ডন থেকে এসে ফোর্ট উইলিয়ম ঘাটে নোঙর ফেলল। এই জাহাজে করেই কোম্পানীর ডিরেক্টররা বেশ-একটা গুরুগম্ভীর ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন—রোজার ড্রেক্‌কে কলকাতার গভর্নরি থেকে বরখাস্ত করা হল, কিন্তু তাঁর জায়গায় অন্য একজন কাউকে গভর্নর না করে তার বদলে এক বড় অদ্ভুত

রকমের শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এখন থেকে দশজন মেম্বর নিয়ে এক কাউন্সিল হবে, আর সেই কাউন্সিলের চারজন সিনিয়র মেম্বর পালাক্রমে এক-একজন তিন মাস করে প্রেসিডেন্ট—অর্থাৎ কলকাতার গভর্নর—থাকবেন। তখনকার সিনিয়র মেম্বরদের পর পর চারজন হচ্ছেন—উইলিয়ম ওয়াটস, চার্লস ম্যানিংহ্যাম, রিচার্ড বিচার, আর হচ্ছেন অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর রচনাকার জন্ জেফানায়া হলওয়েল। এঁরা সকলেই পুরনো লোক, সকলেই পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই এদেশে আছেন। এঁদের মধ্যে হলওয়েল নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতে বেজায় নাস্তানাবুদ হওয়ায় শরীর শোধরাবার দরুন ছুটি নিয়ে এর কিছুদিন আগেই দেশে ফিরে গেছেন। ডিরেক্টরদের এই হ-য-ব-র-ল শাসনবিধানের মধ্যে হলওয়েলের হাতচালানো স্পষ্টই ধরা পড়ে যায়। বয়েসে সবচেয়ে বড় হলেও কলকাতার কাউন্সিলে হলওয়েলের স্থান অনেকটা নীচে। প্রোমোশন পেয়ে পাকা গভর্নব হওয়া তাঁর কপালে কস্মিন-কালেও নেই বলেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। সুতরাং ফন্দি-ফিকির করে তিনিই তাঁর উবর মস্তিষ্ক থেকে এই রোটেশন গভর্মেন্টের প্ল্যান বার করেছিলেন। এতে অন্তত্পক্ষে বছরে তিনটে মাস করেও তো তিনি কলকাতার গভর্নরি করতে পারবেন।

ডিবেক্টরদের ডেসপ্যাচ পড়ে এই আবোল-তাবোল গভর্মেন্টের নির্দেশ পেতে কলকাতার কাউন্সিলবা তো হতভম্ভ মেরে গেলেন। ডেসপ্যাচে ডিরেক্টররা তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি দেখে ক্লাইভ তো অভিমানে মুখ গোমড়া করে রইলেন। কিন্তু ক্লাইভের এ-অভিমানেব কোনো মানে হয় না। কারণ তখনো পর্যন্ত ডিরেক্টররা ঘুণাক্ষরে জানতেন না যে পলাশীর যুদ্ধ শেষ করে ক্লাইভ তাঁর স্বস্থান মাদ্রাজে ফিরে যাননি, বঙ্গদেশেই রয়ে গেছেন, আর এদেশের পলিটিক্সে একটা কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠেছেন। অবস্থা তখন এমনি দাঁড়িয়েছে যে, দেশী মহাশয়দের যেমন ক্লাইভকে নইলে চলে না তেমনি এদেশে যেসব ইংরেজ আছেন তাঁদেরও পক্ষে ক্লাইভকে ছেড়ে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। এসময় ক্লাইভ না-থাকলে তাঁরা যতটুকু এগিয়েছেন ঠিক ততটাই তাঁদের পিছু হটতে হবে। তাঁদের সমস্ত প্রতিপত্তি তাসের কেল্লার মতো এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ওদিকে ডাচ আর ফরাসীরা মুখ উঁচিয়ে আছে কখন বঙ্গদেশ থেকে ক্লাইভ বিদায় হন, তাহলে তাঁদের পোয়াবারো, তখন তাদের আর ঠেকায় কে?

দক্ষিণ থেকে খবর এল, কাউন্ট লালীর কাছে একের-পর-এক লড়াইয়ে

ইংরেজরা হেরে মরছে। লালী অনেকদূর এগিয়ে গেছেন, মাদ্রাজের তো যায় যায় অবস্থা। এমন সময় ক্লাইভকে চটিয়ে রাখাটা কোনো কাজের কথা নয় ভেবে, কাউন্সিলের যে-কজন সিনিয়র মেম্বর তখন কলকাতায় ছিলেন তাঁরা সবাই এককাট্টা হয়ে ক্লাইভকে ধরে পড়লেন, তিনি যেন অভিমান করে দূরে সরে থেকে ইংরেজদের সর্বনাশ না-ঘটান। তাঁরা কেউ ই প্রেসিডেণ্ট হতে চান না। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, কর্নেল ক্লাইভ যেন কলকাতার গভর্নরের পদ গ্রহণ করে তাঁদের কৃতার্থ করেন। ক্লাইভকে বেশি বলতে-কইতে হল না, এক পা তাঁর বাড়ানোই ছিল, আর বাক্যব্যয় না-করে সুড়সুড় করে গিয়ে তিনি সোজা ড্রেকের ছেড়ে-যাওয়া চৌকিতে চড়ে বসলেন। বছর শেষ হতে-না-হতেই সব বৃত্তান্ত জানতে পেরে ডিরেক্টররা ক্লাইভকে সেই পদেই পাকা করলেন, যে-পদ তিনি আগের থেকেই অধিকার করে বসেছেন।

এবার আর দক্ষিণে ইংরেজদের হারের কথাটা মীর জাফরের কাছ থেকে লুকোনো রাখা গেল না। ফরাসীদের জয়ের কথা শুনে মীর জাফরের মনে একটু আশা-ভরসা জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন, এইবার বুঝি খোদাতালা দয়া করে তাঁর সমস্ত গোস্তাকি মাফ করে মুখ তুলে চাইলেন। ইংরেজদের নাগপাশ থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যে আল্লা ফরাসীদের ত্রাণকর্তা করে বঙ্গদেশে পাঠাবেন। মীর জাফর ভবিষ্যৎ আশার ছলনায় ভুলে বর্তমানেই গরমে দিশেহারা হয়ে লাফাতে লাগলেন। তবে ইংরেজদের তাড়াবার আগে তাঁর গৃহশত্রুদের ধ্বংস করা নিতান্ত দরকার। মীর জাফর আগে সেই দিকেই মন দিলেন। দুর্লভরামকে এখন তাঁর সবচেয়ে বড় গৃহশত্রু বলে মনে হল তাই নবাব প্রথমে তাঁকে নিয়েই পড়লেন।

এর খানিক আগেই নবাবের গুণধর পুত্র মীরন দুর্লভরামের পিছনে লেগে গিয়েছিলেন। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে দু-পা যেতেই তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সেই সময় মীরনের দেওয়ান হয়েছিলেন রাজা রাজবল্লভ, ঢাকার বৈদ্য। ইনি প্রথমে আলীবর্দী খাঁর বড় জামাই নওয়াজিস খাঁ-র আর তারপর তাঁর বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের দেওয়ান ছিলেন। রাজবল্লভের মনে প্রবল ভাবনা, কি করে দুর্লভরামকে হটিয়ে তিনি নিজে সুখে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবেন। সুযোগ উপস্থিত বুঝে তিনি দুর্লভরামের কাছ থেকে মীরনের জাইগিরের হিসেবপত্র চেয়ে পাঠালেন।

ওদিকে মীর জাফরও দুর্লভরামের পিছনে এক ফেউ লাগিয়ে দিলেন। এটি আর কেউ নন স্বয়ং নন্দকুমার রায়, যাঁকে নিরাশ্রয় দেখে দুর্লভরামই কৃপা করে

আশ্রয় দিয়েছিলেন, কাজের লোক দেখে এক বড় সরকারী কাজে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। শেষে দেওয়ানী দপ্তরের প্রধান সেরেস্তাদার করে নিজের সঙ্গে করে পাটনায় নিয়ে গিয়ে নবাব মীর জাফর আর কর্নেল ক্লাইভের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের নেকনজরে পড়ার সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লাইভ যখন কিছুতেই মীর জাফরের দেওয়া বরাতী টাকা আদায় করতে পারছেন না, বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, হুগলির ফৌজদার ওমর বেগ যখন কিছুতেই উপুড়হস্ত হবার নামগন্ধও করছেন না তখন নন্দকুমারই উপযাচক হয়ে ক্লাইভকে জানালেন যে জমিদার ফৌজদার সবারই ওজর-আপত্তি মিথ্যে অছিলা, টাকা না-দেবার মতলব। কর্নেল-সাহেব যদি তাকে ইংরেজদের তরফের মোক্তার করেন, আর নবাব-সরকার যদি টাকা আদায়ের পুরো ভার তাঁর হাতে দেন, অর্থাৎ তিনি যদি অনাদায়ের দরুন জমিদার ফৌজদারদের কয়েদ করার ক্ষমতা পান, তাহলে দু-দিনেই তিনি ইংরেজদের প্রাপ্য টাকা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে দিতে পারেন।

নন্দকুমার মনে মনে বিবেচনা করে দেখলেন, যদি বরাত-জোরে এই কাজটি সত্যি সত্যিই শিকে ছিঁড়ে তার হাতে এসে পড়ে, তাহলে এ-সুত্রে তাঁর পকেটে উপরি যা আসবে তাতে তিনি হুগলির ফৌজদারি না-পাওয়ার শোক অনেকটাই ভুলতে পারবেন। কিন্তু এ-পথে মস্ত কাঁটা স্বয়ং দুর্লভরাম। তিনি থাকতে উপরির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। রাজস্ব-ব্যাপারের অন্ধিসন্ধি দুর্লভরামের সবই জানা। তাঁর চোখ এড়িয়ে উপরি দু-পয়সা কামানো কারো সাধ্য ছিল না। সুতরাং দিনের-পর-দিন নন্দকুমার গোপনে দুর্লভরামের বিরুদ্ধে নবাবের কানে মন্তর ছাড়তে লাগলেন। হিসেবপত্রের ব্যাপারে নন্দকুমারের পাকা মাথা। রাজস্বের আয়ব্যয়ের হিসেবে ফাঁকফোঁক ধরে দিয়ে তিনি দুর্লভরামকে হয়রান করে তুললেন। অকৃতজ্ঞতাকে শাস্ত্রের একটা পাপ বলে বর্ণনা করা থাকলেও এদেশের লোকেরা অনেক দিন থেকেই সেটাকে মানা ছেড়ে দিয়েছিল।

দুর্লভরাম বুঝলেন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, আর রক্ষা নেই। শেষে এমন হল যে তিনি আর বাইরে পা বাড়াতে পারেন না। আংটির মধ্যে বিষ পুরে রেখে তিনি ঘরের ভিতরই চলাফেরা করতে বাধ্য হলেন। যদি শেষ পর্যন্ত মীর জাফর কি মীরনের হাতে ধরা পড়েন তাহলে বিষ খেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটিয়ে যাতে অন্তত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান তার ব্যবস্থা করে রাখলেন। অবস্থা বুঝে দুর্লভরাম নবাবের কাছে নিবেদন করে পাঠালেন—তাঁকে এখানকার

বসবাস উঠিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। মীর জাফর পুরনো বন্ধুর অনুনয়-বিনয় একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, দুর্লভরামকে কলকাতা যেতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন তস্য পুত্র মীরন। তিনি হুমকি ঝেড়ে হুকুম পাঠালেন, সেপাই পল্টনের বকেয়া মাইনে সব চুকিয়ে না-দিয়ে দুর্লভরাম কোথাও একপা নড়তে পারেন না। বাকি মাইনের জন্যে দুর্লভরামের বাড়ি ঘেরাও করতে সেপাইদের লেলিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে বাঁধন ছিঁড়ে নবাব পাছে তার হাতছাড়া হয়ে পড়েন, এই ভয়ে ক্লাইভ তাঁকে খুশি করবার জন্যে কলকাতা আসার নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। ওয়াটস ক্লাইভের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসে নবাবকে জানালেন—ক্লাইভ এখন ইংরেজদের সর্বময় কর্তা হয়েছেন, তার এই গৌরব তিনি নবাবের সঙ্গে ভাগ করে একত্র ভোগ করতে চান। ক্লাইভের উপর মীর জাফরের তখনো এমনি মায়া যে ওয়াটসের মিষ্টি কথা শুনেই তিনি ঢাকা থেকে বজরা আনাবার হুকুম দিলেন, তাতে চড়ে তিনি কলকাতা যাবেন। কয়েক দিন পরই ঢাকাই বজরা অগ্রদ্বীপের ঘাটে এসে ভিড়ল। সেইখানেই নৌকো চড়বেন বলে ওয়াটসকে সঙ্গে করে মীর জাফর লোকজন নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

নবাব রাজধানী ছেড়ে বেরোতে-না বেরোতেই সবকারী সেপাইরা এসে দুর্লভরামের বাড়ি ঘেরাও করে ফেললে। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল—রুপেয়া নিকালো, রুপেয়া নিকালো। আর থাকতে না-পেরে দুর্লভরামের সেপাইরা তাদের তাড়া করে গেল। রক্তপাত হয় হয়, এমন সময় জনকতক ইংরেজ পল্টন সঙ্গে নিয়ে ক্রাফটন-সাহেব কাশিমবাজার থেকে এসে পড়ায় ব্যাপারটা বেশিদূর আর গড়ালো না। সাহেব মাঝে পড়ে দু-দলকেই নিরস্ত করলেন। অবস্থা সঙিন হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই খবর দিয়ে লুক ক্রাফটন ওয়াটসের কাছে হরকরা ছুটিয়ে দিলেন। ওয়াটস তখন সেই পুরনো নবাবী সড়ক ধরে মনকরা পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন, হরকরার মুখে ব্যাপার শুনে তিনি সমস্ত কথা মীর জাফরকে জানালেন। নবাব যেন এসবের কিছুই জানেন না, এমনি ভান করতে লাগলেন। ওয়াটস কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার উপর তাঁর এক মস্ত সুবিধা ছিল, তিনি অতি চোস্ত ফার্সীতে অনর্গল কথা চালিয়ে যেতে পারতেন। মীর জাফরের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তির পর তাঁর কাছ থেকে দুর্লভরামকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় যাবার হুকুম আদায় করে তবে তিনি ছাড়লেন।

হুকুমনামা নিয়ে ওয়াট্‌স মুর্শিদাবাদ পৌঁছলেন একেবারে টায়েটায়ে। ছোট নবাব মীরন বেশ জানতেন, ইংরেজরা তাঁদের প্রিয়পাত্র দুর্লভরামকে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবেনই তাই তিনি সেপাইদের হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন ধরে-বেঁধে যাহোক করে যেন মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে ফেলা হয়। কিন্তু হঠাৎ ওয়াটস এসে পড়ায় সেটা আর হল না। ওয়াটস আর স্ক্রাফটন দুজনে মিলে মুর্শিদাবাদের ঘাট থেকেই দুর্লভরামকে নৌকোয় তুললেন। ওয়াটস অগ্রদ্বীপে আর ফিরে গেলেন না, দুর্লভরামকে নিয়ে সোজাসুজি কলকাতাতেই ফিরে চললেন। দুর্লভরামের পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদে পড়ে রইলেন, লুক্‌ স্ক্রাফটন তাঁদের দেখবেন-শুনবেন তদারক করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে দুর্লভরামকে খানিকটা নিশ্চিন্ত করলেন।

নবাব মীর জাফর ময়ূরপঙ্খী বজরায় আরামে হেলতে-দুলতে হুগলিতে গিয়ে উঠলেন। সেটা তাঁরই রাজত্বের শেষ বড় ঘাঁটি। তাঁর পুরনো বন্ধু ওমর বেগ তখন সেখানকার ফৌজদার। মীর জাফর সেখানে মনের আনন্দে কতকদিন কাটিয়ে গেলেন। একদিন স্বয়ং গভনর ক্লাইভ আর প্রধান প্রধান ইংরেজরা এসে তাঁকে কুটুম্ব-সমাদরে রাজকীয় সমারোহে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ফেললেন। সেখানে কত খানাপিনা, কত নাচগান, থিয়েটার, বাজি-পোড়ানো দিনের-পর-দিন ধরে চলল যে তার আর কি বলব? সব নিয়ে সে এক এলাহী কারখানা, সারা শহর জুড়ে শোরগোল। এর উপর কত রকমের উপহার-দ্রব্যে ইংরেজরা মীর জাফরের ঘর বোঝাই করে দিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। সব নিয়ে এই সামান্য কদিনে লাখ টাকার উপর খরচ হয়ে গেল। আজকালকার হিসেবে সে যে কত লাখ টাকা তা অঙ্ক কষে কে বের করবে? মীর জাফর বড়ই খুশ মেজাজে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

দুর্লভরাম হাতের বাইরে যেতে মীরন তাঁর তিন ভাই বৃন্দাবনচন্দ্র, রাসবিহারী আর কুঞ্জবিহারীকে নিয়ে পড়ে ছিলেন। কিন্তু মীর জাফর তখন দিল-দরাজ থাকায় তিনি আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাইলেন না। রুই-কাতলাই যখন সুতো ছিঁড়ে পালালো তখন চুনো-পুঁটি ধরে তাঁর কি আর হবে? নবাব দুর্লভরামের পরিবারবর্গকে ইংরেজদের হেফাজতে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। দুর্লভরাম তারপর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭৭২ সাল) ইংরেজদেরই আশ্রিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁর বিষের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, ছিল কেবল কুলোপানা চক্র। তবে মানুষের রক্তের স্বাদ একবার পেলে বাঘের যেমন অন্য আর-কিছুতে মন ওঠে না, তেমনি পলিটিক্সে যে-মানুষ

একবার নেমেছে সে-আন্দোলনার কর্তারা শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। দুর্লভরামও সুবিধা পেলেই এখানে-ওখানে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ত্রুটি করতেন না, আজ এর সঙ্গে কাল ওর সঙ্গে মিশে খুচখুচ করে কিছু-না-কিছু লাগিয়েই রাখতেন। দুর্লভরামের ছেলে রাজবল্লভ ইংরেজদের আওতায় ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলেন।

কলকাতা থেকে ফেরবার পর সেই বছরের শেষ চার মাস মীর জাফরকে বাইরের আর-কোন হাঙ্গাম পোয়াতে হয়নি। দক্ষিণে ফরাসীরা খানিকটা কাবু না-হওয়া পর্যন্ত ক্লাইভ তাঁর রাশ একটু আলগা রাখাই উচিত মনে করলেন ফলে হল কি, প্রজাদের উপর—তা সে কি হিন্দু আর কি মুসলমান, কি বড় আর কি ছোট সব প্রজার উপর—নবাবের আর মীরনের অত্যাচার রীতিমতো বেড়ে উঠল। বক্সী মীর কাজীমকে তো ঘুড়ি ওড়াবার নাম করে বাড়ি ডেকে এনে মীরন খুন করলেন। সেনাপতি খোজা হাদীকে ভয়ে দেশত্যাগ করতে হল। তবে তিনি বেশি দূর যেতে পারেননি, পথে রাজমহলে মীর জাফরের ভাই মীর দাদুদের হাতে পড়ে তাঁর প্রাণ গেল। মীর জাফর আর মীরন কয়েকটি অবলা স্ত্রীলোকের উপর চোট দেখিয়ে বীরত্ব ফলাতে লাগলেন। আলীবর্দীর মহিষী, তাঁর দুই কন্যা—ঘসিটি বেগম, আর সিরাজের মা আমিনা বেগম—সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুতফউন্নিসা বেগম, সিরাজের শিশুকন্যা উম্মুতুল-জিন্না—এঁদের সকলকে বন্দী করে সামান্য লোকের মতো চোর-ছ্যাচড়দের হাবুজখানায় পুরলেন। এমনি পৌরুষ! কিছুদিন পরে আবার একদিন লোকদের ভয়ে নিশুতি রাতের অন্ধকারে অন্ধকারে নৌকোয় চড়িয়ে তাঁদের ঢাকায় পাচার করে দিলেন।

আরো-একটা বছর শেষ হল। ১৭৫৮ সাল অতীতের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল।

॥ সাত ॥

১৭৫৮ সালের গোড়ার দিকেই উল্কাপাতের মতো এক উৎপাত শুরু হয়ে গেল তার ফলে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছেড়ে সুদূর পাটনার উপরই সকলের দৃষ্টি পড়ল দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরের বড় ছেলে, শাহজাদা আলী গোহর, ধূমকেতু মতো পাটনার দেউড়িতে এসে উদয় হলেন।

ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বোঝাতে গেলে দিল্লি-দরবারের খানিকট কেচ্ছা শোনাতে হয়। এই ঘটনার অনেক আগের থেকেই দিল্লিতে বাদশা চেয়ে তাঁর উজিরের প্রাধান্যই বেশি হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উজিরই তৈমুর বংশের কাউকে টেনে এনে দিল্লির সিংহাসনে বসাচ্ছেন, আবার মর্জিমতে সেখান থেকে নামাচ্ছেনও। মোদ্দা কথা এই যে সেই সময় বাদশার উজিরদের হাতের পুতুল আর উজিররা তাদের মনিবের মনিব। যে-সময়ে কথা বলা হচ্ছে, সেই সময় হিন্দুস্থানের উজির ইমাদ-উল্-মুল্‌ক, যাঁর ডাকনা ছিল ঘাজীউদ্দীন।

ঘাজীউদ্দীন বাদশা মহম্মদ শার আমলের বিখ্যাত উজির, আসফ ঝা নিজাম-উল্-মুল্‌কের নাতি। নিজাম যেমনি ফার্স্ট ক্লাশ যোদ্ধা ছিলেন, আবার তেমনি ছিলেন এক ধুরন্ধর ডিপ্লোম্যাট। বিজ্ঞানীদের মুখে শোনা যায় মানুষের গুণাগুণ নাকি অনেক সময় ছেলেতে না বর্তে নাতিতে গিয়ে অর্সায় কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমেই এই নিয়মের প্রমাণ। পৌত্র ঘাজীউদ্দীন পিতামহ আসফ ঝার ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। কতকগুলো নির্জীব নিরী অকর্মণ্য মোগল বাদশা আর শাজাদার উপর অত্যাচার করেই তিনি বীর ফলাতেন, বলবান শত্রুর হাতে পড়লে একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে যেতেন ইনি আবার দক্ষিণ থেকে মারাঠাদের হিন্দুস্থানে ডেকে এনে ডিপ্লোম্যাসী চরম পরিচয় দিয়েছিলেন। সে-কূটবুদ্ধি আর কহতব্য নয়। এতটুকুও তাঁ জ্ঞান ছিল না যে মারাঠাদের আনা যত সোজা, বের করা তার চতুর্গুণ শক্ত এ সেই আরব্যোপন্যাসের সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পের বুড়োর মতো—একবা ঘাড়ে চাপলে ঘাড় থেকে তাকে নামানো দায়।

ঘাজীউদ্দীন বাদশা মহম্মদ শার ছেলে আহম্মদ শার সময় তার উজি

হাস্তজামউদ্দৌলাকে হটিয়ে তার জায়গায় নিজেই সয়ং বাদশার উজির হয়ে বসেছিলেন। কিছুদিন গেলে, হিন্দুস্থানের তেমন সুবিধা হচ্ছে না দেখে, দিল্লির তখ্‌তাউস থেকে আহম্মদ শাকে নামিয়ে দিল্লি ফোর্টের ভিতর যে বাদশাহী বন্দিখানা ছিল তাতেই তাঁকে আর তাঁর মাকে পুরে দিলেন। ঘাজী-উদ্দীন শেষে আহম্মদ শা আর তাঁর মা উধমবাঈকে অন্ধ করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন। মোগল ইতিহাস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখা যায় যে এই অন্ধ করে দেওয়া ব্যাপারটা সেকালে পলিটিক্সেরই একটা অঙ্গ ছিল। তাছাড়া একেবারে মেরে না-ফেলে জ্যান্তে-মরা করে রাখলে রাজপুরুষদের বোধ হয় তাতে আমোদ হত ঢের বেশি।

ওই একই বাদশাহী কয়েদখানা থেকে ঘাজীউদ্দীন যাঁকে বের করে এনে দিল্লির সিংহাসনে বসালেন, তাঁর নাম মহম্মদ আজীজউদ্দীন। দিল্লির সিংহাসন তখন আর সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসন নয়, সে-সিংহাসন লুঠের মালের সঙ্গে দির শা তাঁর স্বদেশ পারস্যদেশে পাচার করেছিলেন। তখন সোনার জায়গায় গিল্টি-করা, মণিমুক্তার বদলে লাল-নীল রঙের কাঁচ-বসানো, নকল ময়ূরতখ্‌ত। তারই উপর বসেন তৈমুরলঙ্গের বংশধররা। আওরংজীবের ছেলে শা আলম র শা, তাঁর ছেলে জহান্দর শা, আর তাঁরই ছেলে মহম্মদ আজীজউদ্দীন। তখন তিনি পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ। তখ্‌তে উঠে নাম নিলেন, প্রপিতামহ আওরংজীবের নকল করে আলমগীর শানি, অর্থাৎ দ্বিতীয় আলমগীর। কিন্তু ধু নাম নিলে কি আর হবে? কাজের বেলায় যারা অষ্টরম্ভা তাঁরাই তো বাক্যে হাবীর। চোদ্দ বছর বয়েসে লড়াইয়ে বাপ মারা যাওয়ায় সেই যে দিল্লি ফোর্টের বন্দিখানায় ঢুকেছিলেন, আর এই বেরোলেন। তাতে করে এইটুকু ভ হয়েছিল যে চারদিক-ফুটো নৌকোর মতো মোগল সাম্রাজ্যের হাল বার উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁর না জন্মালেও অতদিন কয়েদখানার ভিতর বন্ধ কায় [illegible] মন্দ করার শক্তিও তেমন গজায়নি।

আসলে আমরা যাঁদের ভালোমানুষ বলি, অর্থাৎ অকর্মণ্য বলে মনে করে , বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর অনেকটা সেই ধরনের মানুষ। পুঁথিপত্র লেখাপড়া নিয়েই আছেন, বিলাস-ব্যসন চালিয়াতি লোক-দেখানো আড়ম্বর ইত্যাদি তাঁর কিছুই ছিল না। আর থাকবেই বা কোথা থেকে? রাজকোষে সামান্য া-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা সবই তো ফাঁক করে দিয়েছেন উজির ঘাজীউদ্দীন। কাছেপিঠের খাস বাদশাহী জাইগির থেকে যেটুকু খাজনা গৃহমাগতম্ ত তাতে বাদশার বৃহৎ পরিবারের খাওয়া-পরাই ভালো করে চলা দায়,

বিলাস-ব্যসন তো বহু দূরের কথা। দিল্লীশ্বরের বাইরের চিকনচাকনও আর তেমন নেই, সর্বত্রই খড়ের গাদন উঁকি মারছে।

এ-হেন এক নিরীহ বাদশাকে নিয়ে উজির ইমাদ-উল্-মুল্‌ক ঘাজীউদ্দীনের দিন একরকম চলে যাচ্ছিল বেশ, কিন্তু গোল বাধল বাদশার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাজাদা আলী গোহরকে নিয়ে। শাজাদা দেখতে যেমন সুপুরুষ, আবার শিক্ষাদীক্ষা আদব-সহবতেও ঠিক তেমনি তোখোড়। উজিরের সর্দারি তাঁর অসহ্য হল। তিনি উজিরের তাঁবেদার চাকরের মতো হয়ে থাকতে কিছুতেই রাজি নন। পদে পদে উজিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালাতে লাগলেন। ঘাজীউদ্দীন তাঁকে ধরে কয়েদ করবার আগেই বেগতিক দেখে তিনি একদিন লালকেল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে পালালেন। শেষ পর্যন্ত উজিরের সঙ্গে একটা ছোটখাটো লড়াইও হয়ে গেল তাতে তেমন কোনো সুবিধা করতে না পেরে শাজাদা অবশেষে দিল্লি ছেড়ে অন্যত্র সরে পড়লেন।

আলী গোহরের মধ্যে একটা ঘূর্ণিবায়ু ছিল যেটা তাঁকে কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে দিত না, সর্বদা চরকির মতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তিনি নানা জায়গায় ঘুরেফিরে বেয়েচেয়ে দেখতে লাগলেন কোথাও কিছু করা যায় কিনা-কিছু না। সবাই মুখে ভরসা দেয়, জোরগলায় শাজাদার তারিফ করে, কিন্তু কাজের বেলায় হাত গোটায়। অবশেষে বিরক্ত হয়ে শাজাদা অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজত্বে আশ্রয় নিলেন। সুজাউদ্দৌলা তাঁকে সুসম্মানে প্রচুর আদর করেই গ্রহণ করলেন। সমাদরটা যে শাজাদার উপর নিছক স্নেহবশতঃ— একথা যেন কেউ হঠাৎ মনে করে না বসেন। বাদশার বড় ছেলে শাজাদাকে হাতে রাখতে পারলে আজ না-হোক কাল, কাল না-হোক পরশু, ঘাজীউদ্দীনকে হটিয়ে তিনি নিজেই হিন্দুস্থানের উজির হয়ে বসতে পারবেন—এরকম একটা আশা নবাব সুজাউদ্দৌলার মনের মধ্যে ছিল। উজিরগিরি তাঁর ন্যায্য পাওনা বলেই তিনি মনে করতেন, কারণ তাঁর বাবা সফদারজঙ্গ মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের কর্ণধার উজির ছিলেন। যত বড়ই নবাব তিনি হোন না কেন, উজিরী গদিতে বসতে না পারলে সফদারজঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। আর ঘাজীউদ্দীন তো বংশানুক্রমে তাঁর শত্রু। তার উপর আবার ঘাজীউদ্দীনরা সুন্নি মুসলমান আর অযোধ্যার নবাবরা ঘোর শিয়া—সম্বন্ধ অনেকটা অহি-নকুলের মতোই।

নবাব সুজাউদ্দৌলা কিন্তু শাজাদাকে নিজের কাছাকাছি রাখতে সাহস পেলেন না। খামখেয়ালী শাজাদা কখন যে কি করে বসেন—এই ভয় তাঁর সর্বদাই ছিল।

শাজাদাকে হাত করে কখন কে কি উপদ্রব লাগিয়ে দেয়, তারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সুজাউদ্দৌলা আলী গোহরকে এলাহাবাদে গিয়ে থাকবার পরামর্শ দিলেন। বললেন, সেখানকার ডেপুটি গভর্নর আর কেল্লাদার মহম্মদ কুলী খাঁ তাঁর নিকট-আত্মীয়, তিনি শাজাদাকে সেখানে রাজার হালে রাখবেন। আর শাজাদা যে নবাব মীর জাফরের কাছ থেকে বাংলামুল্লুক ছিনিয়ে নেবার সংকল্প এঁটে রেখেছেন, তাতে মহম্মদ কুলী সবদিক দিয়েই তাঁর কাজে আসবেন— সুজাউদ্দৌলা তাঁকে সব খুলে লিখে দিয়েছেন। এর আগে হিন্দুস্থানের কোনো জায়গাতেই নিজের একটা স্থান করে নিতে না পেরে শাজাদা স্থির করেছিলেন, দিল্লি থেকে অনেক দূরে সুবে বাংলাতেই তিনি রাজত্ব করবেন ততদিন, যতদিন না নিজে দিল্লির বাদশা হচ্ছেন। বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর তো অতি বৃদ্ধ, এক পা তাঁর কবরের দিকে এগিয়েই আছে বললেই চলে, সুতরাং খুব বেশি দিন আর শাজাদাকে দিল্লির বাইরে বাইরে থাকতে হবে না। ইতিপূর্বে তিনি এদিক-ওদিক অনেক ঘুরেফিরে দেখেছিলেন, হিন্দুস্থানের অন্যান্য সুবেদাররা সবাই বেশ প্রতিপত্তিশালী, তাঁদের সুবায় তার ঠাঁই মেলা অসম্ভব। শুনেছিলেন, বাংলার সুবেদারটা নাকি অতি অপদার্থ, কতকগুলো বিদেশী কারবারী লোকদের সাহায্যে বাংলার গদি দখল করেছে। আরো শুনেছিলেন যে, ও-অঞ্চলের বড়-বড় জাইগিরদার জমিদার সামন্ত প্রজা সবাই নবাব-দরবারে বিদেশীদের প্রতিষ্ঠা হতে দেখে মীর জাফরের উপর হাড়ে-হাড়ে চটা। এই সময় একবার বঙ্গদেশে গিয়ে পড়তে পারলে তাঁরা সবাই শাজাদাকে লুফে নেবেন। তাছাড়া, সুবে বাংলায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্তেই বাস করতে পারবেন, দুর্দান্ত উজির দিল্লি থেকে সেখানে তাঁকে তেড়ে আসতে পারবেন না। আলী গোহর গোপনে বাদশার কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী পরোয়ানা আনিয়ে নিলেন।

চারদিক থেকে সকলেই শাজাদাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। সত্যিই ইংরেজদের এই বাড়াবাড়ি কোনো মুসলমানই তেমন ভালো চোখে দেখছিলেন না। যদি শাজাদা এই টুপিওয়ালাদের উচ্ছেদ করতে পারেন তাহলে চারদিকে তাঁর জয়জয়কার পড়ে যাবে। স্বয়ং মোগল সম্রাটের বড় ছেলে শাজাদা আলী গোহর বাংলাজয়ের অভিযানে চলেছেন শুনে বহু লোক এসে তাঁর সৈন্যদলে নাম লেখাতে লাগল। নগদ মাইনে আপাতত না পাওয়া গেলেও লুঠপাটের ।খোলা, তাতে বহু লাভ। আর বাংলাদেশ যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—একথা তখনকার সবাই জানত। শাজাদা এক বিপুল বাহিনী নিয়ে এলাহাবাদ ।। নবাব সুজাউদ্দৌলা পাথেয় বলে নগদ এক লাখ টাকা তাঁ

আর কিছু লোকজনও তাঁব সঙ্গে দিয়েছিলেন। শাজাদা এলাহাবাদ পৌঁছে দেখলেন, মহম্মদ কুলী খাঁও অনেক লোক সংগ্রহ কবে রেখেছেন। ফরাসী কাপ্তান জাঁ ল তখন ছত্রপুবে বাস করছিলেন, শাজাদা তাঁকেও ডাক দিয়ে পাঠালেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা আশ্বাস দিয়েছিলেন, হাতেব ক'টা জরুবী কাজ শেষ কবেই তিনি এলাহাবাদে গিয়ে শাজাদাব সঙ্গ নেবেন, কিন্তু এক-এক করে দিন কেটে যেতে লাগল, তবু তাঁব আব দেখা পাওযা গেল না। যাই হোক, আব অপেক্ষা না কবে একটা শুভদিন দেখে শাজাদা বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা শুরু কবে দিলেন।

ওদিকে বিহাবেব ডেপুটি গভর্নব বাজা বামনাবাযণ শাজাদা পাটনা আসছেন শুনেই অস্থিব হযে পড়লেন। বাজস্ব-আদায়ে হিসাবনিকাশে লেখাপড়ায় ছলাকলায় রামনাবাযণেব জুড়ি না মিললেও তাঁব মতো ভীতু লোক আব একটাও ছিল না। তিনি মুর্শিদাবাদে ঘন ঘন চিঠি ছাড়তে লাগলেন—নবাবী ফৌজ পাঠান, নবাবী ফৌজ পাঠান। দুবেলা পাটনাব ইংবেজ কুঠির সর্দাব পিটব এমিযটেব কাছ থেকে খোঁজ নিতে লাগলেন কর্নেল ক্লাইভ তাঁব পল্টন-সেপাই নিয়ে নবাবেব সঙ্গে যোগ দিলেন কিনা। এমিয়ট মুখে খুব আস্ফালন কবে বামনাবায়ণকে অভয় দিতে লাগলেন। কিন্তু মীব জাফর একেবারেই চুপ, একটুও কোনো সাড়াশব্দ দিলেন না।

দিলেন না যে কেন, তাব অনেকগুলো কাবণ ছিল। টাকার অভাবে এব আগেই মীব জাফব তাঁব সৈন্যেব সংখ্যা খুব কমিযে এনেছিলেন। অবশিষ্ট যা ছিল তাদেবও মাইনে অনেক বাকি পড়ে গেছে। এই নিয়ে তারা রোজই হৈ-হল্লা লাগাচ্ছে। এই সেদিন এমনি হল যে, বকেয়া টাকাব জন্যে সেপাইবা নবাবেব বাড়ি পর্যন্ত চড়াও হয়ে চিৎকাব-ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েছিল। বাজকোষ তো শূন্য। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেব সোনা-রুপোব বাসনপত্রেব খানিক খানিক বেচে মীর জাফরকে সেই টাকা দিয়ে তাদেব ঠাণ্ডা করতে হল। কিন্তু এইবকম বেখুশ সেপাইশাস্ত্রী নিয়ে আর যা কিছু করতে পারা যাক না কেন লড়াই করতে তাদেব পাঠানো চলে না। টাকা ধার করারও উপায় নেই। যাঁবা টাকা ধার দিতে পাবতেন, সেই জগৎশেঠেবা তখন সব মালপত্র খেছেঁদে লটবহব নিয়ে পরেশনাথে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন। অগত্যা মীর জাফরকে অন্য উপায়ের সন্ধান দেখতে হল।

মীর জাফরের উদ্বেগের আবো একটা বড় কারণ এই ছিল যে, তিনি নবাব হলেও কাগজে-কলমে দিল্লীশ্বরের তো অধীন বটেন। বাদশার শাহজাদের

বলেই তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার। ঐ অবস্থায় বাদশার ছেলে শাজাদার গায়ে তিনি কি করে হাত তোলেন? মীর জাফর দ্বিধা-সংকোচ করছেন এমন সময় ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিলেন উজির ঘাজীউদ্দীন। তিনি বাদশাকে দিয়ে জোর করে সই করিয়ে নেওয়া এক ফর্মান পাঠালেন যে, আলী গোহর তার কুলাঙ্গার বিদ্রোহী পুত্র। শাজাদার এই বেয়াড়া-রকম লড়াইয়ে বেরোনো বাদশার আদবেই মনঃপুত নয়, সুতরাং যিনিই তাঁকে এই ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করবেন, তিনিই বাদশার বিরুদ্ধাচারী বলে গণ্য হবেন। সেই সঙ্গে সম্রাটের পরমপ্রিয় অনুগত সুবাদার মীর জাফর আলী খাঁকে সম্রাটের হুকুম জানানো যাচ্ছে যে, তিনি যেন এই ফর্মান পাওয়ামাত্র শাজাদা আলী গোহরকে ধরে-বেঁধে দিল্লিতে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

বাদশাহী ফর্মান পেয়ে মীর জাফর আরো ফাঁপরে পড়ে গেলেন। এ যে এক বিষম ফ্যাসাদ। বাদশার হুকুম তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, অথচ শাজাদাকে কোনো প্রকারে ঠাণ্ডা না করলেও তো নয়—তিনি যে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন আর সঙ্গে তাঁর একরাশ লোক। গায়ের জোরে শাজাদাকে রুখতে পারেন এমন শক্তি মীর জাফরের ছিল না। একেই তাঁর সৈন্যবল অনেক কম, তার উপর যেটুকু আছে তাও টলমল। তাই নিয়ে শাজাদার মতো শত্রু ঠেকানো একেবারেই চলে না। ইংরেজদের এই ব্যাপারে মাথা গলাতে দিতে মীর জাফরের মনে একটুও ইচ্ছা ছিল না। তিনি এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে, ইংরেজদের বসতে দিলে তারা শুতে চায়, শুতে দিলে তড়াক করে মাথায় চড়ে বসে। মীর জাফর অবশেষে স্থির করলেন, খানিক টাকা ধরে দিয়ে তিনি শাজাদাকে বশ করবেন, তাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

কিন্তু সেখানেও এক মস্ত ফ্যাকড়া বেরোল। বাদশার বড় ছেলে শাজাদাকে দেবার মতো টাকা মীর জাফরের হাতে ছিল না। ইংরেজদের কল্যাণে তাঁর তলা চুঁয়ে এসেছে, ভাঁড়ে মা ভবানী। তাঁর পক্ষে এখন শুধু-হাতে ধার পাওয়া দায়, বাজারে তাঁর ক্রেডিট একদম মাটি হয়ে গেছে। তাছাড়া বলবামাত্র একসঙ্গে অত টাকা বের করে দেবার মতো ক্ষমতা মুর্শিদাবাদে একমাত্র জগৎশেঠেরাই ধরেন। কিন্তু তাঁরা তো এখন ধর্মকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। শাজাদা-সংক্রান্ত গোলযোগ না মিটলে তাঁরা যে রাজধানীতে ফিরবেন, তা বলে তো বিশ্বাস হচ্ছে না। ভেবেচিন্তে উপায় কিছু বের করতে না পেরে

জাফর ভাঙের মাত্রা চড়িয়ে দিলেন। নেশায় বুঁদ হয়ে বেহেস্তের হুরির স্বপ্ন

[illegible]

মীর জাফর যে শাজাদাকে টাকা দিয়ে বশ করার চেষ্টা করছেন—এ-কথাটা চাপা রইল না, জানাজানি হয়ে গেল। খবর পেয়ে ক্লাইভ নরম-গরম উপদেশ ছেড়ে নবাবকে একটা চার পাতা চিঠি লিখে পাঠালেন। সে-চিঠির মর্মার্থ হল—শাজাদাকে টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা দেখার মতো নিরেট বোকামি আর কি হতে পারে? ক্লাইভ কিছুতেই বুঝতে পাবছেন না যে, নবাব-বাহাদুর কি করে একথা মনে আনতে পারলেন। মীর জাফর নিতান্তই তাঁর বন্ধুলোক বলেই তিনি গায়ে পড়ে তাঁকে এই সদুপদেশ দিচ্ছেন যে, নবাব যদি সত্যি-সত্যি শাজাদাকে টাকা দিয়ে বশ করতে যান, তাহলে তিনি দেখবেন যে, এর পর তিনি আব কাউকেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। টাকার গন্ধ পেয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলা, মাবাঠারা, পাঠানবা—সবাই—কোথা-থেকে-না-কোথা-থেকে এসে হুড়মুড় কবে বাংলাদেশের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে। তখন সারা বাংলার শেষ কড়িটুকুও উজাড় করে ঢেলে দিয়েও নবাব কাউকেই শান্ত করতে পাববেন না। বাংলাদেশ ছারখারে যাবে।

ক্লাইভের উপদেশটা যে সত্যি সদুপদেশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্বত্রই দেখা যায় যে, ব্ল্যাকমেলের ফাঁদে একবার ধরা দিলে তার থেকে আর রেহাই নেই। তখন সারা জীবন ধরে ব্ল্যাকমেল দিয়ে যেতে হয়। তখন অস্তি নাস্তি ন জানাতি—কেবল দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ। ক্লাইভ কিন্তু একটা কথা বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের ব্ল্যাকমেল দিতে দিতে মীর জাফর নিজের যে কি দুর্দশা টেনে এনেছেন আব কবে যে তিনি তার থেকে উদ্ধার পাবেন—তার কোনো ইঙ্গিত কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ ভুলেও কোথাও দিয়ে যাননি।

ভাঙের ঘোর একটু কাটতে মীর জাফর চমকে উঠে দেখলেন, শাজাদা এগোতে এগোতে একেবারে পাটনার প্রায় দোরগোড়ায় এসে পৌঁছে গেছেন। শহর থেকে ছ মাইল পশ্চিমে ফুলওয়াড়িতে তাঁর ছাউনি পড়েছে। তখন আর গত্যন্তর না থাকায় মীর জাফরকে শেষে সেই ক্লাইভেরই শরণাপন্ন হতে হল।

॥ আট ॥

শাজাদা পাটনার দিকে এগিয়ে আসছেন শুনেই রামনারায়ণের হৃৎকম্প উপস্থিত, সেই থেকেই তিনি রামনাম জপছেন। নবাবকে লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেলেন, কিন্তু সেদিক থেকে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই। ওদিকে ইংরেজ কুঠিতে খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে, সেখানেও কেউ ক্লাইভের পাত্তা দিতে পারছে না। রামনারায়ণ চরের মুখে খবর পাচ্ছেন, শাজাদা এলাহাবাদ থেকে কাশী পৌঁছলেন, সেখানে ল-সাহেব এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন, তারপর সকলে মিলে কর্মনাশা নদী পেরোলেন। এই কর্মনাশা নদীই সেকালে অযোধ্যা আর সুবে বাংলার মাঝখানকার সীমানা। তাহলে সত্যিই শাজাদা বঙ্গবিজয়ে আসছেন।

রামনারায়ণ শ্যাম রাখবেন কি কুল রাখবেন—কিছুই স্থির করে উঠতে না পেরে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাটনার কেল্লা থেকে বেরিয়ে ফতেবাগ বলে এক জায়গায় তাঁবু গাড়লেন। জায়গাটা মাঝামাঝি স্থানে, অর্থাৎ পুবদিক থেকে মীর জাফর যদি তাঁর ফৌজ নিয়ে এসে দেখা দেন তাহলে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়া একটুও কষ্টকর হবে না, আবার শাজাদা যদি সসৈন্যে পশ্চিমদিক থেকে এসে আগে শহরে ঢুকে পড়েন তাহলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাতেও বিন্দুমাত্র দেরি হবে না।

কিন্তু পুবদিক থেকে কারো টিকিটিও দেখা গেল না। পশ্চিম দিকে পাটনা থেকে মাত্র ছ মাইল দূরে শাজাদার ক্যাম্প পড়েছে শুনেই ইংরেজ কুঠিয়াল পিটর এমিয়ট শতহস্তেন বাজিনম্—এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নৌকোয় চড়ে খাস বাংলার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ইংরেজ কুঠির পাহারায় জনকয়েক তেলিঙ্গি সেপাই রেখে দেওয়া হল, রামনারায়ণকে জানানো হল, তিনি যেন তাদের একটু দেখেন। ব্যাপারটা একটুও সুবিধার দাঁড়াচ্ছে না বিবেচনা করে রামনারায়ণ আবার দলবলসুদ্ধ পাটনার কেল্লার ভিতর ঢুকে পড়ে শহরের সবক'টা দরজাই একে একে বন্ধ করে দিলেন।

দুদিন পরে শাজাদার কাছ থেকে জোর হুকুম এল, রামনারায়ণ যেন আর গয়ংগচ্ছ না করে তখনি শাজাদার দরবারে হাজিরি দেন। রামনারায়ণ মনে

করলেন—একবার দরবারে গিয়ে দেখেই আসা যাক না কেন ব্যাপারটা আসলে কি? দূতের মুখে শাজাদার প্রধান সেনাপতি মহম্মদ কুলী খাঁকে বলে পাঠালেন, যদি তিনি জামিন থাকেন যে, শাজাদার দরবারে হাজির হলে রামনারায়ণ প্রাণে মারা যাবেন না, তাহলে তিনি নির্ভয়ে হৃষ্টচিত্তেই সেখানে দেখা দেবেন। দূত ফিরে গিয়ে তাব পবদিনই শীলমোহর করা জামিননামা নিয়ে এসে রামনারায়ণেব হাতে দিলেন। মহম্মদ কুলী খাঁ রাজা রামনারায়ণকে তাঁর শরণার্থী দেখে খুবই খুশি। তবে ঐ জামিননামা অমনি পাওয়া যায়নি, ওটা আদায়ের জন্যে সেনাপতি আর তাঁব অনুচরদের রামনারাযণকে দক্ষিণা যা দিতে হল তার পবিমাণ বড কম নয়।

কাণ্ড দেখে রামনারায়ণেব বন্ধু রাজা মুবলীধব তাঁকে শাজাদার হাতে হাত মেলাতে বার বার বারণ কবলেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার লেখাপডা না জানা থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান ছিল একেবারে টনটনে। বই পডতে না পাবলেও ভবিষ্যৎ পড়তে পারতেন পবিষ্কাব। তিনি বোঝাতে লাগলেন, শাজাদাব ফৌজ আকারে প্রকাণ্ড দেখতে হলেও অতিকায় জন্তুব মতো জোবে কম, প্রকারে সেটা একটা লুঠেলের দল মাত্র। ইংরেজ পল্টন সঙ্গে নিয়ে নবাবী ফৌজ একবার এসে পড়লে লুঠেলদের সাধ্য কি যে তাদের সামনে দাঁড়ায়? শুনে রামনারায়ণ একটু হাসলেন। কূটবুদ্ধিতে তিনি রাজা মুরলীধবের উপরও এককাঠি বাড়া। ইংরেজদের হিম্মত তাঁর ভালো করেই জানা আছে। ক্লাইভ সহায় থাকলে তিনি শাজাদা কেন স্বয়ং বাদশা-উজিরেরও তোয়াক্কা রাখেন না। কিন্তু যতক্ষণ না কর্নেল-সাহেবের টুপির চুড়ো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এই হতভাগাদের তো ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাখতে হবে?

রামনারায়ণ পাঁজিপুঁথি দেখে শুভদিন বের করে সেজেগুজে শাজাদার সন্দর্শনে যাত্রা করলেন। শাজাদার লোকজনদের যেমনি দীনহীন সাজসজ্জা ঠিক তেমনি বুভুক্ষু তাদের চেহারা। রামনারায়ণকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্যে মস্ত এক তাঁবু ফেলা হয়েছে। তারই একদিকে একটা তক্তাপোশের উপর সিংহাসনের মতো করে একটা রাংতামোড়া কুরসি পাতা হয়েছে। তাতে বসেছেন শাজাদা আলী গোহর। তাঁর বাঁ পাশে তাঁর সেনাপতি এলাহাবাদের কেল্লাদার মহম্মদ কুলী খাঁর আসন, ডান পাশে তাঁর বক্সীর। আর তাঁদেবই পর পর সব গণ্যমান্য আমীর-ওমরাহের দল। সেপাইশাস্ত্রীরা কায়ক্লেশে এক-একটা জোব্বা জোগাড় করে তাই গায়ে চড়িয়ে কোনোরকমে তলাকার ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তাকুর্তি ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

খানিক পরে সেনাপতি মহম্মদ কুলী খাঁ আসন থেকে নেমে রামনারায়ণকে দরবারে আনতে গেলেন। তাঁবুর দরজা থেকেই কুনিশ করতে করতে রামনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে তাঁবুতে ঢুকলেন। মসনদের ঠিক নিচেই রামনারায়ণকে দাঁড করিয়ে তিনি টংয়ে উঠে তাঁর নিজস্ব জায়গায় গিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়ালেন। রামনারায়ণ কুর্নিশ করতে করতে তিনবার এগিয়ে তিনবার পিছিয়ে শাজাদার উদ্দেশে একশো-এক আশরফি নজরানা পেশ করলেন। দরবারে ঢোকার আগেই মহম্মদ কুলীর সঙ্গে রামনারায়ণের গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর হয়ে গেছে। লেনদেনও সব চুকে গেছে। মহম্মদ কুলী পঞ্চমুখে রামনারায়ণের গুণ গেয়ে তাঁকে শাজাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

উৎসাহের চোটে মহম্মদ কুলী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন। তিনি গাইতে লাগলেন—হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে রামনারায়ণ যেমনি বুদ্ধিমান ঠিক তেমনি আবার কাজের লোক। হিন্দু হয়েও তিনি এমনি চোস্ত ফার্সী বলতে-কইতে লিখতে-পড়তে পারেন যে, সেবকমটা অনেক মুসলমান মুনশী মৌলভীও পেরে ওঠেন না। তার উপর রামনারায়ণ অতি মাথাঠাণ্ডা মানুষ। যা বলেন যা করেন সবেতেই তাঁর সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দেখে তিনি রাজা রামনারায়ণকে তাঁর দেওয়ান আর তাঁর এলাহাবাদের কেল্লাদারির নায়েব করে নিয়েছেন।

মহম্মদ কুলীকে এত জোর জোর ঢাক পেটাতে দেখে শাজাদার কেমন যেন একটু সন্দেহ হল। তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, রামনারায়ণকে তিনি তো বড়জোর ঘণ্টাখানেক মাত্র দেখেছেন, তারই মধ্যে তিনি এমন কি দেখলেন যাতে রাজাবাহাদুরকে আচমকা অতটা বিশ্বাস করে ফেললেন? টাকা বিলিয়ে আগের থেকে সব শেখানো-পড়ানো ছিল। যেই শাজাদা ঐ উক্তি করলেন অমনি পাঁচ-সাতজন ওমরাহ এক সঙ্গে ধুয়ো ধরলেন—রামনারায়ণ অতি সজ্জন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বড় পাকা কাজের লোক। তৈমুরবংশের বাদশা-শাজাদাদের একান্ত অনুগত প্রজা। বেচারী শাজাদা আর কি করেন? মনের সন্দেহ মনেই রেখে নকল কিংখাপের খেলাতী পোশাক আর শিরপ্যাচ, ঝুটো মোতির মালা, মেকি হীরে-বসানো তলোয়ার রামনারায়ণকে উপহার দিলেন। মাটি পর্যন্ত মাথা নুইয়ে রামনারায়ণ সেসব মাথায় তুলে ধরলেন।

পাশের এক তাঁবুতে কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে গিয়ে রামনারায়ণ নিজের পোশাক ছেড়ে শাজাদার দেওয়া খেলাতী জোব্বা পরলেন,

মাথার পাগ[illegible] শিরপ্যাচ চড়ালেন, গলায় ঝুটো মোতির মালা দোলালেন, কোমরে স[illegible] তলোয়ার ঝোলালেন। রামনারায়ণ প্রচুর দুধ-ঘি-খাওয়া বেশ-একটু মোটা মানুষ। খেলাতী পোশাক তাঁর গায়ে চড়চড়ে আঁট হয়ে বসল। তাই পরে খানিকটা জড়সড়ভাবেই রামনারায়ণ দ্বিতীয় বার দরবারখানায় প্রবেশ করলেন। রাজা রামনারায়ণ অনেক দিন ধরেই পাটনার একছত্র আধিপত্য করে আসছেন, বহু দিন কারো কাছে তাঁকে মাথা নোয়াতে হয়নি। তাই একে কথায় কথায় মাথা হেঁট করে মাটি পর্যন্ত নুয়ে কুর্নিশ করতে করতে অনভ্যাসের ফোঁটার মতো তাঁর ঘাড় পিঠ সব টনটন করছে, তায় আবার এই আঁটসাঁট পোশাক। তার উপর চোখের সামনে বসে শাজাদা আলী গোহর—যতই যা হোন না কেন দিল্লির বাদশার জ্যেষ্ঠ পুত্র তো বটেন। রামনারায়ণ ঘেমে নেয়ে একশা। কুর্নিশ করতে গিয়ে ভিরমি যাবার জোগাড়। মাথা-ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলেন, দুদিক থেকে দুজন ওমরাহ তাকে চেপে ধরে খাড়া করে রাখলেন।

অবশেষে দরবার ভাঙল। রামনারায়ণ নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যদিও তিনি সব নিয়ে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন, তবু তখনো বুদ্ধিবিবেচনা একেবার হারাননি। এক আঁচেই শাজাদার আসন্ন অবস্থাটা বুঝে নিলেন। সেনাপতি মহম্মদ কুলীর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তো আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন। আর শাজাদার সৈন্যসামন্ত? নামেই ঐ মোগলাই ফৌজ, আসলে সব ভুষিমাল, একদম ভুয়ো। আগের থেকে এসব জানা থাকলে কি তিনি কস্মিনকালেও এখানে আসতেন? এখন এইসব হাড়-বের-করা শকুনির খপ্পর থেকে বেরোনো যায় কি করে? রামনারায়ণ তাই চিন্তা করতে লাগলেন।

খুব বেশি ভাবতে হল না। খানিক পরেই রামনারায়ণ নোটিশ পেয়ে গেলেন শাজাদা মহম্মদ কুলীর ভাই মীর্জা হাসানকে আজিমাবাদের অর্থাৎ পাটনার ডেপুটি গভর্নরের পদে মোতায়েন করেছেন আর রামনারায়ণকে করে দিয়েছেন তাঁরই দেওয়ান। ব্যাপারটা রামনারায়ণের বুঝে ফেলতে তো একটুও দেরি হল না। টাকা খেয়েও মহম্মদ কুলী কথার খেলাপ করেছেন। চালাক লোক বলে রামনারায়ণ মুখে কিছু বললেন না, মাথা নুইয়ে সরকারী ইস্তাহার হাতে ধরলেন। পাটনায় ফিরে গিয়ে আগের থেকে মীর্জা হাসানের জন্যে সব [illegible]ঠিক করে রাখবেন—এই আশ্বাস দিয়ে রামনারায়ণ মহম্মদ কুলী খাঁর কাছ থেকে বিদায় চাইলেন। মহম্মদ কুলীর চেলাচামুণ্ডাদের কেউ কেউ ইতিপূর্বেই

তাঁকে সাবধান করে দিতে গিয়েছিলেন যে, রামনারায়ণকে তাঁর স্বস্থানে ফিরে যেতে দেওয়াটা আদৌবেই কাজের কথা হবে না। কিন্তু মহম্মদ আলী খাঁ তখন গর্বে আত্মহারা। তিনি সদর্পে বলে উঠলেন—যে যেতে চাচ্ছে তাকে যেতে দাও। বাংলা-মুল্লুকে কে এমন জোয়ান আছে যে, মহম্মদ কুলী খাঁর খোলা তলোয়ার দেখে ভয়ে আঁতকে না ওঠে? তিনি রামনারায়ণকে আলিঙ্গন করে সদ্ভাবেই তাঁকে বিদায় দিলেন।

মহম্মদ কুলীর লোকেরা রামনারায়ণকে তাদের সরকারী হাতির পিঠে চড়িয়ে পাটনা পৌঁছে দিতে গেল। রামনারায়ণের নিজের হাতি নিজের মাহুত নিজের বডিগার্ড সব পিছন পিছন চলেছে। মাঝপথে রামনারায়ণ জানালেন, তাঁর বড তেষ্টা পেয়েছে। হিন্দু হয়ে তিনি আর মুসলমানের ছোঁওয়া জল তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসে খান কি করে? তখনো খাওয়া-দাওয়ায় হিন্দুরা যে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলতেন—সেকথা সকলেই জানতেন। রামনারায়ণকে সরকারী হাতি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। নিজের হাতির উপর চড়ে তিনি লোক দেখিয়ে দেখিয়ে ঢকঢক করে দু-ঘটি জল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে একটা আরামের হুংকার ছাড়লেন। মাহুতকে বোধ হয় আগের থেকে শেখানো ছিল, সে-ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই হাতির মাথায় ডাঙশের এমন এক জোর বাড়ি বসাল যে, কেউ কিছু বোঝবার আগেই হাতি চার পা তুলে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল কেউ তা টেরই পেল না।

কেল্লায় ঢুকেই রামনারায়ণ অর্ডার দিলেন কেল্লার সব ফটক তখনি বন্ধ করে দেওয়া হোক। তারপর বুরুজে বুরুজে কামান সাজানো হল। সেপাইরা সবাই হাতিয়ারবন্দ হয়ে চারদিকে টহল মেরে বেড়াতে লাগল। শাজাদার মোগলাই ফৌজের হাডগিল্লে চেহারা দেখে এসে রামনারায়ণের মতো ভীতু মানুষেরও মুখে বোল ফুটেছে। তবে কেল্লার গেট সেই যে বন্ধ হল আর খুলল না। রামনারায়ণও আর ঘর ছেড়ে বেরোন না। কিন্তু তখনো নবাবী সেপাই কি ইংরেজ পল্টন কারো কোনো খবর না পাওয়ায় তিনি শাজাদা কি মহম্মদ কুলীর সঙ্গে একেবারে সব কাটান-ছেঁড়ান করে ফেললেন না, নানারকম উপহারদ্রব্য পাঠিয়ে তাঁদের খুশি রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শাজাদা আর তাঁর সেনাপতি তখন রঙ্গরসে মত্ত হয়ে আছেন, তাঁদের সেনা[illegible] আশেপাশের গ্রামগুলোতে লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে।

ওদিকে ক্লাইভ মীর জাফরকে খেলাতে খেলাতে এক সময় বুঝে ফেললেন, আর খেলানো চলবে না; আর বেশি চটকালে লেবু তিতো হয়ে উঠবে।

এখন এমন একটা কিছু করা চাই যাতে দড়ি না ছিঁড়ে যায়। ক্লাইভ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে গোড়াতেই মীর জাফর আর মীরনকে ধরে একচোট খুব ধমক লাগালেন। মুখের উপরই সাফ বলে দিলেন, ঐরকমভাবে নবাবী খেলা চালাতে থাকলে বেশি দিন আর মীর জাফরকে রাজত্ব করতে হবে না। রাজ্য টিকবেই না। রামনারায়ণের সর্বনাশ করার বাসনা মন থেকে দূর না করলে মীর জাফরকে বিহারপ্রদেশ শাজাদাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই নবাব-বাহাদুরকেও বাংলাদেশ ছেড়ে বনবাসে যেতে হয়। মীর জাফর আর মীরন মাথা নীচু করে ক্লাইভের ধমকানি শুনে গেলেন, একটি কথাও বললেন না। খানিক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ক্লাইভ পাটনা যাবার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললেন।

আমোদ-প্রমোদের মাতামাতি কতকটা নরম পড়লে শাজাদা ও তাঁর সেনাপতি কাজে মন দেবার একটু অবসর পেলেন। আস্তে আস্তে পাটনা শহরে ঢুকে শহরতলি জাফরগঞ্জে বড় এক দিঘির ধারে তাঁবু গাড়লেন। সেখানে বসে মহম্মদ কুলী রোজই রামনারায়ণের কাছে লোক পাঠাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, যাতে তাড়াতাড়ি বিহারপ্রদেশের রাজস্বের হিসেব-নিকেশ সাফ করে বুঝিয়ে দিয়ে উদ্‌বৃত্ত টাকাটা তারই মারফত শাজাদার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মহম্মদ কুলীর লোকদের মেজাজ কি গরম, কি তাদের তম্‌বিতম্‌বা, তর্জনগর্জন, আর কি নবাবী চাল! যেন পাটনার কেল্লা তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে, রামনারায়ণ যেন তাদের কতকালের পোষা এক তাঁবেদার মাত্র।

রামনারায়ণ কিছু বলেন না। সব অপমান মুখ বুজে বেবাক হজম করে যান। দিচ্ছি-দেবো করে সময় কাটান। রাগ করে কাজ নষ্ট করার ছেলে রামনারায়ণ নন। শেষে একদিন যখন চরের মুখে খবর এল যে, মীরনকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাইভ রাজমহল ছেড়ে পাটনার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের অগ্রদূত এন্‌সাইন ম্যাথিউস এরই মধ্যে ফতোয়ায় পৌঁছে গেছেন, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রামনারায়ণ সেইদিনই নিজমূর্তি ধারণ করলেন। মহম্মদ কুলীর লোকেরা এসে আবার তাঁইশ শুরু করতে থাকলে রামনারায়ণ তার ডবল গর্জন করে হুমকি দিয়ে উঠলেন—তোমাদের মনিব মহম্মদ কুলী খাঁ ভেবেছেন কি? রাজা রামনারায়ণ কারো আটচালায় বাস করেন না। শাজাদা আমার দেশে

এসেছেন, আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে নজরানা দিয়েছি, যথাযোগ্য তত্ত্বতাবাস পাঠিয়েছি। বাস্, সব চুকে গেছে। তোমরা বারবার এখানে এসে কেন উপদ্রব করো বল দেখি? আমি সুবে বাংলার নবাব মীর জাফর আলী খাঁ বাহাদুর ছাড়া আর কাউকে আমার মনিব বলে মানিনে, একথা তোমাদের মনিব মহম্মদ কুলী খাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও।

নিজের লোকদের মুখে এই বার্তা শুনে মহম্মদ কুলী খাঁ আর চুপ করে থাকতে পারেন না। পরদিন সকাল থেকেই শাজাদার ফৌজ পাটনার কেল্লার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দশ দিন ধরে এমনি জোর কামান দেগে চলল যে, মেহদিগঞ্জের দিককার বুরুজটা তো খানখান হয়ে হামলাদারদেরই ঘাড়ের উপর হুড়ুম-দাড়াম করে ভেঙে পড়ল। তারপর ফরাসী কাপ্তান জঁা ল-সাহেবও রণে নামলেন। বলিহারি তাঁর যুদ্ধ-কৌশল। আর কি দাপট তার ঐ একমুঠো ফরাসী পল্টনদের! তাদের প্রাণ পণ করে লড়তে দেখে শাজাদার সেপাইদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কেল্লা যায় যায়।

বিকেলের দিকে বেগতিক দেখে রামনারায়ণ কেল্লা ছেড়ে অন্যত্র সরে পড়বার উপক্রম করছেন, এমন সময় দেখা গেল যে শাজাদার সেপাইরা হঠাৎ লড়াইয়ে বেজায় ঢিল দিয়েছে। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। তার খানিক পরেই আবার দেখা গেল সবাই হুড়মুড় করে ছুটে পালাচ্ছে। ল-সাহেব বহু মিনতি করেও তাদের ফেরাতে পারলেন না। অনেক করে তাদের বোঝাতে লাগলেন—বেশি না, আর সামান্য একটু লড়ে গেলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? রটে গেছে, কর্নেল-সাহেব ইংরেজ ফৌজ নিয়ে পাটনায় ঢুকেছেন। আর কি সেখানে কেউ দাঁড়ায়? পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ক্লাইভের নামেই সবাইকার আতঙ্ক। আর লুঠেলদের তো রীতিই হচ্ছে একটু-কিছু বেগতিক দেখলেই সাত হাত দূরে পালানো।

ওদিকে মহম্মদ কুলী খাঁর কাছে খবর এসে গেল, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর নিকট-আত্মীয় নবাব সুজাউদ্দৌলা কৌশলে তাঁর এলাহাবাদের কেল্লা দখল করে নিয়ে তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করে ফেলেছেন। একেই জ্ঞাতিশত্রুর মতো শত্রু নেই, তার উপর মহম্মদ কুলীর উপর নবাব সুজাউদ্দৌলার বরাবরই বিষদৃষ্টি। সুজাউদ্দৌলাকে জব্দ রাখার জন্যেই

উজির ঘাজীউদ্দীন তাঁরই রাজত্বের মধ্যে থেকে এলাহাবাদ-অঞ্চলটা বার করে নিয়ে মহম্মদ কুলী খাঁকে সেখানকার ডেপুটি গভর্নর করে বসিয়ে দিয়েছিলেন। আর মহম্মদ কুলীও কোথায় শান্ত হয়ে সুজাউদ্দৌলার বশে থাকবেন—তা না, তিনিও গরম হয়ে উঠে এক স্বাধীন নবাবের মতো চলাফেরা করতে লেগে গেলেন। তাই দেখে সুজাউদ্দৌলা স্থির করলেন যে মহম্মদ কুলীকে খতম না করে আর উপায় নেই। এক রাজ্যে দুই রাজা অসম্ভব।

দেশেব খবব পেয়ে মহম্মদ কুলী বিহারে আর একদণ্ডও দাঁড়াতে পারলেন না। শাজাদা আলী গোহরকে খোদার নামে উৎসর্গ করে দিয়ে মহম্মদ কুলী খাঁ তাঁর সৈন্যদল নিযে এলাহাবাদ ছুটলেন, কিন্তু তাতে তাঁর কোনোই লাভ হল না। একেই তিনি একটু মোটা বুদ্ধির লোক, তাব উপর সর্বদাই তাঁর হামবডা ভাব। সুজাউদ্দৌলাব ধূর্ত মন্ত্রী বেণীবাহাদুবেব স্তোকবাক্যে ভুলে মহম্মদ কুলী আত্মীয়তার দোহাই পেডে সামান্য কজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে খুডতুতো ভাইযেব সঙ্গে দেখা কবতে লক্ষ্ণৌ চললেন। সেখানে পৌছতেই সুজাউদ্দৌলা কথাটি না কযে মহম্মদ কুলীকে গ্রেফতার করে কয়েদ করে ফেললেন। বেশি দিন মহম্মদ কুলীকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুন করিয়ে তবে সুজাউদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হলেন।

জাঁ ল দেখলেন তিনি একা পডে গেছেন। মহম্মদ কুলী পালালেন, শাজাদাও পালাব-পালাব করছেন, তাঁব সঙ্গীদের যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের যুদ্ধে মন নেই. লুঠপাট করে কিছু হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়তে পারলেই তারা বাঁচে। এমন অবস্থায ল-ও আর কি কববেন? আসলে তিনি এ ব্যাপারে যোগ দিয়েছিলেন এই আশায় যে কর্নেল ক্লাইভকে যদি দিনকতক পাটনায় আটকে রাখতে পারা যায় তাহলে জাহাজ বোঝাই করে কাউণ্ট লালীর ফরাসী পল্টনবা গঙ্গা বেয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বঙ্গদেশ জয় করে নেবে—তখন তিনি সহজেই তাদের দলে যোগ দিতে পারবেন। দক্ষিণ দেশে ফরাসীরা প্রথম প্রথম যেরকম বিক্রম দেখিয়েছিল তাতে ল-এর এ-আশা একটুও দুরাশা হয়নি। কিন্তু বিধি বাম তো কি আর হবে? দক্ষিণে কাউণ্ট লালী পাটনার শাজাদারই মতো মাদ্রাজ নিতে-নিতেও নিতে পারলেন না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হল। ল তখন পাততাডি গুটিয়ে পণ্ডিচেরি যাওয়াই স্থির করলেন। কিন্তু মির্জাপুর পর্যন্ত গিয়ে খবর পেলেন, দক্ষিণে ইংরেজরা আবার উঠে পড়েছে। কর্নেল লায়নেল ফোর্ড মছলিপত্তন জয়

করে নিয়েছেন। ল তখন পণ্ডিচেবি যাবাব সংকল্প ত্যাগ করে যেখান থেকে বেরিয়েছিলেন সেখানেই, অর্থাৎ সেই ছত্রপুরেই, আবার ফিরে গেলেন।

ক্লাইভ মীরনকে নিয়ে পাটনায় ঢুকে দেখলেন সব সাফ. একটিও শত্রু কোথাও নেই,—লড়বেন কার সঙ্গে? কর্মনাশা নদীর তীরে বসে শাজাদা মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন, কিং কর্তব্যম্ অতঃপরম্। তাঁব প্রধান সহায় মহম্মদ কুলী খাঁ তো নবাব সুজাউদ্দৌলাব হাতে বন্দী, অন্য যেসব সহচর ছিল তারাও একে একে তাঁকে ছেড়ে যেতে লাগল। ভোজপুরের জমিদার পালোয়ানসিং তাঁর হযে লড়বেন বলছেন বটে, কিন্তু তাঁব উপর শাজাদার ভরসা খুব কম। দেখতে দেখতে যে যাব নিজেব ঘবে ফিবে গেল, কিন্তু শাজাদাব তো ঘরবাড়ি বলতে কিছুই নেই, তিনি আব যাবেন কোথায়? অসহায় শাজাদা শেষে ক্লাইভেবই আশ্রয়প্রার্থী হযে কাতবভাবে মিনতি কবে তাঁকে এক চিঠি দিলেন।

চিঠি পড়ে ক্লাইভেব মন একটু গলেছিল, কিন্তু বামনাবায়ণ যখন চোখা-চোখা যুক্তি ছেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, শাজাদাকে আশ্রয় দেওয়া মানেই সাধ করে খাল কেটে কুমিব ঘবে ডেকে আনা, তখন ক্লাইভ মনঃস্থির কবে ফেললেন। শাজাদাকে লিখে দিলেন, আশ্রয় তিনি তাঁকে দিতে পাবছেন না, কিন্তু পথখবচেব জন্যে পাঁচশো আশবফি পাঠাচ্ছেন, তাই নিয়ে তিনি যদি দযা কবে বিহাবপ্রদেশ ছেড়ে চলে যান তাহলে ক্লাইভ কৃতার্থ বোধ করবেন। ক্লাইভ নিজে সসৈন্যে কর্মনাশা নদী পর্যন্ত যাচ্ছেন, সেখানে পৌছবাব আগেই শাজাদাকে নদী পার হতে দেখলে তিনি খুশি বই অখুশি হবেন না।

শাজাদা বেশ বুঝতে পারলেন, এখন মানে মানে সবে পড়াই ভালো। ক্লাইভ সসাবাম পৌছবার আগেই শাজাদা কর্মনাশা নদী পার হয়ে আবার পথের পথিক হলেন। আবার যে-ভবঘুরে-কে-সেই-ভবঘুরে। ঘুবতে ঘুবতে তিনি মির্জাপুরে গিয়ে পড়লেন। সেখানে কিছুদিন থাকাব পর রেওয়ার রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, বর্ষাকালটা শাজাদা যেন দয়া করে তাঁরই রাজ্যে কাটিয়ে যান। খুশি হয়ে শাজাদা সেখানেই চললেন।

এদিকে কর্নেল ক্লাইভ রামনারায়ণকে পাটনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যেসব জমিদার শাজাদার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের একে-একে শায়েস্তা করলেন। তারপর অন্যান্য সব বন্দোবস্ত সেরে জুন মাসের গোড়ার দিকে তিনি মুর্শিদাবাদ ফিরে চললেন।

॥ নয় ॥

ওদিকে মুর্শিদাবাদে বসে মীর জাফর এই ভাবতে লাগলেন যে, কর্নেল-সাহেবই তো তাঁকে বাংলার নবাব বানিয়েছেন, এখন তাঁর জীবকে তিনিই রক্ষা কববেন। ক্লাইভ সহায় থাকতে তাঁর কিসের ভয়? তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে সপারিষদ নাচগানে মশগুল হলেন।

খবর এল, শাজাদা বিহার ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকের মতো মীর জাফরও ধরে নিয়েছিলেন বুঝি ক্লাইভই লড়াই করে শাজাদাকে তাড়িয়েছেন। কিন্তু কিছু না করে শুধু বরাতজোবেই যে ক্লাইভেব অভিযান সফল হয়েছে, সেকথা বুঝে উঠতে মীর জাফরের খানিকটা সময় লেগেছিল। তাই উপস্থিত বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়ে ক্লাইভের উপর তাঁর মন অনুরাগে ভরে উঠল। তিনি কর্নেল-সাহেবকে ভালোরকমের একটা-কিছু বখশিশ দেবার সংকল্প করলেন, কিন্তু তখন তাঁর এমনি দৈন্যদশা যে হাতের কাছে এমন কিছু খুঁজে পেলেন না যা কর্নেল-সাহেবকে উপহার দেবার উপযুক্ত। তাই শুধু মুখের কথায় সাধুবাদ জানিয়েই তিনি কাজ সারা স্থির করলেন।

কিন্তু সারতে দিলেন না ক্লাইভ নিজেই। তাঁর ইচ্ছা, নির্বোধ মীর জাফর যেন তাঁব জন্যে এমন একটা বন্দোবস্ত করে দেন যাতে শুধু তাঁর নিজেরই নয়, পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরদেরও খাওয়া-পরার আর কোনো ভাবনা থাকে না। যখনই দিল্লির বাদশা তাঁকে ছ হাজারী মনসবদার করে ওমরাহ বানিয়ে দিয়েছিলেন তখন থেকেই ক্লাইভের মাথায় ঘুরছিল ওটার থেকে কি করে কিছু আমদানি করতে পারা যায়। কিন্তু কথাটা সরাসরি মীর জাফরের কাছে না পেড়ে প্যাঁচ কষে প্রস্তাবটা কৌশলে উপস্থিত করলেন জগৎশেঠেদের কাছে। শেঠেদের তিনি হিতৈষী বন্ধু বলেই মনে করতেন।

কাঁদুনি গেয়ে ক্লাইভ জানালেন,—সব আমীর-ওমরাহই তো আরাম করে জাইগির ভোগ করছেন, শুধু তাঁরই কপালে ওমরাহ হয়েও কোথাও এক ক্রান্তি জমি জুটল না। শেঠেরা তাঁকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বললেন, খাস বাংলা-মুল্লুকে জায়গির দেবার প্রথাটা তো পঞ্চাশ বছর আগে স্বয়ং মুর্শিদকুলী খাঁ-ই উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। উড়িষ্যায় তো সব নোনা হাজা জমি, সেখানে

জায়গির নিলে তা তো সাহেবের কোনো কাজেই আসবে না। বাকি থাকে এক বিহার। কিন্তু অতদূরে জাইগির পেলে কর্নেল-সাহেব কি সেটার দেখাশোনা করতে পারবেন? শেঠেদের মনে মনে ভয় ছিল, বিহারের মতো এক দূর সীমান্ত প্রদেশে জাইগির পেলে কর্নেল-সাহেব তার থেকে অনেক অঘটন ঘটিয়ে তুলতে পারেন, তাই তাঁরা কথাটার মোড় একটু ঘুরিয়েই দিলেন। শেঠেদের কথা শুনে ক্লাইভ তখনকার মতো চুপ করে গিয়েছিলেন।

এখন পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে ক্লাইভ সুযোগ বুঝে পুরনো সেই কথাটা আবার শেঠেদের কানে তুললেন। শেঠেরা বুঝলেন, ক্লাইভ নাছোড়বান্দা, জাইগির একটা আদায় না করে কিছুতেই ছাড়বেন না। তাঁরা নবাব মীর জাফরকে সব কথা খুলে বলে পরামর্শ দিলেন, কলকাতার আশেপাশে পঞ্চান্নখানা গ্রাম নিয়ে যে জায়গির আছে ক্লাইভকে সেইটেই বখশিশ করে দিতে। এই জাইগির বাংলার নবাবদেরই খাস জাইগির, তাঁরাই এটা নবাবির অঙ্গ বলে এতদিন ভোগ করে আসছেন। ইংরেজরা এখন সেই জাইগিরের প্রজা, তার দরুন নবাবকে সাল সাল তিন লাখ টাকা করে খাজনা দিতে হয়। শেঠেরা মীর জাফরকে বুঝিয়ে দিলেন, এই জাইগিরের দরুন খাজনা তো ইংরেজরা নবাবকে নগদ দিচ্ছে না, তাঁর কাছ থেকে কড়ার মতো কোম্পানীর যে টাকা প্রাপ্য তারই বাবদ কাটান দিচ্ছেন। তাতে করে দেনাটা খানিক কমছে বটে, কিন্তু নবাবের তো তেমন-কোনো লাভ হচ্ছে না। তিনি যে তাঁর জীবদ্দশায় আর ওই খাজনার মুখ দেখতে পাবেন, তা বলে তো মনে হচ্ছে না। তার চেয়ে এই জাইগির দিয়ে যদি কর্নেল-সাহেবকে খুশি রাখতে পারা যায় তাহলে সেটা একটা লাভ বৈ-কি? মীর জাফরও উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করে কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ সাবুতজঙ্গ নওশেরউদ্দৌলাকে সেই জাইগির লিখেপড়ে দিলেন।

এর ফলে হল কি, ক্লাইভ কোম্পানীর কর্মচারী হয়েও এই জাইগির পাওয়ার দরুন কোম্পানীর জমিদার হয়ে বসলেন। এই জাইগির নিয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সঙ্গে ক্লাইভের অনেক ঝগড়া-তকরার, অনেক মনকষাকষি হয়ে গিয়েছিল। দু-পক্ষই পরস্পরকে মামলা-মকদ্দমার ভয় দেখালেন, দু-পক্ষই নিজের নিজের নামজাদা কৌঁসুলির কাছ থেকে নিজেদের অনুকূলে ওপিনিয়ন বের করে নিয়ে পাঁয়তারা কষতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইন-আদালত করতে হয়নি, শুভবুদ্ধিই জয়ী হল। আপসে

রফা হল, ক্লাইভ যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন ধরে তিনি এই জাইগিরের খাজনার দরুন কোম্পানীর কাছ থেকে তিরিশ হাজার পাউণ্ড—অর্থাৎ তখনকার দিনের তিন লক্ষ টাকা—বছর বছর পেয়ে যাবেন। তাঁর মৃত্যুব পর ঐ জাইগির কোম্পানীর জাইগির হবে। ক্লাইভকে এ-জাইগির বেশিদিন ভোগ করতে হয়নি। ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে কি দুঃখে জানিনে লর্ড ক্লাইভ নিজের হাতে নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা কবেন। তখন কোম্পানীও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান—আসলে নবাব—হয়ে বসেছেন। সুতরাং কার খাজনা কে কাকে দেয়?

মীব জাফরের হাত থেকে জাইগির আদায় কবে মনের আনন্দে ক্লাইভ কলকাতায় ফিরে এলেন। এসে, দেশে ফেববাব তোড়জোড় করতে লাগলেন। তাব শরীর ভেঙে পড়েছিল, আর বইছিল না। পরিশ্রম তো বড় কম হয়নি? মাথার উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটাই না গেল? নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে কলকাতা উদ্ধাব, চন্দননগর জয়, পলাশীর যুদ্ধ, দারুণ গরমে পাটনায় মাচ করে যাওয়া-আসা, কলকাতার গভর্নরির ঝুঁকি—কত রকমের ব্যাপাব। তাব উপর বাংলাদেশের পলিটিক্সে নেমে পড়ায় রোজ নতুন নতুন মতলব ভাঁজতে হচ্ছে, ফন্দি আঁটতে হচ্ছে—তাতে করেও তো মাথার ঘাম পায়ে বড় কম পড়ছে না। এতে কারই বা শরীর ঠিক থাকে?

আরো একটা কথা। ক্লাইভ এদেশ থেকে যা টাকাকড়ি ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন, সেটা নেহাত তুচ্ছ কবে উড়িয়ে দেবার নয়। বাস্তবিক পরিমাণ এত বেশি যে, তার অঙ্ক শুনে বিলেতের বড় বড় লাটলিটদেরও চোখ টাটিয়ে ওঠে। এই রাজসম্পদ দেশের লোকের চোখের সামনে বসে ভোগ করতে না পারলে আর হল কি? যদি স্বদেশে জমিদারি কিনে রাজার কাছ থেকে লর্ড উপাধি পাওয়া যায় তাহলে তার কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর তো বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। তাতে কি আর তৃপ্তি হয় না আশ মেটে? কিন্তু সব বন্দোবস্ত করে জাহাজে ওঠবার পূর্বেই এক ফ্যাসাদ ঘটল। এবার বিপদ এল এদেশী কোনো রাজা-রাজড়ার কাছ থেকে নয়, এল আর এক ইওরোপীয়ন বণিক-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে।

ডাচরা বাংলাদেশে ইংরেজদের আগে থেকেই আছে। এখান থেকে

পর্তুগীজদের শাজাহান বাদশা উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জায়গায় ডাচরা এসে বসে। ১৬২৫ সালে চুঁচড়োতে কুঠিবাড়ি তৈরি করে সেইখানে আস্তানা গাড়ে। তখন থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে মন্দ চলেনি। যদিও পদে পদে ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর চলত, তবু ইংরেজরা তাদের কাবু করতে পারেনি। কিন্তু চাকা উলটোল পলাশীর যুদ্ধের পরই। চোখের সামনে ডাচরা দেখতে লাগল, ইংরেজরা মীর জাফরকে হাত করে একের পর এক এমনি সব সুবিধা নিজেদের জন্যে করে নিতে লাগল যে, তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ে পাল্লা দেওয়া অন্য ইওরোপীয়নদের পক্ষে ক্রমশ দায় হয়ে উঠল। যেদিকেই তাকানো যায় সেইদিকেই দেখা যায়, ইংরেজরা সেখানে আগেই থাবল মেরে বসে আছে। এই সেদিনই তো এক মস্ত লাভের ব্যবসা—সোরার কারবার –ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানীর তরফ থেকে একচেটে করে নিলেন। আর তো পারা যায় না।

সবশেষে যে-লাথিতে ডাচদের পিলে ফাটবার উপক্রম হল, সেটাকে কিন্তু কোনোক্রমেই গোদা পায়ের লাথি বলা চলে না। সেটা যেমনি লঘু, তেমনি সূক্ষ্ম, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই মারাত্মক। কোন্ এক ফাঁকে মীর জাফরকে ভজিয়ে-সজিয়ে ক্লাইভ এক অর্ডার বের করিয়ে নিয়েছিলেন—গঙ্গার উপর দিয়ে যত বিদেশী জাহাজ আনাগোনা করবে, তার সব-কটাকেই সার্চ করার অধিকার থাকবে ইংরেজদের হাতে। বিদেশী বণিক বলতে এখন শুধু ডাচ আর ইংরেজ, ফরাসীরা তো পলাশীর যুদ্ধের ঠিক পর থেকেই বাংলাদেশ থেকে উধাও। কিন্তু এততেও ইংরেজরা খুশি নয়। তাদের পণ—বঙ্গগগনে তারাই থাকবে একচন্দ্র হয়ে। সেখানে সভা আলো করতে দ্বিতীয় কোনো চন্দ্রের উদয় তারা কিছুতেই সহ্য করবে না।

নবাব সরকারে অনেক নালিশ-ফরিয়াদ করেও ডাচদের কোনো লাভ হল না। ইচ্ছা থাকলেও মীর জাফর তাদের ব্যবসার কোনোই সুবিধা করে দিতে পারলেন না। ডাচরা স্পষ্টই বুঝল যে, বড আকাট বন্ধনেই মীর জাফর বাঁধা পডেছেন, তার থেকে ছিটকে বেরোনো তাঁর মতো লোকের কর্ম নয়। ডাচরা নিজে যদি আর একটা পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়ে তুলতে পারে, আর সেই যুদ্ধ যদি তারা জিতে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলেই রক্ষা, নচেৎ মানে মানে এখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়াই বুদ্ধির কাজ হবে। চুঁচড়োর কর্তারা এই মর্মেই তাঁদের হেড-কোয়ার্টার্সে বারবার চিঠি ছাড়তে লাগলেন।

পুর্বদেশে যেখানে যত ডাচ কুঠি ছিল সেসবেরই হেড-কোয়ার্টার্স ।পের ব্যাটাভিয়ায়—হল্যান্ডে নয়। সেখানকার অধ্যক্ষ চুঁচড়োর চিঠি পড়ে বুঝতে পারলেন, নবাব মীর জাফরকে ধরে-পড়ে, কাকুতি-মিনতি করে আর কোনো লাভ নেই, তিনি একেবারে ইংরেজদের হাতের মুঠোর মধ্যে। সেখানে আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হবে না। এসব ক্ষেত্রে বলং বলং বাহুবলম্, অর্থাৎ পিছনে বাহুবলের চাড দেওয়া না থাকলে সবই ভষ্মে ঘি ঢালা। তিনি সেপাই-পল্টন অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের দিকে মন লাগালেন। ঠিক এই সময় কলকাতায় ইংরেজদের লোকবল অনেক কমে এসেছে, ফৌজের বেশির ভাগ সৈন্য এখন দক্ষিণে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। যদি কিছু করতে পারা যায়, তাহলে তা এই সময়েই—এই মনে করে ব্যাটাভিয়ার অধ্যক্ষ চুঁচড়োর সর্দার আডবিয়ান বিসডোমকে সঙ্গে সঙ্গে দেশী সেপাই মজুত করতে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন। ডাচদের পাটনা কাশিমবাজার চুঁচড়োর কুঠিতে গোপনে গোপনে সেপাই ভর্তিকরা চলতে লাগল।

ক্লাইভের একটা মস্ত গুণ যে, তিনি যে-কোনো সংকটে একটুও দেরি না করে চটপট কাজে লেগে যেতে পারতেন। আর ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি। এই দূরদৃষ্টির ফলেই তিনি এক আঁচেতেই জিনিসের মর্মভেদ করে ফেলতে পারতেন। তিনি বেশ বুঝে নিয়েছিলেন, ডাচরা শিগগিরই একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তিনিও সাবধান হলেন। গঙ্গার ওপারে, এখন যেখানে বোটানিকল গার্ডেন্সের সুপারিনটেনডেনটের দোতলা বাড়ি. সেখানে তখন একটা কেল্লা ছিল, তার নাম থানা, সেটা ইংরেজদের মুখে হয়ে গিয়েছিল টানা। ক্লাইভ সেখানে কতক সেপাই-পল্টন, খানিক গোলাগুলি রাখিয়ে দিলেন। চার্জে রইলেন ক্যাপ্টেন নক্স। নদীর এপারে, টানার প্রায় সামনাসামনি, এখন যেখানে খিদিরপুর ডক্স, সেখানে একটা মাটির বুরুজ মতো ছিল, তার নাম চারনক্স্ ব্যাটারী। এটাকে একটু মেরামত-সেরামত করে নিয়ে সেখানে কামান আর গোলন্দাজ পাঠিয়ে জায়গাটাকে একটু জোরালো করে তোলা হল। এই দুই ঘাঁটি—টানা আর চারনকস ব্যাটারী—পার হতে পারলে তবেই যে-কোনো জাহাজ গঙ্গার উপর দিকে উঠতে পারবে।

কলকাতায় লোকবল সত্যি তখন নেহাতই কম। তবে ভাগ্যক্রমে ক্লাইভের ডান হাত কর্নেল ফোর্ড তখন সবে দক্ষিণে ফরাসীদের সঙ্গে লড়ে মসুলিপত্তন জয় করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ক্লাইভ তাঁর সঙ্গে

কিছু সৈন্য দিয়ে তাঁকে চন্দননগরের কাছে গেরিটির বাগানে এক আস্তানা গাড়তে পাঠালেন। ইংরেজদের জাহাজও তখন কলকাতায় খুব কম। মাত্র চারটে ছোট্টো ডিঙির মতো জাহাজ গঙ্গার উপর দিয়ে চলাফেরা করছে। তার মধ্যে আবার একটাকে আরাকানের দিকে পাঠানো হল। অ্যাডমিরল কর্নিস তাঁর নৌ-বাহিনী নিয়ে তখন সেদিকে সফর করছেন—যদি তাঁকে ধরে-পড়ে এদিকে টেনে এনে ফেলতে পারা যায় তাহলে তবু খানিকটা সুরাহা হয়।

ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন শুনে মীর জাফর তাঁকে শেষদেখা দেখার জন্যে কলকাতায় এসেছেন। অক্টোবর মাস। নবাব তখনো কলকাতায় আছেন, এমন সময় খবর এল যে ব্যাটাভিয়া থেকে সাত-সাতটা জাহাজ-ভর্তি ফৌজ আর গোলাবারুদ নিয়ে ডাচরা গঙ্গার মোহনায় এসে হাজির হয়েছে। পাটনা কাশিমবাজার চুঁচড়োয় ডাচদের সেপাই-সংগ্রহের চেষ্টাও আর গোপন রইল না। কথাটা ক্লাইভ মীর জাফরের কানে তুললেন। শুনে মীর জাফর একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। ডাচদের ধমকিয়ে দিয়ে আসছেন বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি হুগলিতে গিয়ে উঠলেন। এই সামান্য ঘটনা থেকেই ক্লাইভ আর তাঁর অনুচরেরা ধরে নিয়েছিলেন যে, ডাচদের সঙ্গে নবাবের নিশ্চয়ই কোনো সড় আছে, ইংরেজদের ঘায়েল করবার জন্যেই নবাবের উসকানিতে ডাচরা অত সৈন্য এনে ফেলেছে। পরবর্তী সব ইংরেজ—কি ঐতিহাসিক আর কি ইতিহাসে অনভিজ্ঞ—এই সম্পর্কে মীর জাফরের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি নানা কটূক্তি করে গেছেন।

কিন্তু মীর জাফরের কাছে ইংরেজদের নাকতোলা কর্তামি অসহ্য হয়ে উঠলেও ক্লাইভের উপর তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা সমানই ছিল। তিনি যে সহজে ডাচদের সাহায্য করতে গিয়ে ক্লাইভকে বিপন্ন করে তুলবেন তা বলে তো কিছুতেই মনে হয় না। ক্লাইভ সশরীরে উপস্থিত থাকতে তাঁর চোখের সামনেই মীর জাফর যে ডাচদের সঙ্গে একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন—সে একটা অসম্ভব ব্যাপার। আর, এই রকম এক বিরাট ষড়যন্ত্র? মীর জাফর একেই বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছেন, তার উপর হরদম ভাঙের নেশায় ঝিমচ্ছেন। ঘোর অসংযমে তাঁর শরীর জরাজীর্ণ। এরকম একটা-কিছু করে তোলার মতো এনারজি তাঁর শরীরে একেবারেই ছিল না। তাছাড়া ইংরেজদের বিক্রম তো তাঁর কাছে হাতে-কলমে পরখ হয়ে গেছে। হাজার নির্বোধ হলেও মীর জাফর ইংরেজ-ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুব-

ডাচদের পিছনে ছুটবেন—এটাও যেন কিরকম কিরকম ঠেকছে, মন থেকে তাতে সায় পাওয়া যাচ্ছে না।

আসল কথা এই যে, ইংরেজরা অনেক দিন ধরে নিজের থেকেই ডাচদের বঙ্গদেশ থেকে তাড়াবার উপায় খুঁজছিলেন। অসুবিধা এই ছিল যে, ইওরোপে তখন ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের মিতালি চলছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে হঠাৎ অস্ত্রধারণ করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসবেন—এমনতর নাবালক ডিপ্লোম্যাট রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন না। তিনি হাতে না মেরে ডাচদের ভাতে মারবার ফন্দি আঁটলেন। মীর জাফরকে হাত করে ব্যবসাক্ষেত্রে এমন সূক্ষ্ম চাল চালতে লাগলেন যাতে খোঁচা খেতে খেতে ডাচরাই মরীয়া হয়ে উঠে একটা বেমক্কা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে। ঠিক তখনই ইংরেজদের অফেনসিভ নেবার সুযোগ উপস্থিত হবে আর দোষটাও তখন বেমালুম ডাচদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারবে। পলিটিক্সের অলিতে-গলিতে যাঁদেরই একটু আনাগোনা আছে, তাঁরাই এসব খেলার মর্ম চট করে ধরে ফেলতে পারবেন।

হুগলিতে গিয়ে নবাব মীর জাফর ডাচদের ডাকিয়ে পাঠালেন। তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেই তাদের কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে সব জেনে নিলেন। ব্যবসার খানিকটা সুবিধাও করে দিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাবধান করে বলেও দিলেন, বঙ্গদেশে বিদেশীদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি তিনি আদবেই দেখতে চান না। নিজেদের একচেটে সুবিধাগুলোর খানিক খানিক ডাচদের পেতে দেখে ইংরেজদের কি রাগ। তা রাগ হবে না কেন? কবিতার ভাষায়—এ যে আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া। কিন্তু নবাব যে ডাচদের খানিকটা কষে ধমকে দিয়ে মারামারি কাটাকাটি করতে বারণ করে দিয়েছিলেন, সেটা ইংরেজরা একেবারে গাপ্‌ করে গেছে।

ডাচদের বুদ্ধিশুদ্ধি বরাবরই একটু স্থূলের দিকে। কূটবুদ্ধিতে ইংরেজরা তাদের সাতজন্ম শিক্ষা দিতে পারে। ক্লাইভ তাদের জন্যে যে ফাঁদ পেতে বসেছিলেন, হোঁতকার মতো দুড়ুম-দাড়াম করে ডাচরা তাতেই পা বাড়িয়ে বসল। ইংরেজদেরই এক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে কি করে আগেভাগে লড়াই বাধানো যায়, তাই ভেবে ভেবে ক্লাইভ সারা হচ্ছিলেন, সেই জায়গায় গোঁয়ার্তুমি করে ডাচরা নিজেই নিজেদের চোর বানিয়ে ফেললে। তাদের যে সাতটা জাহাজ ব্যাটাভিয়া থেকে এসেছিল তাতে সাতশো

ডাচ আর আটশো মালাই সেপাই মজুত ছিল। তারই গরমে মেতে উঠে গঙ্গার উপরে ইংরেজদের মাল বইবার যেসব নৌকো ছিল—যাকে এদেশে ভড় বলে—তাই গোটাকয়েক জবরদখল করে তার সমস্ত মাল ক্রোক করে নিয়ে, মাঝিমাল্লাদেরও বন্দী করে ফেলল। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের যাতে মস্ত অপমান ঠিক সেইটেই করে বসল, অর্থাৎ নৌকোর উপর ওড়ানো বৃটিশ ফ্ল্যাগগুলো ছিঁড়ে খানখান করে দিল। ইংরেজদের যে জাহাজ অ্যাডমিরল কনিসের খোঁজে চলেছিল, সেটাও ডাচদের হাতে পড়ে গেল। এইসব কাণ্ড করতে করতে ডাচদের জাহাজ কখানা ধীরে ধীরে সাঁকরেল পর্যন্ত এসে পৌঁছল।

এইবার ক্লাইভও রণে নামলেন। ইংরেজদের মাত্র তিনটি জাহাজ, কামানও ডাচদের অর্ধেক। কিন্তু এইখানেই তো ক্লাইভের বাহাদুরি। সামান্য বল নিয়ে তিনি এক প্রকাণ্ড বাহিনীর সঙ্গে লড়তে যেতে কখনো ভয় পেতেন না। এমনি তাঁর বুকের পাটা। তার উপর কি অসম্ভব তাঁর কপালজোর। নইলে পলাশীর যুদ্ধে কুড়িগুনো সৈন্য বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও ক্লাইভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধজয় করে ফেললেন! ক্লাইভ ইংরেজদের নৌবহরের কর্তা কমোডোর উইলসনকে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন—যদি ডাচরা ইংরেজদের জাহাজ মালপত্র লোক-লশকর ফেরত দিয়ে না দেয়, আর যা করেছে তার জন্য মাফ না চায়, তাহলে তোমার উপর হুকুম রইল যে, যেমন করে পার তাদের জাহাজ হয় ডোবাবে, নয় পোড়াবে, নয় তো কজা করবে—একটিকেও ছাড়বে না। কমোডোর উইলসন ক্লাইভের অর্ডার পেয়েই ডাচদের কাছে সেই মর্মে এক দাবিপত্র পাঠালেন। ইতিমধ্যে ডাচরা সেপাই-পল্টন ডাঙায় নামিয়ে ফেলেছে। তারা স্থলপথে চুঁচড়ো চলেছে।

কমোডোর উইলসনের দাবিনামা পেতেই যুদ্ধং দেহি বলে ডাচরা এগিয়ে এল। তারপর রাম-রাবণের লড়াই। দু-ঘণ্টা ধরে সে কি ধুনোধুনি, কি ধুন্ধুমার ব্যাপার। ইংরেজদের তিনটে ছোটো ছোট্টো জাহাজ তড়াক তড়াক করে লাফায় আর চারদিক থেকে কামান দাগে। ডাচরাও কম যায় না—তারাও বড় বড় গোলা মুহুর্মুহুঃ ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু ইংরেজদের কপাল ভালো। তাই ডাচদের গোলায় তাদের জাহাজ শতছিদ্র হয়ে গেলেও লোক একটাও মরল না। আর ইংরেজদের গোলায় ডাচ জাহাজী গোরা মরল ঝাঁকে ঝাঁকে, জখমও হল একগাদা। তাদের সাতটা জাহাজের মধ্যে তিনটে জাহাজ ইংরেজদের গোলার চোটে নোঙর তুলে সোজা চম্পট দিল। কিন্তু বেশিদূর পালাতে পারল না, ধরা

পড়ে গেল। বাকি চারটে জাহাজ আব যুঝতে না পেরে খানিক পরেই ফ্ল্যাগ নামিয়ে ইংরেজদের হাতে আত্মসমর্পণ করল।

জলপথে রাস্তা সাফ, এবার স্থলপথ। ডাচরা ডাঙায় সৈন্য নামিয়েছে শুনতে পাওয়া মাত্র ক্লাইভ কর্নেল ফোর্ডকে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন তখনই গিয়ে বরানগরের ডাচ কুঠি দখল করেন। ক্যাপ্টেন নক্সকেও বলে পাঠালেন, তিনি যেন সব সৈন্য একত্র করে গেরিটির বাগানে গিয়ে ফোর্ডের সঙ্গে যোগ দেন। ফোর্ড হেসেখেলে বরানগর হাত করে নিলেন। তারপর গঙ্গা পেরিয়ে গেরিটির বাগানে আবার তাঁবু ফেললেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে, পরদিন ক্যাপ্টেন নক্স এসে জুটলে দুজনে মিলে একসঙ্গে চুঁচড়ো ধাওয়া করবেন। ওদিকে চুঁচড়োব ডাচরা ভাবল, আগেভাগে তেড়েফুঁড়ে যে হামলা লাগাতে পারে সে জেতবার পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়। এই না ভেবে তারা স্বস্থান ত্যাগ করে ফরাসীদের ছেড়ে-যাওয়া টুটোফুটো চন্দননগরে এসে আড্ডা গাড়ল, যাতে ইংরেজরা চুঁচড়োর দিকে আর এগোতে না পারে।

পরদিন সকালে ফোর্ড একাই ডাচদের ঐখানে আক্রমণ করলেন। নক্স তখনো এসে পড়তে পারেননি। দু-পক্ষেরই বল প্রায় সমান সমান। কেবল ইংরেজদের সুবিধের মধ্যে ছিল যে তাদের গোরা পল্টন এদেশের লড়াইয়ে অভ্যস্ত। ডাচরা এর আগে এখানে কখনো যুদ্ধ করেনি। এই সামান্য লড়াইতেও ডাচরা ইংরেজদের সামনে দাঁড়াতে পারলে না। ফোর্ড তাদের সব-কটা কামানই দখল করে নিয়ে তাদের চুঁচড়োর গেট পর্যন্ত ঠেলে পার করে দিয়ে এলেন।

সেই বিকেলেই ক্যাপ্টেন নক্স এসে হাজির হলেন। তাঁর আনা সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের দিকে হল গিয়ে তিনশো-কুড়ি গোরা পল্টন আর আটশো দেশী সেপাই। এর উপর ছিল গোটা পঞ্চাশেক ইংরেজ ভলেনটিয়র ঘোড়সওয়ার। নবাব মীর জাফর একশো ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—কে হারে আর কে জেতে। ফোর্ড খবর পেলেন, ডাচ ফৌজ ডাঙায় নেমে মার্চ করে চুঁচড়ো আসছে, পরদিন সকালেই তারা সেখানে পৌঁছে যাবে। ফোর্ড তখনি দুই ঘোড়সওয়ার কলকাতা ছুটিয়ে দিলেন। তাদের হাতে ক্লাইভকে এক চিঠিতে সমস্ত অবস্থাটা খুলে জানিয়ে দিয়ে লিখলেন যে, ডাচদের সঙ্গে লড়ে গেলে তিনি জিততে পারবেন বলে মনে করেন, কিন্তু লড়বার অর্ডার তো তিনি কিছু পাননি, লড়েন কি করে? ঘোড়সওয়াররা যখন কলকাতা পৌঁছল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সারাদিনের

পরিশ্রমের পর ক্লাইভ তখন তাস খেলায় মত্ত। মস্ত বাজি ধরা আছে। ক্লাইভ ফোর্ডের চিঠি পড়ে টেবিল থেকে আর না-উঠেই চিঠির পিঠে পেনসিলে লিখে দিলেন—ভায়া ফোর্ড, লেগে যাও। যত তাড়াতাড়ি পার লড়ে যাবে। আমি কালই কাউন্সিলের অর্ডার তোমায় পাঠিয়ে দেব।

এই যথেষ্ট। ফোর্ডের কাছে কাউন্সিলও যা ক্লাইভও তা। পরদিন ২৫শে নভেম্বর ১৭৫৯। ভোর হতে-না-হতেই কর্নেল ফোর্ড সৈন্য সাজানোর উদ্যোগ করতে লাগলেন। যে জায়গাটা বেছে নিলেন সেটা চন্দননগর আর চুঁচড়োর মধ্যিখানে একটা প্রকাণ্ড ডাঙা। এর উপর দিয়েই চুঁচড়ো যাবার রাস্তা গেছে। ডান দিকে বেদারা বলে এক নগণ্য গ্রাম। বাঁ দিকে এক আমবাগান। সুবিধা ছিল, সামনেই একটা নিচু খাদ, সেটা ডিঙিয়ে শত্রুপক্ষ সহজে ইংরেজদের কাছ-বরাবর এগোতে পারবে না। এরই ধারে কামান পাতা হল। আর তারই পিছনে ফোর্ড আর তাঁর একদল বাছাই-করা পল্টন শিকারী বেড়ালের মতো ওত পেতে বসে রইলেন। বাকি সৈন্য ভাগ করে খানিক রাখা হল গ্রামের মুখে, আর খানিক রইল আমবাগানের ভিতর।

বেলা দশটা নাগাদ ডাচ ফৌজকে মার্চ করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সৈন্যচালনা করছেন রুসেল বলে এক ফরাসী ঠিকে ক্যাপ্টেন। এগিয়ে এসে যেই তারা ইংরেজদের কামানের পাল্লার মুখে পড়ল অমনি চার-চারটে কামান একসঙ্গে গর্জে উঠল। তাতে ডাচদের পক্ষে খানিক লোক হতাহত হলেও সেটা এমন মারাত্মক-রকমের কিছু নয়। ডাচ সেনা ইংরেজদের কামান কেড়ে নেবার জন্যে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা তখনো জানে না, সামনে একটা বেশ গাঢ় খাদ আছে। তার কাছে এসেই তারা থমকে দাঁড়াল। এতেই হল বিপদ। পিছনের সৈন্যরা কিছুই জানে না, পিছন থেকে তাদের চাপ এসে সামনের সৈন্যদের উপর পড়তে লাগল। সামনের পিছনের দুই দলের মধ্যে বিষম ধাক্কাধাক্কি লেগে গিয়ে সব ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম। ওদিকে ইংরেজ গোলন্দাজরা অনবরত কামান দাগছে। আমবাগান থেকে আর গ্রাম থেকে মুহুর্মুহুঃ গুলি চলছে। অব্যর্থ টিপ।

এ-অবস্থায় ঠিক কি করা উচিত না-উচিত ঠাউরে উঠতে না পেরে ক্যাপ্টেন রুসেল একটু হকচকিয়ে গেলেন। সংকটকালে যে একটু ইতস্তত করেছে সেই মরেছে। রুসেলকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ফোর্ড ঘোড়সওয়ার ভলেনটিয়রদের তাঁকে তাড়া করতে অর্ডার দিলেন। ঘোড়াগুলো একলাফে খাদ ডিঙিয়ে হুড়মুড় করে ডাচদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। তারা তখনো বুঝে উঠতে

পারেনি ঘোড়সওয়াররা সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশ—তারা ধরে নিয়েছিল, পিছন পিছন আরো ঢের বেশি লোক আসছে। ডাচ ফৌজ এতদিন জাহাজের খোলে আড়ষ্ট হয়ে দিন কাটিয়েছে, তখনো ভালো করে তাদের আড় ভাঙেনি। তারা এ-ধাক্কা সহ্য করতে পারলে না। সোজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে। কিন্তু পালাতে পাবল না। ফোর্ড জিতে যাচ্ছেন দেখে নবাবের পাঠানো সেই একশো ঘোড়সওয়ার এতক্ষণে যুদ্ধে যোগ দিল। ততক্ষণে আমবাগান আর বেদারা গ্রাম থেকে ইংরেজ সৈন্যও বেরিয়ে ডাচদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। স্থলের যুদ্ধ এইখানেই খতম। বেদারাব যুদ্ধে ইংরেজদের চূড়ান্ত জিত।

দু-দণ্ডের লড়াই হলেও ডাচদের এতে ক্ষতি হল বিস্তর। মাথা গুনতিতে দেখা গেল, একশো কুড়ি ডাচ পল্টন আর দুশো মালাই সেপাই যুদ্ধে মরেছে, সেপাই-পল্টনে তিনশো জখম হয়েছে। রুসেল নিজে, তাঁর চোদ্দ জন অফিসার, সাড়ে-তিনশো পল্টন আর দুশো সেপাই ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছে। বাকি যারা পালাতে পেরেছিল তাদের মধ্যে মাত্র চোদ্দ জন কোনোক্রমে চুঁচড়োয় পৌছতে পেরেছিল। এরকম দাঁড়িয়ে হার ডাচদের আর কখনো হারতে হয়নি। ইংরেজদের মনের ভিতর যাই থাক না কেন বাইরে তারা ধোপদোরস্ত। মীর জাফরকে পদে পদে যুদ্ধের খবর পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে ক্লাইভ তাঁকে জানাতে লাগলেন, নবাবের রাজ্যে যাতে শান্তি নষ্ট না হয় শুধু সেই চেষ্টাই ইংরেজরা করছে, নবাবেরই তরফ থেকে তারা ডাচদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে।

ডাচরা বিপন্ন হয়ে কসুর কবুল করে সমস্ত দোষটা নিজেদেরই বলে মেনে নিল। না নিয়ে উপায় ছিল না, না নিলে বাংলাদেশে আর তাদের ব্যবসা করে খেতে হত না। বেদারার যুদ্ধজয়ের খবব পাওয়াব তিন দিন পরে নবাবপুত্র মীরন ডাচদের সাজা দেবার জন্যে ছ-হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে চুঁচড়োয় এসে হাজির। ডাচরা প্রমাদ গুনে কর্নেল ক্লাইভের শরণাপন্ন হল। নিজেদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ যাই থাকুক না কেন, এক ইওরোপীয়ন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের হাতে নিগ্রহ ক্লাইভ চুপচাপ বসে দেখতে পারেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ গেরিটির বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মীরনকে ক্ষান্ত করতে না পেরে তিনি খোদ নবাবের পবোয়ানা আনিয়ে নিলেন যে, ডাচদের উপর যেন একটুও কোনোরকম অত্যাচার না হয়।

তারপর ক্লাইভের মধ্যস্থতাতেই ডাচদের সঙ্গে নবাব মীর জাফরের এক সন্ধিশান্তি হয়ে গেল। ক্লাইভ যদিও ডাচদের উচ্ছেদ করতে দিলেন না বটে,

কিন্তু এই সন্ধির ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের ইংরেজদের হাতধরা হয়েই থাকতে হল। তার উপর ক্লাইভ ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ডাচদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা আদায় করে ছাড়লেন। এর পর ডাচরা এদেশে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ডাচদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ে নবাব মীর জাফর খুশি হলেন কি একটু দমে গেলেন—সেটা ঠিক বোঝা গেল না। মানুষের মনের কথা অবশ্য সর্বজ্ঞ শয়তানও অনেক সময় ধরে উঠতে পারে না, সামান্য লেখকরা তো কোন্ ছার।

॥ দশ ॥

সন ১৭৬০ সাল। ক্লাইভকে আর কিছুতেই ধরে রাখা গেল না, তিনি দেশে ফিরে যাবেনই যাবেন। বন্ধুদের অনুগতদের আশ্রিতদেব সব অনুবোধ-উপরোধ বৃথাই গেল। ক্লাইভ কলকাতার গভর্নরিতে ইস্তফা দিয়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্বদেশযাত্রার দিন ঠিক কবে ফেললেন।

ক্লাইভের দেশে ফেববাব এত তাড়ার একটা গুপ্ত কাবণ ছিল। কি কবে এদেশে ইংরেজ বাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পাবা যায়, তাবই এক স্কিমেব খসড়া করে গত বছর ঠিক এই সময় ক্লাইভ তাঁর আত্মীয় আর সেক্রেটারী জন্ ওয়ালশেব মারফত বিলেতেব প্রধান মন্ত্রী উইলিযম পিটকে পাঠিয়েছিলেন। পিট এর পর একনাগাড়ে অনেক দিন ধরে ইংল্যাণ্ডেব প্রধান মন্ত্রীর পদে তিষ্ঠে ছিলেন। ক্লাইভ লিখেছিলেন —চিঠিতে যা আছে তার চেয়ে আরো-কিছু জানবার দবকাব হলে প্রধান মন্ত্রী ওয়ালশকে সে-সম্বন্ধে সওয়াল করতে পারেন। ওয়ালশ বঙ্গদেশের অবস্থা ভালো করেই জানেন, সব কথারই তিনি ঠিকঠাক জবাব দিতে পারবেন। পিট ওয়ালশকে ডেকে কুশলাদি প্রশ্ন করলেন বটে, কিন্তু ক্লাইভের স্কিম সম্বন্ধে হাঁ-না পরিষ্কাব একটা-কিছুই বললেন না। ক্লাইভও কোনো খবর না পেয়ে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা এমনি গুরুতর যে, সেটা নিয়ে আর লেখাজোখা করা চলে না, মুখে মুখে তার আলোচনা করার জন্যেই দেশে ফেরার তাঁর অত তাড়া।

লড়াই না করেই পলাশীব যুদ্ধ জিতে গিয়ে ক্লাইভ ইংরেজদের প্রতাপ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকদের মনে এক প্রচণ্ড বিভীষিকাব সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সঙ্গে একদল বড়-বড় রাজকর্মচারী জমিদার মহাজন আর সামন্ত প্রজাকে একে একে ইংরেজদের অনুগত হয়ে পড়তে দেখে, ক্লাইভ ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ব্যবসাব সঙ্গে এদেশে এক রাজ্য ফাঁদার ফন্দি তাঁব মাথায় ঘুরছিল। কিন্তু রাজত্ব করা তো একটা কারবারী কোম্পানীর কর্ম নয়। বঙ্গদেশকে বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কবে ইংল্যাণ্ডের রাজাকে তার মাথার মণি করে বসাতে হবে—সংক্ষেপে এই ছিল ক্লাইভের স্কিম।

ক্লাইভের ধারণা, এই রাজত্বের প্রধান সহায় হবে বাহুবল। অর্থাৎ, রাজ্যচালনার ভিত্তি হবে ভয় দেখিয়ে প্রজাবশ করা। ভয় দেখাতে গেলেই দরকার বিস্তর গোরা পল্টন। দেশী সেপাই কাজে কম না হলেও এদেশের লোকের কাছে লালমুখের ভয়—সে অন্য একরকমের জিনিস। কিন্তু নিয়মিত-ভাবে এদেশে গোরা পল্টন পাঠানোর কাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরদের ক্ষমতার বাইরে। খরচের ভয়ে এমন কি যথেষ্ট পরিমাণে দেশী সেপাইও বরাবরের জন্যে মোতায়েন রাখতে তাঁরা যে রাজি নন—ক্লাইভ সেটা ভালো করেই জানেন। আর জানেন যে, এসব স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন ইংল্যাণ্ডের রাজার নামে মহামান্য বৃটিশ গভর্মেণ্ট।

ঐ দিকে এগোবার প্রথম ধাপ হচ্ছে বাংলার দেওয়ানি বৃটিশ গভর্মেণ্টের হাতে তুলে দেওয়া। ক্লাইভ আশ্বাস দিলেন, ইংরেজরা বাংলা-মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার নিতে চাইলে দিল্লির বাদশা আর তাঁর উজির সে-প্রস্তাব লুফে নেবেন, কারণ বাংলার সুবেদারের কাছ থেকে বাদশার প্রাপ্য টাকা আদায় হয় কদাচিৎ কালেভদ্রে। যতক্ষণ না বাদশা টাকা আদায়ের জন্যে রীতিমতো ফৌজ পাঠাচ্ছেন ততক্ষণ সুবেদার কিছুতেই উপুড়হস্ত হন না। দিল্লির যা অবস্থা হচ্ছে দিনে দিনে, তাতে বড়ে একটা গোটা ফৌজ পাঠানো তো অনেক দূরের কথা, একটা ছোটোখাটো রেজিমেণ্টও সুদূর বঙ্গদেশে পাঠানো বেশ একটু কষ্টকর ব্যাপার। এই কাজের ভার ইংরেজরা নিলে বাদশা-উজির তো বর্তে যাবেন। কেননা তাঁরা বেশ জানেন. তাহলে তাঁদের প্রাপ্য টাকার কিস্তি কখনো খেলাপ হবে না।

ক্লাইভ আরো জানিয়ে দিয়েছিলেন—এর আগেই উজির ঘাজীউদ্দীন তাঁকে সুবে বাংলার দেওয়ান করার কথা তুলেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল তাতে করে তাঁর সঙ্গে মীর জাফরের চিরকালের মতো বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। বৃটিশ গভর্মেণ্ট সহায় না হলে কোম্পানীর এমন লোকবল নেই আর এমন ধনবলও নেই যে এখনি নবাবের সঙ্গে সব কাটান-ছাড়ান করে ইংরেজরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। এই সঙ্গে ক্লাইভ পিটকে ভজাবার জন্যে দুর্লভরামের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়-অনাদায়ের হিসেব তন্নতন্ন করে বুঝে নিয়ে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন, দিল্লির বাদশাকে সাল সাল পঞ্চাশ লাখ করে দিয়েও খাজনার যে-টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে সেটা আড়াই কোটি টাকার কম যাবে না। এই টাকায় বৃটিশ গভর্মেণ্ট আনন্দে হেসেখেলে এখানকার দেওয়ানির কাজ

চালিয়ে যেতে পারবেন। একটু মেহনত করে আরো খানিকটা গোছগাছ করে নিলে ঐ আড়াই কোটিকে পাঁচ কোটিতে দাঁড় করাতে খুব বেশি সময় লাগবে না, তেলখড়ও তেমন-কিছু পোড়াতে হবে না। সাদা বাংলায় ক্লাইভের স্কিমের সারাংশ হল এই।

ক্লাইভের এই স্কিমের প্রথম অংশটা কাজে পরিণত হতে ঠিক একশো বছর সময় লেগেছিল। ১৮৫৮ সালে সিপাই বিদ্রোহের পর থেকে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার মুকুটের উজ্জ্বল মধ্যমণি হয়ে শোভাবর্ধন করতে লাগল। তখন কোথায় রবার্ট ক্লাইভ আর কোথায় উইলিয়ম পিট? কোথায়-বা ইংল্যাণ্ডের রাজা জর্জ দি থার্ড আর কোথায়ই-বা দিল্লির বাদশা আর তাঁর উজির নাজির সুবেদার ফৌজদার? ভারতবর্ষে কারবারী যুগ শেষ হয়ে সাম্রাজ্যিক যুগ শুরু হল, অর্থাৎ এইখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান আর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান গভর্মেণ্টের অভ্যুদয়।

ক্লাইভের স্কিমের অপর অংশ—অর্থাৎ বৃটিশ গভর্মেণ্টের সুবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণের প্রস্তাব—কিন্তু একরকম কাজে লেগেছিল ১৭৬৬ সাল থেকেই। ঐ বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে ক্লাইভ তখনকার বাদশা শা আলমের হাত থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ তখন ব্যারন ক্লাইভ অভ প্ল্যাশী হয়ে দ্বিতীয়বার কলকাতার গভর্নরি করতে এদেশে এসেছেন। কিন্তু এই দেওয়ানি নেওয়ার ফল যে ভালো ফলেছিল, সেকথা ইতিহাসে বলে না। উলটে বরং এই দেখা যায় যে, এর ফলে বাংলাদেশে বিপ্লব দুর্ভিক্ষ অরাজকতা—কিছুই বাদ যায়নি। তার সূত্রপাতেই ক্লাইভ যে নবাবী ওঠবোসের খেল দেখিয়ে গিয়েছিলেন তার ফলে দেখা দিয়েছিল ইংরেজ চরিত্রের এক অতি কদর্য রূপ—যার কলঙ্ক ইংরেজরা আজ পর্যন্তও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

সে যাই হোক, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নানারকমের লোককে লেখা ক্লাইভের চিঠিপত্র থেকে এইটেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি তিনটি সংকল্প করেছিলেন—প্রথম হচ্ছে, নবাব মীর জাফরের কাছ থেকে যে-টাকা তিনি কোম্পানীকে আদায় করে দেবেন বলে স্বীকার গিয়েছিলেন, সেটা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করা; তারপর এই কলকাতাতেই এমন এক কেল্লা ফাঁদা যাতে আর যেন কেউ কখনো সেখানে এসে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করতে না পারে; আর শেষ সংকল্প—যার কথা তিনি পিটকেও জানিয়েছিলেন—এদেশের রাজা-বাদশা নবাব-জমিদার উজির-নাজির থেকে শুরু করে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেরই

প্রাণে এমন আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়া যে, ইংরেজের ভয়ে তাদের লাগবে সর্বদাই থরহরি কম্প।

মীর জাফর কোম্পানীকে সত্যি যে-টাকা দেবার শর্ত করেছিলেন, সে-টাকা তিনি অনেক আগেই শুধে দিয়েছিলেন। তবে তার সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীদের ফৌজদের আর কলকাতার বাসিন্দাদের খেসারতের নাম করে যে-টাকা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, সে-টাকা শোধ করতে তাঁর একটু দেরি হয়েছিল বটে। তবু ক্লাইভ দেশে ফিরে যাবার আগেই দেখে গিয়েছিলেন, তার প্রায় সবটাই হয় নগদে নয় দামী দামী জিনিসপত্রের বাবদে নয় জমিদারদের মালগুজারির উপর বরাত দিয়ে—যে করেই হোক না কেন—আদায় হয়ে এসেছে। মাত্র সাড়ে-তিন লক্ষ টাকা তখন বাকি। যেখানে আড়াই কোটি টাকার খেলা, সেখানে সাড়ে-তিন লাখ তো নস্যির শামিল। বন্ধুবর রবার্ট ক্লাইভ এটা-ওটার নাম করে খোদ খাতে যে-টাকা নিজের পকেটে পুরেছিলেন, তার হিসেব অবশ্য আলাদা, এর সঙ্গে সেটাকে জোড়া হল না।

কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যে সেখানে একটা মজবুত কেল্লার দরকার—একথা তখনকার সব ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরই মাথায় ঘুরছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ে পুরনো ফোর্ট উইলিয়মকে কিরকম যে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল—সেকথা অনেকেরই মনে ছিল। তাই এক কর্তা প্রস্তাব করলেন, পুরনো ফোর্টের সামনের আদ্যিকালের সেই লালদিঘিটা ভরাট করে ফেলে একটা ফাঁকা ময়দান করা হোক আর তারই গায়ে একটা নতুন করে কেল্লা ওঠানো হোক। কিন্তু এ-প্রস্তাব কারো মনঃপূত হল না। তখন আর এক কর্তা বললেন, গঙ্গার ধার থেকে পোস্তা গেঁথে, পুরনো ডক—অর্থাৎ আজকালকার ছোট আদালত—থেকে আরম্ভ করে পর্তুগীজ-আর্মানী গির্জের কাছ পর্যন্ত জায়গা জুড়ে এক ছ-কোনা কেল্লা বানানো যাক। কলকাতার সিলেক্ট কমিটি এটা মঞ্জুর করে হুকুম দিলেন, অবিলম্বে এই এলাকার সব বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে ফেলে দিয়ে মাঠ করে দেওয়া হোক। ক্লাইভ তখন মুর্শিদাবাদে মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসাতে ব্যস্ত।

টাকাকড়ির বন্দোবস্ত ঠিক করে কলকাতা পৌঁছে ব্যাপার দেখে ক্লাইভ তো আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি তখনি বাড়ি ভাঙার হুকুম রদ করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। শহরের ঠিক মধ্যিখানে কেল্লা বানালে সে-কেল্লা কিরকম কাজের হয় তার তো প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল এক বছর আগেই—নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন ইংরেজদের সাজা দেবার জন্যে কলকাতার উপর হানা

দেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম থেকে যেসব গোলাগুলি ছোড়া হয়েছিল সেগুলো শুধু আশেপাশের বড় বড় বাড়িগুলোরই ক্ষতি করতে পেরেছিল, শত্রুর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি। আবার সেই শহরের মধ্যেই কেল্লা? লোকদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ক্লাইভ ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, কলকাতার দক্ষিণের গোবিন্দপুর গ্রাম হচ্ছে নতুন কেল্লা বসাবার উপযুক্ত স্থান। সেখানে বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেসব কাঁচা, খড়ে-ছাওয়া। তখনকার দিনেব নিয়মে নবাবের প্রজারা সরকারের অনুমতি ছাড়া পাকা বাড়ি ওঠাতে পারতেন না। গোবিন্দপুর তখন খাস বাঙালী-পাড়া, একটি ইংরেজও এই গ্রামের মধ্যে ঢোকেনি। গ্রামের সামনেই গঙ্গা, আর তিন ধারে গভীর বন-জঙ্গল, সেখানে দিনে-তুপুরে বাঘ ডাকে।

ক্লাইভ এই গ্রামের বাসিন্দাদের উঠিয়ে দিলেন। তখনকার ইংরেজদেব একটা মস্ত সদ্‌গুণ ছিল এই যে, তাঁরা প্রজাদের জমিজিরাত বাড়িঘর জিনিসপত্র মুফতে কেড়ে নিতেন না, তাব দরুন সর্বদাই একটা ন্যায্য মূল্য ধরে দিতেন। তাইতেই তো বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন একটু অবাক হয়েই লিখে গেছেন, ইংরেজরা বড় মজার জাত। যুদ্ধের সময়ও তারা যেখান যেখান দিয়ে যায়, সেখানে সৈন্যের রসদ, ঘোড়ার দানা, সরঞ্জামী জিনিসপত্র, সবই দাম দিয়ে কেনে। আশ্চর্য হবার কথা বটে! তখনকার দিনের রাজপুরুষদের সেনাপতিদের কাণ্ডকারখানা তো গোলাম হোসেনেব অজানা ছিল না। এমন অবস্থায় পথের ধারের খেত-খামারে দোকানপাটে যা-কিছু তাঁরা দেখতেন, সবই লুটেপুটে সাফ কবে নিতে একটুও দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। তবে তাতে ঢাকঢাক গুড়গুড় ছিল না। আজকালকার দিনেব মতো অমনি অমনি নেবার জন্যে আইনের ছল-কৌশলের পাতলা আবরণটুকুরও দরকার হত না।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর প্রজা ছিলেন শেঠেরা আর তাঁদেরই আত্মীয়-কুটম্ব। অনেক লেখকই এঁদের মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের বংশ বলে ভ্রমাত্মক উক্তি করে গেছেন। জগৎশেঠেরা হিন্দুই নন, জৈন। গোবিন্দপুরের শেঠরা হিন্দু, তন্তুবায় সম্প্রদায়ের লোক। শেঠেরা অনেকদিন ধরেই পুরুষানুক্রমে ইংরেজদের বড় দালালের কাজ করে আসছেন। সাহেবী পাড়ায় অর্থাৎ আজকালকার ডালহাউসি স্কোয়ারের চারধারে তাঁদের কারো কারো বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেখানে বাস করতেন না, সাহেবদের ভাড়া দিতেন। সাদা লোকের সঙ্গে কালা-আদমির একত্র বসবাস অনেক দিন ধরে তু-পক্ষেরই কাছে একটু অস্বস্তিকর ব্যাপার ছিল। তাঁরা নিজেদের বসবাস আর তাঁদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর

মন্দিরের জন্যে বড়বাজারে একটা জমি বদলিতে পেয়ে সেখানে উঠে গেলেন। বড়বাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে গোবিন্দপুরের অন্যান্য প্রজারাও জমি পেয়ে তাঁদের মাথাগোঁজার জায়গা করে নিলেন। যাঁরা জমি নিলেন না, তাঁরা খেসারত নিয়ে সিমলা আরপুলি জানবাজার প্রভৃতি গ্রামে গিয়ে বসলেন। যদি কেউ এঁদের বংশাবলী নিয়ে একটু আগ্রহে নাড়াচাড়া করেন, তাহলে দেখবেন, কলকাতাব অনেক বনেদী ঘরের প্রতিষ্ঠাতারা তখন গোবিন্দপুর থেকেই এদিকে বাস করতে এসেছিলেন। এখন অবশ্য এঁদের বংশধরদের পড়ন্ত অবস্থা, অনেক বংশ আবার একেবারে লুপ্তও হয়ে গেছে; কিন্তু এক সময় এঁরাই কলকাতার দেশী-সমাজে আসর গরম করে রেখেছিলেন। আর সেই সমাজের উপর তাঁরা এমন একটা শহুরে কালচারের ছাপ মেরে রেখে গেছেন যে, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, সেটা আজকালকার মতো শুধু টাকার গরমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

ক্লাইভ রবার পেন্সিল নিয়ে কেল্লার প্ল্যান আঁকাতে মন দিলেন। চারদিকের বনজঙ্গল কেটে সেখানে ঘাস লাগানোতে প্রকাণ্ড এক ময়দান বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীর কুত্রাপি শহরের গায়েই এত বড ফাঁকা ময়দান আর একটাও নেই। তবে আজকাল যে-রেটে ময়দানের উপর আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি উঠতে লেগেছে, তাতে এ-ময়দান আব কতদিন যে ফাঁকা থাকবে, তা হলপ করে বলা শক্ত। দু-মাসেব মধ্যেই ক্লাইভ নতুন ফোর্ট উইলিয়মের প্ল্যান খাড়া করে ফেললেন। ১৭৫৭ সালের অক্টোবর মাসে গঙ্গার ধারে নতুন কেল্লার ভিতের পাথর নামানো হল। তখন থেকেই গোবিন্দপুর গ্রাম গড় গোবিন্দপুর নামে লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন ব্রোইয়র কেল্লা তৈবির কাজে লেগে গেলেন। কিন্তু তৈরি কেল্লা ক্লাইভকে আর দেখে যেতে হয়নি। নানা গোলযোগে কেল্লা তৈরির কাজ শেষ হতে ষোলো বছর লেগে গেল। ১৭৭৩ সালে মহা ধুমধামে এই নতুন ফোর্ট উইলিয়ম খোলা হয়। ক্লাইভ তখন স্বদেশে। এর ঠিক এক বছর পরেই তাঁর ইহলোকের সব খেলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এই কেল্লা তুলতে খরচ পড়েছিল প্রায় দু-কোটি টাকা। হল বটে এক চোখ-ধাঁধানো এলাহী কারখানা; কিন্তু এ-কেল্লা থেকে একটা গোলাগুলিও কখনো ছুঁড়তে হয়নি। ছোট-বড় কোনোরকমেরই শত্রু এই কেল্লার কাছে আসতে কখনো সাহস করেনি। আজ এই একশো নব্বই বছর ধরে গড়ের মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কেল্লা শুধু শহরের শোভা বর্ধন করছে।

কিন্তু নতুন ফোর্ট উইলিয়মে একটা বড়গোছের গোরা পল্টনের ফৌজ সদাসর্বদা মোতায়েন রাখতে কোম্পানী-বাহাদুর কিছুতেই রাজি হলেন না। ক্লাইভ যে বঙ্গদেশে একটা ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তনের উদ্যোগ করছেন—সেটা তখনো ডিরেক্টরদের মাথায় ঠিক ঢোকেনি। তা ঢুকবে কি করে? তাঁরা তো শুধু বোঝেন, মাল আমদানি-রপ্তানি বেচাকেনা লাভলোকসান স্টক-ডিভিডেণ্ড—আদাব ব্যাপাবী হয়ে তাঁবা জাহাজেব খবর রাখবেন বি করে? রাজ্যফাঁদা রাজ্যরক্ষা রাজ্যবিস্তার—এসব ব্যাপার তাঁবা বোঝেনও না, বুঝতে চানও না, ওসব তাঁদেব কাজ বলে মনেও করেন না। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী নিজে যখন প্রসন্ন হয়ে ইংরেজদেব তাঁব ববপুত্র বলে গ্রহণ করেছেন তখন ডিবেক্টররা এসব ঠেকানই বা কি কবে? ডিবেক্টরদের আচরণে ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হলেন বটে, কিন্তু দমে গেলেন না, মধুব অভাবে আপাতত গুড দিয়েই কাজ সাবা ঠিক করলেন। তিনি ভোজপুর থেকে জোয়ান জোয়ান দেখে সেপাই নিয়ে এসে দলভর্তি করে এক ফৌজ গড়ে তুললেন। ইংবেজ গোরাদের মতো এদেরও লাল পোশাক বলে এদের নাম হয়েছিল লাল পল্টন। শিগগিরই জনকতক ইংরেজ অফিসারের কাছে শিক্ষা পেয়ে এই দেশী সেপাইরা এমনই ডিসিপ্লিণ্ড হয়ে উঠল যে, তাদের দেখে চিনতে না পেরে ক্লাইভ নিজেই অবাক। পনেবশো দিশি সেপাই-এর ফৌজ তিনি সব সময় হাতেব কাছে মজুত পেতে লাগলেন।

সুবিধাও হয়ে গেল। মীব জাফরের রাজত্বের শুরু থেকেই দেশে একটা-না-একটা উৎপাত লেগেই ছিল। নবাবের রাজ্যরক্ষার কাজে লাগছে বলে নবাবেরই খাজাঞ্চিখানা থেকে মাস মাস সেপাই-পল্টনের মাইনে আদায় হতে লাগল। কোম্পানীর গায়ে আঁচ লাগছে না দেখে ডিরেক্টররাও এ-বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। মীর জাফরের নিজের এতে একদিক থেকে সুবিধা হল। তিনি নবাবী ফৌজ থেকে সৈন্য অনেক কমিয়ে আনলেন। তার বদলে দরকারের সময় ঢের বেশি মজবুত ঢের বেশি সুশিক্ষিত লাল পল্টনকে তিনি ডাক দিলেই হাতের কাছে পেতেন। আর, কান টানলেই যেমন তার সঙ্গে মাথা এসে পড়ে, তেমনি সেপাইদের সঙ্গে একদল গোরা পল্টন আর দু-চারজন জাঁদরেল অফিসারদেরও ফাউ পেয়ে যেতেন। আরো এক বড় কথা এই যে, অসময়ে নবাবী ফৌজের চেয়ে এদের উপর ঢের বেশি নির্ভর করতে পারা যেত—এরা নিমক খেয়ে সহজে নিমকহারামি করত না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইংরেজদের জালে তিনি আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু এমনটা যে ঘটবে, সেটা মীর জাফরের আগের থেকেই

ভাবা উচিত ছিল, না-ভাববার বয়েস তো তাঁর ঠিক নয়। যখনি ইংরেজদের সাহায্যে তিনি নবাবী গদি দখল করলেন তখনি তিনি ইংরেজদের হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে গেলেন। তার থেকে আর নিস্তার ছিল না। আর ইংরেজদের হাত ছেড়ে তিনি যানই বা কোথায়? এক সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোনো নগণ্য জায়গায় সামান্য প্রজার মতো চুপচাপ বসে থাকতে পারেন বটে, কিন্তু সে-বান্দা মীর জাফর আলী খাঁ নন। নবাবিতে তাঁর ষোলো আনা ছেড়ে আঠারো আনা লোভ।

সব বেশ চলছিল, গোল উপস্থিত হল ক্লাইভের দেশে ফিরে যাবার সময়। ক্লাইভ নিজের চেষ্টায় কোম্পানাকে যেখানে ঠেলে তুলেছিলেন সেখানকার মাটিটা তেমন শক্ত ছিল না। ক্লাইভের মতো একটা অসাধারণ লোক চাড় দিয়ে না থাকলে সেখান থেকে পড়া-টা অনিবার্য। আর সেটা সকলের চেয়ে ভালো জানতেন ক্লাইভ নিজেই। তাই যাবার আগে তিনি ডিরেক্টরদের ধরে বসলেন যেন লায়নেল ফোর্ডকে তাঁরা বাংলাদেশে ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার-ইন-চিফ করে বসিয়ে দেন। কিন্তু ডিরেক্টররা তাতে রাজি হলেন না। তাঁরা হিসেবী লোক। গুনেগেঁথে দেখলেন, কর্নেল আয়ার কুটকে বাংলার জঙ্গীলাট করলে লাভ আছে। আয়ার কুট আসলে কোম্পানীর কর্মচারী নন, বৃটিশ গভর্মেণ্টের মিলিটারী অফিসার। সুতরাং বৃটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কর্নেল কুটকে সেনাপতি পেলে তাঁর তাঁদের বৃটিশ ফৌজকে মাগনা পাওয়া যাবে—সেটা বড় কম লাভের কথা নয়।

আয়ার কুট ভারী মাথাগরম লোক। হঠাৎ কখন কি করে বসেন, তার ঠিক নেই। তার উপর এদেশের লোকের উপর তার দারুণ অভক্তি, তাদের মানুষ বলেই তিনি গণ্য করেন না। এদেশের নবাব জমিদার মহাজনদের উপর তাঁর আক্রোশও বড় কম নয়। সর্বদাই তিনি তাঁদের উপর মুরুব্বিয়ানা চাল চালতে থাকেন। তার উপর স্বভাবটিও তাঁর বেজায় খুঁতখুঁতে। নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু বলে ধারণা থাকার দরুন তিনি যত টাকাই মাইনে পান না কেন, কিছুতেই সন্তুষ্ট নন। মনে করেন, তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে কর্তারা তাঁকে বঞ্চিত করবার ষড়যন্ত্র করছেন। আয়ার কুটকে একটা খুব ভালো যোদ্ধা বলে জানলেও ক্লাইভ এই সংকটকালে তাকে বাংলাদেশের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত সেনাপতি বলে মনে করলেন না। কারণ এদেশের তখন এমনি অবস্থা যে, সেনাপতি শুধু সৈন্যচালনা করেই খালাস পেতেন না, তাঁকে পলিটিক্সেরও হাল ধরতে হত—সেটা মাথাগরম লোকের কর্ম নয়। কিন্তু কি করবেন? ডিরেক্টররা

তখন আয়ার কুটের দিকে এমনই ঢলেছেন যে, ক্লাইভের সব যুক্তিতর্ক মাঠে মারা গেল।

কিন্তু ক্লাইভও কিছু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বেশ এক গরম-গরম ডেসপ্যাচ ছেড়ে ডিরেক্টরদের দু-কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, ডিরেক্টররা পরের মুখে ঝাল খেয়ে পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারীদের যথাযোগ্য সমাদর করেন না, সম্মানও দেন না। নিজেদের খুশিমতো নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কৃপা বিলতে থাকেন। এ-বিষয়ের একটা ভালোরকম নিষ্পত্তি না হলে কোম্পানীর কাজে কোনো ভালো লোকই আর ঢুকতে চাইবেন না, যাঁরা আছেন, তাঁরা শুধু দিনগত পাপক্ষয় করতে রিটায়ারমেণ্ট পর্যন্ত থাকবেন। তাতে কোম্পানীর কাজের কোনো সুব্যবস্থা করতে পারা যাবে না। নীচে নাবতে নাবতে শেষে কোম্পানীর কাজ একেবারে মূলে হাবাত হয়ে যাবে। শুধু ডেসপ্যাচ লিখেই ক্লাইভ ক্ষান্ত হলেন না, এই নিয়ে ডিরেক্টরদেব সঙ্গে খোলাখুলি একটা তর্কবিতর্ক করার জন্যেও তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। ক্লাইভের হাজার দোষ থাকলেও তিনি কর্তব্যে সর্বদাই অটল থাকতেন। দেশের স্বার্থের কাছে নিজের স্বার্থকে তিনি বড় করে দেখেননি। এদেশের ইংরেজদেব শ্রীবৃদ্ধি হোক—এটা যে তাঁর মনোগত বাসনা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ঠিক এই সব কারণেই তিনি ইংরেজদের অতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

যাই হোক আয়ার কুট তখন দক্ষিণ দেশে কাউণ্ট লালীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তিনি তখনি তখনি বঙ্গদেশে এসে পড়তে পারলেন না। সুতরাং ডিরেক্টররা ক্লাইভেরই সুপারিশে আপাতত কিছুদিনের জন্যে মেজর জন্ ক্যাইলোডকে বাংলাদেশের ইংরেজ ফৌজের অধিনায়ক করে পাঠালেন। ক্যাইলোড অল্পস্বল্প সৈন্যসামন্ত নিয়ে কলকাতা পৌছনো মাত্র ক্লাইভ তাঁকে মুর্শিদাবাদ রওনা করে দিলেন। মীর জাফরের সঙ্গে নতুন সেনাপতির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে অল্প কিছুদিন পরে তিনি নিজেই মুর্শিদাবাদে চললেন। নবাবকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে সাবধানে থাকতে উপদেশ দিয়ে ক্লাইভ তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

এখন আর-একটা বন্দোবস্ত করতে হয়। ক্লাইভের পরে কে যে কলকাতার গভর্নর হবেন, সেটা একটা মস্ত ভাবনার কথা। সব পুরনো লোকই তো একে একে দেশে ফিরে গেছেন, কেবল অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনীকার জন্ জেফানায়া হলওয়েল এখনো কলকাতায় আছেন। তাঁকে সকলেই চেনে। পাকা

গভর্নরি তাঁকে দিতে ডিরেক্টররাও রাজি নন। সেই ক্লাইভেরই সুপারিশে এক্ষেত্রেও ডিরেক্টররা মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের হেনরি ভ্যানসিটার্টকে কলকাতার পাকা গভর্নরি খয়রাত করলেন। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, কাজের ভিড়ের দরুন ভ্যানসিটার্ট ক্লাইভ কলকাতায় থাকতে থাকতে ছাড়া পেলেন না। তিনি যে তাড়াতাড়ি কলকাতায় এসে ক্লাইভের কাছ থেকে সব বুঝেপড়ে নেবেন তার আর জো রইল না। সেই হলওয়েলই আবার কলকাতার একটিনি গভর্নরিতে চেয়ার পেতে বসলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৭৬০) ফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল ক্লাইভ চাঁদপাল ঘাটে পান্সিতে উঠলেন। খানিকদূর এগিয়ে গিয়েই রয়াল জর্জ বলে সমুদ্রপাড়ি দেবার জাহাজ ধরবেন। ক্লাইভের মন ভার। যাবার আগেই শুনেছিলেন, শাজাদা আবার বঙ্গবিজয় করার উদ্দেশে উত্তরপ্রদেশ থেকে রওনা হয়েছেন। এই সময় ক্লাইভ রইলেন না, কিসের থেকে যে কি হয়, তা তো বলা যায় না। ওদিকে যিনি অ্যাকটিং গভর্নর হয়ে বসলেন সব ঘটে ঢুকে তালগোল পাকাতে তাঁর মতো ওস্তাদ দ্বিতীয় আর-একটা নেই। রয়াল জর্জ যখন ক্লাইভকে আর ফোর্ডকে নিয়ে সাগরে পড়ো-পড়ো তখন খবর এল, এক মাস পুর্বেই দক্ষিণে আয়ার কুটের হাতে ফরাসীরা হেরে ঢোল হয়ে গেছে। ওয়ান্দিওয়াশের যুদ্ধে কাউণ্ট লালী বিষম জখম আর জেনারল বুসী ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীদের যা-কিছু কামান-বন্দুক গোলাগুলি সাজ-সরঞ্জাম ছিল সবই ইংরেজদের হাতে এসে পড়েছে। ইংরেজদের পক্ষে খুবই সুখবর বটে।

॥ এগারো ॥

শরৎকাল পড়তেই শাজাদা আলী গোহর আবার একবার বঙ্গবিজয়ে বেরোলেন। রেওয়া থেকে যাত্রা করে মির্জাপুর এলাহাবাদ কাশী হয়ে চলতে চলতে শেষে কর্মনাশার তীরে এলেন। নদী পেরিয়ে আবার একবার বিহারপ্রদেশে ঢুকলেন। শের শাহের দেশ সসারাম ছাড়িয়ে আজকালকার শোননগরের কাছ-বরাবর এসে পৌঁছিয়েছেন এমন সময় খবর পেলেন—মাসখানেক আগে, অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর (১৭৫৯) তারিখে, তার বাবা বাদশা আলমগীর শানিকে উজির ঘাজীউদ্দীন গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করিয়েছেন।

ঘটনাটা এইরকম। দুরন্ত দুরানীরাজ আহমদ শা আবদালী আবার পাঞ্জাবে এসে পৌঁছিয়েছেন। পাঞ্জাবে তখন উজির ঘাজীউদ্দীনের কল্যাণে এক মারাঠী গভর্নর। আবদালী আসছেন শুনেই সেই গভর্নর লাহোর ছেড়ে ছুটতে ছুটতে এসে সোজা দিল্লির মারাঠা ক্যাম্পে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মারাঠা সর্দার দত্তাজী তখন উজির ঘাজীউদ্দীনের সহায় হয়ে দিল্লির কাছাকাছি জায়গাকার জমিদার জাইগিরদারদের টিট করতে আর সঙ্গে সঙ্গে শহর গ্রাম সব লুঠপাট করতে ব্যস্ত। লুঠ করা থেকে কোনো মারাঠীকে নিরস্ত করা কারো সাধ্য ছিল না।

ঘাজীউদ্দীন যখন শুনলেন যে, অতি সহজেই আবদালী সমস্ত পাঞ্জাব দেশটাই দখল করে নিয়েছেন তখন তিনি বেশ বুঝলেন, দুরানীরাজ শিগগিরই আর দেশে ফিরছেন না। এতদূর এগিয়ে তিনি দিল্লিকে আর ছেড়ে দেবেন না। সেই ১৭৫৭ সালের মতোই আবার দিল্লির বাদশার পক্ষ হয়ে উজিরের সর্বনাশ করবেন। এই না ভেবে ঘাজীউদ্দীন প্রথমেই বাদশা আলমগীর শানিকে সাবাড় করা মনস্থ করলেন।

বাদশা আলমগীর শানি নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারা ভালোমানুষ। ইসলাম ধর্মের সব কটা হদিশই তিনি মেনে চলতে চেষ্টা করেন। সাধুসন্ত ফকির-দরবেশে তাঁর অগাধ ভক্তি, অলৌকিক সব ব্যাপারে ভারী আগ্রহ। উজিরের শাগরেদরা বাদশাকে মিথ্যে করে খবর দিলে, লাহোর থেকে এক মস্ত ফকির এসে ফিরোজ শা কোটলার ভাঙা বুরুজের তলায় আসন নিয়েছেন। কি আশ্চর্য তাঁর শক্তি-

বিভূতি! ফকির-সাহেবের কেরামতির কসরত দেখবার ঝোঁকে বাদশা অতি সহজেই উজিরের পাতা ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিলেন। বিকেলে লালকেল্লা থেকে বেরিয়ে ফিরোজ শা কোটলার দিকে গিয়ে দেখলেন, উজিরের বডিগার্ডের সর্দার, বালাবক্স খাঁ, জায়গাটায় টহল দিচ্ছেন। বালাবক্স কুর্নিশ করে বাদশাকে বললেন, ফকির-সাহেবের দর্শন পেতে হলে দীনভাবেই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত, আর সেখানে লোকজনের ভিড় জমানো ঠিক কাজ নয়। সরলমনা বাদশা তাই ঠিক মনে করে একটি মাত্র খোজা সঙ্গে নিয়ে বুরুজের তলার কুঠরির দিকে পা বাড়ালেন। সঙ্গীদের সবাই বাইরে রয়ে গেলেন।

অন্ধকার ঘরে যেই না পা দেওয়া অমনি বালাবক্স খাঁ খাপ থেকে ধারালো তলোয়ার বের করে এক কোপেই বাদশার ধড় থেকে মুণ্ড খসিয়ে দিলেন। বাইরে বালাবক্সের সেপাইরা বাদশার লোকজনদের সব একে একে বেঁধে ফেললে। তখন বাদশার মৃতদেহ কোটলা থেকে যমুনার পাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। বালাবক্স প্রচার করে দিলেন, সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নাবতে গিয়ে বাদশার পা হড়কে যাওয়ায় তিনি টাল সামলাতে না পেরে ভাঙা পাঁচিল টপকিয়ে একেবারে মাটিতে গিয়ে পড়েছেন। দুশো বছর আগে বাদশা হুমায়ুন যেমন করে মরেছিলেন—এও সেই ঠিক তেমনি আর-কি!

রাত-দুপুরে হুমায়ুনেরই কবরখানায় বাদশা আলমগীর শানিকেও গোর দেওয়া হল। পরদিন সকালে উজির ঘাজীউদ্দীন বাদশা আওরংজেবের ছোট ছেলে মির্জা কামবক্সের এক নাবালক নাতি মুহী-উল্-মিল্লাতকে লালকেল্লার কয়েদখানা থেকে বের করে এনে শাজাহান শানি নাম দিয়ে দিল্লির বাদশা বানিয়ে দিলেন। কিন্তু এত কাণ্ড করেও ঘাজীউদ্দীনের একটুও লাভ হল না। দু-চার দিনের মধ্যে তাঁকেও আবদালীর ভয়ে সেই যে দিল্লি ছেড়ে পালাতে হল—আর সেখানে ফিরতে হল না।

ওদিকে শোননদের ধারে বসে শাজাদা আলী গোহর মোগলাই প্রথা-অনুসারে এক কাঠের সিংহাসন তৈরি করিয়ে তার উপর চড়ে বসলেন। তাঁর এক পারিষদ তাঁর মাথার উপর ছাতা খুলে ধরলেন। আর-এক পারিষদ অভিষেক-মন্ত্র আওড়ালেন। আলী গোহর শাজাদা ছিলেন এখন হলেন বাদশা। নাম নিলেন—শা আলম শানি। সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে হিন্দুস্থানের উজিরের পদ দিয়ে তাঁকে দস্তুরমতো উজিরী দোয়াত খেলাত পাঠিয়ে দিলেন। সুজাউদ্দৌলা যদিও জানতেন এখন এসব শুধু নামকাওয়াস্তে, তবু একদিন-না-একদিন তা কাজে লাগতে পারে মনে করে শা

আলমের দেওয়া উজিরী দোয়াত খেলাত মাথা পেতে নিলেন। দিল্লির কি অবস্থা সঠিক না জেনে সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়াটা নবীন বাদশার মনঃপুত হল না। তাছাড়া গত বছরের পরাজয়টা তাঁর মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করছিল, সেটাকে তুলতে না পারলে শান্তি নেই। শা আলম পাটনার দিকেই চললেন।

শা আলম বাংলা-বিহারের চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তিনি বাদশা হয়েছেন। বড় বড় সব জমিদার জাইগিরদারকে ফতোয়া পাঠালেন, তাঁরা যেন নতুন বাদশার বশ্যতা স্বীকার করেন। ফলে জমিদার জাইগিরদাররা হয় সৈন্য নিয়ে এসে নয় সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে শা আলমের দল ভারী করতে লাগলেন। মীর জাফরের ছাড়িয়ে-দেওয়া অনেক সেপাই বাদশাহী ফৌজে ভর্তি হয়ে গেল। যেসব জমাদার হাবিলদারকে মীর জাফর কি মীরন দুর্ব্যবহার করে মুর্শিদাবাদ থেকে তাড়িয়েছিলেন তাঁরাও একে একে শা আলমের কাছে এসে জুটতে লাগলেন।

এবার যিনি শা আলমের সেনাপতি হলেন তিনি মহম্মদ কুলী খাঁর চেয়ে ঢের বেশি কাজের লোক, ঢের বেশি ভালো যোদ্ধা। পাঠান কামগড় খাঁ গয়া জেলার লোক, নুরহাটের জমিদার। গত বছর পাটনায় এসে মীর জাফর সকলের সামনে তাঁকে বেজায় অপমান করে গিয়েছিলেন, সে-কথা কামগড় খাঁ ভুলতে পারেননি। এবার তিনিই আলী গোহরকে প্রচুর উৎসাহ দিয়ে এদেশে ডেকে আনিয়েছিলেন। শাজাদা কর্মনাশা নদী পেরোতেই কামগড় খাঁ তাঁর পাঁচ হাজারী ফৌজ সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। শাজাদার তহবিলে জমার দিককার অঙ্ক একেবারেই শূন্য, তাঁর এবারকার অভিযানের সমস্ত খরচ কামগড় খাঁকে নিজের ঘাড়েই নিতে হল।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নবাব মীর জাফর আলী খাঁয়ের কাছেও সমন এসে গেল। বাদশা শা আলম শানি এত্তেলা পাঠিয়েছেন, নবাব জাফর আলী খাঁ যেন বাদশার দরবারে শিগগিরই হাজির হন। মীর জাফর একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। গতবারে আলী গোহর যখন বঙ্গবিজয়ে এসেছিলেন তখন তিনি শাজাদা ছিলেন, বাদশা হননি। তার উপর বাদশা আলমগীর শানি মন থেকে না হোক মুখে অন্তত তাঁকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং তখনকার কথা অন্য। কিন্তু এখন যিনি এলেন তিনি তো আর কেউ নন স্বয়ং শা আলম শানি বাদশা ঘাজী—তাঁকে অমান্য করা যায় কি করে ?

ঠিক এই সময় ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন, স্বদেশে ফেরবার আগে

নবাব শেষ দেখা দিতে এসেছিলেন। বোধ হয় তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে মীর জাফর বুঝতে পারলেন যে, শা আলম তাঁকে কখনো বাংলার নবাব করে রাখবেন না। বাদশার প্রিয়পাত্র অনেক আমীর-ওমরাহের এই সুবেদারির উপর লোভ। সবার উপর আছে কামগড খাঁব দাবি, সে-দাবি বাদশা কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। তবে ক্লাইভ এ-কথা মীর জাফরকে স্পষ্ট বুঝিয়ে বলেছিলেন কিনা জানিনে যে মীর জাফর বাংলার নবাব না থাকলে ইংরেজদেরও শ্রীবৃদ্ধিতে রীতিমতো ব্যাঘাত ঘটতে পাবে। আর কারো দরবারে তাঁরা অত সহজে কলকে পাবেন বলে তো মনে হয় না। যাই হোক, মীর জাফর শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন ইংরেজদের সহায়ে তিনি বাদশার সঙ্গে লডেই যাবেন—দেখা যাক তাতে কি ফল হয়? লোকে যদিও দিল্লির বাদশাব নামে ভাবে গদগদ, তবু স্বার্থের আঁতে ঘা পডলে নবাব উজিরদের কেউই বাদশার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে কসুর করতেন না।

এই অভিযানে কি করতে হবে-না-হবে মেজর ক্যাইলোডকে সব শিখিয়ে পডিয়ে ক্লাইভ কলকাতায় ফিরে গেলেন। চারদিন পরেই মেজর তিনশো গোরা পল্টন, তিন হাজার দেশী সেপাই আর ছ-টা বড-বড কামান নিয়ে পাটনা রওনা হলেন। মীরন এই অভিযানেব কমাণ্ডার-ইন-চিফ হয়ে পাটনা যাবার জন্যে জিদ ধরলেন। মীর জাফর রাজ্যচালনায তত পোক্ত না হলেও যুদ্ধনীতি একটু-আধটু বুঝতেন। তিনি বেশ জেনেছিলেন যে, এইবার শা আলম যে ফৌজ জডো করেছেন তাকে একেবারে হুট করে ওডানো যাবে না। আর লডাই-এর ব্যাপারে তাঁর গুণধর পুত্রের কেরামতির দৌড তাঁর ভালো করেই জানা থাকার দরুন তিনি বারবার মীরনকে পাটনা যেতে মানা করতে লাগলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মীরন পণ করেছেন, তিনি যাবেনই যাবেন। কিছুতেই তাঁকে রোখা গেল না। তবে এই স্থির হল যে, ইংরেজ ফৌজের উপর তিনি কর্তৃত্ব ফলাতে পারবেন না। তাবা উঠবে-বসবে চলবে-ফিরবে একমাত্র মেজর ক্যাইলোডের হুকুমে। সব তকরার-বচসার যখন মীমাংসা একরকম হয়ে এল তখন গোল বাধাল নবাবী ফৌজ। নবাবের সেপাইরা মাইনের বাকি বকেয়ার টাকা নগদ হাতে হাতে বুঝে না নিয়ে কোথাও নড়বে না বলে বেঁকে বসল। অবশেষে খানিকটা টাকা নগদ হাতে পেয়ে আর বাকি টাকার জন্যে মেজর ক্যাইলোডের আশ্বাস-বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে শেষে চলতে শুরু করল। মীরন পয়দল আর ঘোড়সওয়ারে মিলে পনেরো হাজারী ফৌজের কর্তা হয়ে সঙ্গে চললেন।

কিন্তু সব শেষ করে বেরোতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে শা আলম পাটনা পৌঁছে গিয়ে শহর ঘেরাও করে ফেলেছেন। মেজর ক্যাইলোড রামনারায়ণকে বলে পাঠিয়েছিলেন, রাজা-বাহাদুর যেন ইংরেজ ফৌজ না পৌঁছানো পর্যন্ত ফস্‌ করে যুদ্ধে না নাবেন, কিন্তু সে-কথায় রামনারায়ণ তেমন কান দিলেন না। গত বছরে তিনি শাজাদার সৈন্যসামন্তের কদর বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন, তাইতে তাদের উপর তাঁর মনে মনে বেশ-খানিকটা অবজ্ঞাই ছিল। তাই মুর্শিদাবাদ থেকে রহিম খাঁ যখন তাঁর একদল মোগলাই ঘোড়সওয়ার নিয়ে পাটনায় এসে গেলেন তখন রামনারায়ণকে আর দেখে কে? তিনি মেজর ক্যাইলোড কি মীরনের তোয়াক্কা না রেখে সসৈন্যে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তবে বেশি দূর গেলেন না, নগরের পাঁচিলের গায়েই সেজেগুজে বসে রইলেন। পাটনার ইংরেজ কুঠি আগলাবার জন্যে ক্যাপ্টেন কক্‌রেন ছিলেন। তিনি গোটা সত্তর গোরা, শ-তিনেক তেলেঙ্গী সেপাই আর দুটো কামান নিয়ে রামনারায়ণকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

ক্যাপ্টেন কক্‌রেনের উপর অর্ডার ছিল তিনি যেন সর্বদা রামনারায়ণের কাছাকাছি থাকেন। তাই তিনি রামনারায়ণকে বিশেষ করে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন ইংরেজ ফৌজের ঠিক মাঝখানে থাকেন, তাহলে কক্‌রেনের পল্টন-সেপাই তাঁকে আড়াল করে রাখবে। কিন্তু রামনারায়ণ তা শুনলেন না, তাঁর অভিমানে বাধল। শেষে রামনারায়ণের সেপাইয়ের দল বাড়তে বাড়তে যখন প্রায় হাজার-চল্লিশে দাঁড়াল তখন তিনি যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়েছে বিবেচনা করে শহরের কাছেই বৈকুণ্ঠপুরের গায়ে মসুমপুরের মাঠে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৭৬০) এই প্রান্তরেই এক বড় যুদ্ধ হয়ে গেল। রামনারায়ণ ঘুণাক্ষরে জানতেন না, কামগড় খাঁ সেনাচালনায় কেমন পটু, আর এও জানতেন না যে, শা আলমের এবার যেসব সেপাই জোগাড় হয়েছে তারা আগের দলের চেয়ে ঢের বেশি হুঁশিয়ার। লড়াইয়ের শুরুতেই রামনারায়ণের তিনজন বড় বড় সেনানী তাঁকে ছেড়ে নিজের নিজের সেপাই নিয়ে বাদশার দিকে সরে পড়লেন। যেসব বড় বড় জমিদার রামনারায়ণকে সাহায্য করবেন বলে ভরসা দিয়েছিলেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত তাঁকে খেলিয়ে দেখে বাদশার দলে যোগ দিলেন। দেশের লোকের চরিত্র রামনারায়ণ ভালো করেই জানতেন, তবে কেন যে তিনি আগের থেকে সাবধান হননি, এই আশ্চর্য। তাঁর উচিত ছিল, ইংরেজদের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপচাপ থাকা। কিন্তু দর্প। অতি

দর্পে অত বড় রাবণও নিজে মরেছিলেন আর সোনার লঙ্কাও ছারেখারে দিয়েছিলেন—রামনারায়ণ তো তার কাছে কোন্ ছার।

মসুমপুরের মাঠে রামনারায়ণ এমন হাডভাঙা মার খেলেন যে তা আর কহতব্য নয়। তিনি নিজে তো আষ্টেপৃষ্ঠে জখম হলেন. তাঁর সবচেয়ে যে ভালো দুই সেনাপতি ছিল তাঁরাও শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। শেষে সেপাইরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। তবে লড়ে গেল বটে ইংরেজদের ঐ গোটাকয়েক গোরা পল্টন আর কুঠিয়াল ভলেনটিয়র আর তাদের তেলেঙ্গী সেপাই। শত্রুরা রামনারায়ণকে ঘেরাও করে ফেলেছে দেখে ক্যাপ্টেন কক্‌রেন তাঁর অর্ধেক সৈন্য দল-ছাড়া করে রামনারায়ণের সাহায্যার্থে পাঠালেন। এইটেই হল মারাত্মক-রকমের ভুল। দু-ভাগ হয়ে যেতে প্রত্যেক দলেরই বল কমে এল। ইংরেজ সেপাই-পল্টন রামনারায়ণকে আডাল করে দাঁডাতে তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কক্‌রেন আর তাঁর সব অফিসার, সব গোরা, প্রায় সব সেপাই, যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হাতে কাটা পড়ল, মাত্র পঁচিশজন সেপাই কোনোক্রমে স্বস্থানে ফিরে যেতে পেরেছিল। ইংরেজদের আডাল পেতে রামনারায়ণেব মাহুত তাঁকে হাওদায় তুলে শহরে ঢুকে পডতে পেরেছিল, কিন্তু রামনারায়ণের শরীর তখন ক্ষতবিক্ষত, রক্তে রক্তাক্ত।

শা আলম যদি আর-একটু জোর লডাই চালিয়ে যেতেন তাহলে পাটনা শহর তিনি হেসেখেলে দখল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এমন একটা বিশ্রী স্বভাব ছিল যে, হটহট করে খানিক দূর খুব জোর চলে হঠাৎ ছ্যাকরা গাড়ির বেতো ঘোড়াব মতো এমনি থেমে যেতেন যে তখন একেবারে স্থাণু বনে যেতেন, কোনো নড়নচড়ন থাকত না। তাই তিনি কস্মিনকালেও সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উঠতে পারেননি। রামনারায়ণকে শহরের ভিতর চলে যেতে দেখে শা আলম সেদিনকার মতো লড়াই বন্ধ করিয়ে দিয়ে মৃতদের সৎকার করার হুকুম দিয়ে বসলেন। তারপর যুদ্ধজয়ের উল্লাসে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মস্ত এক শোরগোল লাগিয়ে দিলেন। পাটনা সেবারকার মতো বেঁচে গেল।

রামনারায়ণ শহরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শহর-রক্ষার তদারক করতে লাগলেন, কতকটা ব্যবস্থাও করে ফেললেন। আর গতবারেও যেমন করেছিলেন, এবারও সেইরকম খানিকটা সময় হাতে পাওয়ার দরুন শা আলমকে খেলাতে লাগলেন। লড়াই থামিয়ে উভয়পক্ষই আপস-মীমাংসার কথা চালাচালি

শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহী ফৌজ যুদ্ধের বদলে আশেপাশের জনপদগুলোর উপর লুঠতরাজ চালিয়ে গেল। শা আলমও যেন অনেক কষ্টে একটু ছুটি পেয়েছেন—এই ভাব দেখিয়ে আরাম করতে লেগে গেলেন। পাটনার নটী বাঈজী কসবী হিন্দুস্থানে বিখ্যাত, তাদের নিয়ে বাদশা নাচগানে রঙ্গরসে মত্ত হয়ে উঠলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে রোজ দরবারও বসতে লাগল, খেতাব খেলাত পদবী বিতরণও চলল। এই রকম যেতে যেতে একদিন খবর এল, বাংলার ছোট নবাব মীর মহম্মদ সাদেক আলী খাঁ বাহাদুর অর্থাৎ মীরন সাহেব ইংরেজ ফৌজ সঙ্গে নিয়ে পাটনায় ঢুকছেন। খবর শুনে কামগড় খাঁ চাঙ্গা হয়ে উঠে আমোদপ্রমোদ থেকে বাদশাকে টেনে তুলে শহরের দক্ষিণ-পূর্বে শেরপুরের মাঠে উপস্থিত হলেন। এইখানে বাদশাহী ফৌজ আর নবাবী ফৌজের মধ্যে একদফা বলপরীক্ষা হবে বলে স্থির হল।

মেজর ক্যাইলোড পাটনায় ঢুকেই তখনি তখনি লড়াই শুরু করে দেবার মতলব ভেঁজে রেখেছিলেন, কারণ অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মীরন কিছুতেই তা করতে দিলেন না। তাঁর গনৎকাররা গুনে বলেছেন, সেদিনটা মোটেই শুভদিন নয়, পাঁজিতে তার পরের দিন ভালো বলে বলছে। যাই হোক, সেই রাত্রেই মেজর ক্যাইলোড শেরপুরের মাঠের থেকে মাইলখানেক দূরে দুটো গ্রামের মাঝখানে লাইন বেঁধে সৈন্য সাজিয়ে ফেললেন। মীরনকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন ইংরেজদের লাইনের পিছনেই ঐ একইভাবে তাঁর সৈন্য সাজান। কিন্তু মীরনের মনে মনে ছিল, এই যুদ্ধে তিনি নিজেই নাম কিনবেন, ইংরেজদের কিনতে দেবেন না। তিনি নিজের লোকজন নিয়ে ইংরেজদের খানিকটা তফাতে গিয়েই দাঁড়ালেন। কিন্তু যেখানে তাঁর সেপাইদের জড়ো করলেন সে-জায়গাটার মুখটা একটা সরু ফালির মতো, লম্বায় দুশো গজ হবে কিনা সন্দেহ। সেখানে মীরনের ঐ বিশাল বাহিনীর হাত-পা ছোঁড়ারও স্থান হল না। সবাই মিলে এক জায়গায় তালগোল পাকিয়ে একরকম জড়ভরত হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

সকাল থেকেই প্রচণ্ড লড়াই। কামগড় খাঁ সবাইকে ছেড়ে ইংরেজদের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। প্রথম চোটটা সামলাতে না পেরে ইংরেজরা জায়গা ছেড়ে দিয়ে একটু ধারে সরে গেল। তারপর অনবরত এমন গোলা ছুঁড়তে লাগল যে কার সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায়? কামগড় খাঁ হটে গিয়ে সামনে থেকে একপাশে গিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে কামগড় খাঁয়ের দুজন সেনাধ্যক্ষ একজোটে নবাবী ফৌজের উপর চড়াও হয়ে তাদের বিপর্যস্ত করে

তুললেন, মরীয়া হয়ে এমন ভীষণ মারামারি-কাটাকাটি লাগিয়ে দিলেন যে নবাবী ফৌজ তার দাপট সহ্য করতে না পেরে ক্রমাগত পিছু হটতে হটতে অনেক দূর পিছিয়ে গেল। মীরন তাদের সঙ্গ নিতে ভুললেন না।

নবাবী ফৌজের পালানোর রকম দেখে ওই দুই সেনাধ্যক্ষ আরো জোর লড়াইয়ে মাতলেন। তীর ছুঁড়ে মীরনেরই একটা দাঁত ভেঙে দিলেন। আর একটা তীর মীরনের ঘাড়ে গিয়ে বিঁধল। তাতেই মীরন হাওদায় উপর কাত হয়ে পড়ে উঃ আঃ ডাক ছাড়তে লাগলেন। নবাবী সেপাইদের মধ্যে যারা তখনো পালায়নি তাদের সঙ্গে বাদশাহী ফৌজের তুমুল হাতাহাতি বেধে গেল—তলোয়ার বর্শা বল্লম তীর—কিছুই বাদ গেল না। নবাবের পক্ষের লোকেরা অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরল। মেজর ক্যাইলোড যেই দেখলেন নবাবী ফৌজ পালাতে লেগেছে অমনি তিনি খানিক সরে গিয়ে তাদের আড়াল করে দাঁড়ালেন, লাইন বেঁধে শত্রুপক্ষের উপর এমন তোপ ছুঁড়তে লাগলেন যে এক-এক দফা গোলায় একশো জন করে কুপোকাত। সেই দুই বীরপুরুষের একজন ইংরেজদের গুলিতে ধরাশায়ী হলেন, আর-একজনকে মীরনের এক সেনানী কেটে দুখান করে ফেললেন।

ইংরেজদের প্রাণপণ লড়ে যেতে দেখে নবাবী ফৌজের মনে একটু বল এল। পলাতক সৈন্যেরা একে একে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে লাগল। মীরনের তাঁবে অনেক ঘোড়সওয়ার ছিল। তারা মেজর-সাহেবের ইঙ্গিত পেয়ে এইবার বাদশাহী সেনার উপর দমকা হাওয়ার মতো চার্জ করে গেল। কামগড় খাঁ সসৈন্যে এগিয়ে আসছিলেন, এক নজরে অবস্থাটা লক্ষ্য করে তিনি যেখানে ছিলেন ঠিক সেইখানেই রয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ রাইট আবাউট টার্ন—সব্বাইকে নিয়ে তিনি ক্যাম্পের দিকে ছুটলেন। যুদ্ধজয়ের যে আর-কোনো আশা নেই সেটা তাঁর বেশ মালুম হয়ে গিয়েছিল। ক্যাইলোডের খুব ইচ্ছা ছিল কামগড় খাঁর পিছন পিছন তাড়া করে যান, কিন্তু মীরন তাতে বাদ সাধলেন। তিনি বলে পাঠালেন, যুদ্ধে তিনি বিষম ঘায়েল হয়েছেন, সেরে না উঠে তিনি আর একপাও নড়ছেন না। মেজর-সাহেব তখন বাদশাহী সৈন্যদের ধাওয়া করবার জন্যে একদল ঘোড়সওয়ার সাহায্য চাইলেন, মীরন তাও দিলেন না। সুতরাং কামগড় খাঁ শা আলমকে বগলদাবা করে নিয়ে সসৈন্যে নিরাপদে পাটনার দশ মাইল দক্ষিণে বিহারশরিফে গিয়ে উঠলেন। নবাবী ফৌজ জিতে গিয়েও জয়ের পুরো ফল হাতাতে পারল না।

মীরন পাটনা শহরে ঢুকেই শরীর সারাবার নাম করে ফূর্তির ফোয়ারা ছেড়ে

দিলেন। এসব ব্যাপারে তিনি নবাব মীর জাফরের সুযোগ্য পুত্র, বাপের থেকে একরত্তিও কম যান না। মেজর ক্যাইলোড অগত্যা তাঁর লোকজন নিয়ে গঙ্গার তীরে তাঁবু ফেললেন। সময় নষ্ট না করে কামান-বন্দুক কামানগাড়ি বারুদের গাড়ি মেরামতের কাজে লেগে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রসদ সংগ্রহের কাজও পুরোদমে চলতে লাগল।

॥ বারো ॥

বিহারশরিফে ঠাণ্ডা হয়ে বসে কামগড় খাঁ ভেবে ভেবে মাথা থেকে আচ্ছা এক মজার প্ল্যান বের করে ফেললেন। নবাব মীর জাফর তো এখন বলতে গেলে সহায়হীন। তাঁর ফৌজের বেশির ভাগই তো এখন পাটনায়। তাঁর রক্ষক ইংরেজদেরও পল্টন-সেপাই সেখানে। মুর্শিদাবাদের পাহারায় আর আছে কে? এই অবস্থায় গা-ঢাকা দিয়ে আচমকা নবাবের রাজধানীতে গিয়ে পড়লে, ঠেকায় কে? শা আলমের চরিত্র চিরকালই একটু সৃষ্টিছাড়া-রকমের। বাদশা হয়েও তার কোনো বদল হয়নি। একটা অদ্ভুত কিছু করে বসতে পারলে তিনি মহা খুশি। কামগড় খাঁয়ের প্রস্তাব শুনে তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।

কামগড় খাঁয়ের প্ল্যানটা বলতে গেলে একেবারে একটা দিগ্‌গজ পরিকল্পনা। এর আগে এরকম প্ল্যান কেউ কখনো ঠাওরায়নি। বাক্স-পেঁটরা কামান-বারুদ ভারী ভারী সাজ-সরঞ্জাম সব এক জায়গায় মজুত রেখে, শুধু জনকতক হাল্কা হাতিয়ারবন্দ হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ার সঙ্গে করে কামগড় খাঁ শা আলমকে নিয়ে এমন রাস্তায় চললেন, যে-রাস্তা সচরাচর লোক চলাচলের পথ নয়। পথ বলতে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পায়ে-চলা সরু একফালি রাস্তা, তার উপর দিয়ে দুজন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি চলতে পারে না, একজনের পিছনে আর-একজনকে পিছু নিয়ে পার হতে হয়। কামগড় খাঁ এই পথ ঠেলেই দক্ষিণ-পূর্বে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

মেজর ক্যাইরোড যখন অনেক কষ্টে মীরনকে তাঁর আমোদপ্রমোদের জাল ছিঁড়ে বের করে এনে আবার মার্চ করাতে সক্ষম হলেন তখন বেশ-খানিকটা দেরি হয়ে গেছে। তার উপর ছোট নবাবের কোনোই তাড়া নেই, তিনি ধীরে-সুস্থে হেলতে-দুলতে চলেছেন। ক্যাইলোড তাঁকে ছেড়ে এগোতেও পারেন না, সর্বদা তাঁর কাছাকাছি থাকতে হয়। অবশেষে সবাই মিলে যখন বিহারশরিফে পৌছলেন তখন পাখি উড়ে গেছে। মেজর ক্যাইলোড যে-পথ দিয়ে শা আলম গেছেন, ঐ অজানা-অচেনা পথ দিয়ে তাঁকে ধাওয়া করে যেতে সাহস পেয়ে উঠলেন না। তিনি সেই পুরনো মামুলী বড় রাস্তা

দিয়েই চললেন—অর্থাৎ গঙ্গার তীরে তীরে, রাজমহল তেলিয়াগড়ি সকরিগলি বেয়ে।

বাংলার বড় বড় জমিদাররা দিল্লির বাদশা তাঁদের দেশে আসছেন শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বীরভূমের মুসলমান জমিদার, কামগড় খাঁর আত্মীয়—তিনি তো বটেনই, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ, বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ—এঁরাও বাদশাকে স্বাগতম্ জানিয়ে পাঠালেন। উড়িষ্যার মারাঠী সর্দার শিবভট্ট লুঠতরাজের সুযোগ উপস্থিত বুঝে তার দলবল নিয়ে কটক ছেড়ে মেদনিপুর, মেদনিপুর ছেড়ে বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর ছেড়ে বর্ধমান পযন্ত এগিয়ে গেলেন। সকলকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন—তিনি বাদশার অনুগত, ষোলো আনাই তাঁর দিকে।

নবাব মীর জাফর এই সময় রাজমহলে ছিলেন। পুর্নিয়ার নতুন ফৌজদার খাদেম হোসেন থেকে থেকেই বড গোলমাল লাগাচ্ছেন, তাকে একটু টিট না করলেই নয়। বাদশা শা আলম রাজধানী মুর্শিদাবাদ অধিকার করতে ছুটেছেন—একথা চরের মুখে শুনে তিনিও একদৌড়ে স্বস্থানে ফিরে গেলেন। কলকাতার সাহেব-মহলেও এই নিয়ে বেশ হৈচৈ পড়ে গেল। ক্লাইভ উপস্থিত নেই—জমিদারের আর বড বড সামন্ত প্রজাদের কেউ-বা ঠাণ্ডা করে আর কেউ-বা তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দলে টানতে পারে? সে-রকম মাস্টার ডিপ্লোম্যাট ইংরেজদের এখন কোথায়? আর কারই বা এমন কপালজোর যে যুদ্ধ না করেই যুদ্ধ জিতে যাবে? একটিনি গভর্নর জেফানায়া হলওয়েল বসে বসে অন্ধকূপ-হত্যার মতো রোম্যান্টিক কাব্য-কাহিনী রচনা করতে পাবেন, লোকের পিছনে লাগতে পাবেন, এমন কি ছোটখাটো একটা চক্রান্তও খাড়া করে উঠতে পারেন, কিন্তু আর কিছু করা তো তাঁর সাধ্যের বাইরে। গোড়াতেই তিনি এক ভুল করে বসলেন। কলকাতার অনেক দেশী বাসিন্দাকে তিনি শহর থেকে বের করে দিলেন—ভয়, পাছে তারা কোন্ ফাঁকে শত্রুদের শহরের ভিতর ডেকে আনে। দুর্লভরাম কাউন্সিলরদের সেলামবাজি করে তাঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, তাঁর তো হঠাৎ কিছু আর করা যায় না। হলওয়েল তবুও তার উপর কড়া পাহারা বসিয়ে দিলেন। সন্দেহ, মারাঠাদের সঙ্গে তাঁর বোধ হয় সড আছে।

যাই হোক, ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং তখন ইংরেজদের দিকে, সুতরাং অন্যে বাম হয়ে আর করবে কি? মারাঠারা কি ভেবে আর বেশি এগোলো না। হুগলি কলকাতা যেতে যেতে রয়ে গেল। নবাব মীর জাফরও হলওয়েলের কাছ

থেকে ইংবেজ পল্টন চেয়ে পাঠালেন, তাবা না এলে তিনি কোথাও এক-পা নডতে পাববেন না—এমনি তাঁব দুর্দশা। এইসব ব্যাপাবে মীব জাফরের দূত হযে তাঁব জামাই মীব কাশিম অনববত কলকাতায় আনাগোনা কবতে লাগলেন। হলওয়েলেব সঙ্গে তাঁব নানা বকম শলা-পবামর্শ চলল। এব ফলে মীব জাফবেব শেষ পর্যন্ত যে কি সর্বনাশ ঘটল, তাব কেচ্ছা এখনই নয়, খানিক পবেই শোনানো যাচ্ছে।

আপাতত কতক গোবা পল্টন এসে পডায় মীব জাফব তাদেব সঙ্গে নিয়ে কাটোয়ায উঠে, সেখানেই আস্তানা গাডলেন। মীব জাফব আলীবর্দী খাঁর আমলেব অভিজ্ঞতা থেকে বেশ জানেন, মাবাঠাবা পাবতপক্ষে সামনাসামনি কখনো লডাই কববে না। তাবা পাশ থেকে কি পিছন থেকে বেমক্কা ঘাডে এসে পডে সব ছাবখাব কবে দেবে। সুতবাং বর্ধমানে তাদেব তেডে যাওযাব চেয়ে কাটোয়ায বসে ঘাঁটি আগলানো ঢেব ভালো, কাবণ কাটোয়া বেয়েই তো তাদেব মুর্শিদাবাদ ঢোকাব পথ। তিনি মীব কাশিমকেও কাটোয়ায় ডেকে পাঠালেন। মীব জাফব জানতেন যে, তাঁব জামাতাব অন্য আব যে-কোনো বিদ্যা থাক না কেন, যুদ্ধবিদ্যা তাঁব মোটেই আযত্তে ছিল না। মীব কাশিম কাটোয়ায এলেন বটে, কিন্তু বেশিদিন সেখানে বইলেন না। ইংবেজদেব তাডায় মীব জাফব তাঁকে আবাব বর্ধমানে ফেবত পাঠাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু আপাতত তাতে কোনো লাভ হল না, কাবণ শোনা গেল, বাদশা আব কামগড খাঁ কোথাও একটুও না বেঁকে বীবভূমেব শালজঙ্গল ঠেলে উপব দিকে উঠছেন, লক্ষ্য মুর্শিদাবাদ।

মীব জাফব কি যে কববেন তা ঠিক কবে উঠতে পাবলেন না। বুদ্ধিশুদ্ধি তাব যে খুব বেশি ছিল এমন কথা কেউ কোথাও লিখে গেছেন বলে তো দেখা যায না। তিনি একবাব ভাবেন—যাই, চলে যাই বাজমহলে, সেখানে মীবন আব মেজব ক্যাইলোডকে ধবে তাঁদেব মুর্শিদাবাদে টেনে এনে ফেলা যাক। আবার ভাবেন—বর্ধমানে গিয়ে মীব কাশিমেব সঙ্গে যোগ দেওযাই ভালো। না, তাও না। সবচেয়ে বোধ হয় ঠিক কাজ হবে, মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে শহববক্ষাব চেষ্টা কবা। গয়ংগচ্ছ কবতে কবতে শেষ পর্যন্ত কিছু না করে, বাদশা শা আলমকে ঠাণ্ডা বাখবার জন্যে এক পত্র লিখে জানালেন—দীন মীর মহম্মদ জাফব আলী খাঁ শাহেনশা বাদশা শা আলমের গোলামের গোলাম। মহামান্য বাদশার বিরুদ্ধে যাবার একটুকুও ইচ্ছা তাঁব নেই। যত কু-এর গোড়া ঐ ইংরেজ হতভাগারা—ওরাই তো যত সব জঞ্জাল

বাধিয়েছে। মীর জাফর সঙ্গে সঙ্গে শা আলমের নামে টাকা ছাপবার জন্যে মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে অর্ডার পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাকে চিঠি লেখার কথাটা ইংরেজদের কাছ থেকে গোপন রেখে তাদেরই পেড়াপিড়িতে মীর জাফর অবশেষে কাটোয়া থেকে বের হয়ে বর্ধমান শহর ছেড়ে কুড়ি মাইল দূরে মঙ্গলকোটে উঠে গেলেন। মীর কাশিম আর ইংরেজদের সঙ্গে মিলে সেখানেই বসে দেখতে লাগলেন, কি হয় না হয়।

ওদিকে শা আলম আর তাঁর সেনাপতি কামগড় খাঁয়ের কি যে বুদ্ধিবিভ্রম ঘটল, তা তাঁরাই জানেন। অমন মোক্ষম প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে, তাঁরা বীরভূমের শালজঙ্গল ভেদ করে উত্তরমুখো না গিয়ে, সেখানকার রাজধানী নগব (এখনকার রাজনগর) বাঁয়ে রেখে, ডাইনে বেঁকে উখড়ো হয়ে মানকরে গিয়ে পৌছলেন। ইচ্ছা, এইখানে দামোদরনদ পেরিয়ে দক্ষিণে বিষ্ণুপুরে গিয়ে মারাঠাদের সঙ্গ নেবেন। কিন্তু মানকরে পৌছতেই জানতে পারলেন, মেজর ক্যাইলোড আর মীরন তাঁদের খোঁজে পিছন পিছন তাড়া করে বর্ধমান এসে উপস্থিত। আর কথাটি না কয়ে বাদশা আর তাঁর সেনাপতি ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দামোদর পেরিয়ে বিষ্ণুপুর ছুটলেন। মেজর ক্যাইলোড এসে দেখলেন, সেখানে কেবল পড়ে আছে ভস্মস্তূপ। তিনি মঙ্গলকোট গিয়ে নবাবকে দেখা দিয়ে তাঁকে জপাতে লাগলেন, বাদশাকে তাড়া করে যাওয়ার এই উপযুক্ত সময়—কিন্তু নবাবকে এতে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। বাদশা আবার হাতছাড়া হলেন।

শা আলম স্বচ্ছন্দেই মুর্শিদাবাদ দখল করে বঙ্গবিজয় করতে পারতেন। সেখানে তাঁকে বাধা দেবার মতো একজন কেউও ছিল না। কিন্তু তা তো আর হল না। তিনি সকলের কাছ থেকে মুখের ভরসা যতটা পেয়েছিলেন, কাজের বেলায় তার সিকির সিকিও সাহায্য পেলেন না। তাতেই একেবারে দমে গিয়ে তিনি যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেই পথ দিয়েই আবার পাটনা ফিরে চললেন। বাদশার পাটনা ফিরে যাবার কথাটা কিন্তু চাপা রইল, মীর জাফর বা ইংরেজরা কেউই তখন তা টের পাননি। যখন পেলেন তখন শা আলম প্রায় পাটনা পৌছে গেছেন। মেজর ক্যাইলোড তখনই পাটনার দিকে যাবার উদ্যোগ করতে চাইলেন, কিন্তু মীর জাফর তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। মুর্শিদাবাদেই অনেক কাজ পড়ে আছে বলে ধরে রাখলেন। মেজর ক্যাইলোড পাটনার অবস্থা জানতেন। সেখানে এমন যোদ্ধা কেউ নেই যিনি শা আলমকে কিছুদিন আটকে রাখতে পারেন। তাই নিজে ছাড়া না

পাওয়াতে বুদ্ধি-বিবেচনা না হারিয়ে তিনি ক্যাপ্টেন নক্সকে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন।

অবশ্য জরুরী কাজ একটা মুর্শিদাবাদে ছিল বটে। কিছুদিন ধরেই পুর্নিয়ার ফৌজদার খাদেম হোসেন, যিনি একদিন মামু মামু বলে মীর জাফরের কাছ থেকে সেখানকার ফৌজদারিটা আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি, বেশ বেয়াড়ামি শুরু করেছিলেন। মীরনের সঙ্গেও তাঁর যখন-তখন খিটিমিটি চলছিল। শেষে একদিন খাদেম হোসেন সোজাসুজি বিদ্রোহী হয়ে বসলেন। পুর্নিয়ার প্রজাদের মারপিট করে অনেক ধনরত্ন, প্রচুর টাকাকড়ি সংগ্রহ করে তিনি বাদশা শা আলমের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে পুর্নিয়া থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মীর জাফর ক্যাইলোডকে দেখতে বললেন যাতে খাদেম হোসেন গিয়ে কিছুতেই না বাদশার সঙ্গে জুটতে পারেন। ক্যাইলোড তথাস্তু বলে পল্টন নিয়ে তাকে ধরতে বেরোলেন। রাজমহল পৌঁছতে দেখলেন, ছোট নবাব মীরনও সেখানে এসে গেছেন। নবাবের মুখের গ্রাস অন্যে কেড়ে নেবে, সেটা তাঁর সহ্য হয় কি করে? গঙ্গার ওপার দিয়ে খাদেম হোসেন চলেছেন, এপার দিয়ে মীরন, আর মাঝখান দিয়ে গঙ্গার উপর নৌকো বোঝাই হয়ে চলেছে ইংরেজ ফৌজ মেজর ক্যাইলোডের অধীনে। মীরন-ক্যাইলোড আর খাদেম হোসেন—দু-পক্ষই দু-পক্ষের উপর চোখ রেখে চলেছেন। উভয়েরই গন্তব্যস্থল পাটনা।

ওদিকে শা আলম পাটনা পৌঁছেই শহর ঘিরে জোর হানা দিলেন। ছত্রপুর থেকে আবার জাঁ ল এসে গেছেন, তিনিও আস্তিন গুটিয়ে লেগে পড়লেন। ল-এর গোলার চোটে শহরের পুবের দেওয়াল খসে পড়ল, তিনি পশ্চিম দেওয়ালের উপর কামান দাগতে শুরু করলেন। বাদশাহী ফৌজ পুবের সেই ভাঙা দেওয়াল বেয়ে পিলপিল করে ছাতে উঠে পড়তে লাগল। আর বোধ হয় শহর রক্ষা করা গেল না। কেল্লার মধ্যে বসে রামনারায়ণের দল ইষ্টনাম জপতে বসে গেল। এমন সময় দেখা গেল দূরে ধুলোয় ধুলোয় যেন আঁধি লেগে গেছে, কারা যেন মিলিটারি কায়দায় কুইক্ মার্চ করে পাটনার দিকে এগিয়ে আসছে। শহরের লোকেরা ভেবে নিল, ঐ বুঝি খাদেম হোসেন বাদশার সঙ্গে মিলতে আসছেন। শহরময় কান্নাকাটি পড়ে গেল। পাটনা কুঠি থেকে যে কজন পল্টন-সেপাই আর কুঠিয়াল-ভলেনটিয়র এসেছিল তারাই কেবল মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগল।

ক্রমশ সেই ধুলোর ঘূর্ণিটা কাছে আসতে লোকেরা কেল্লার ছাতে চড়ে

দেখতে পেল, এ তো খাদেম হোসেন নয়। এ তো অন্য আর কেউ নয়, এ যে ইংরেজদেরই সেপাই-পল্টন—সেই লাল টকটকে কোর্তাকুর্তি গায়ে। ক্যাপ্টেন নক্স অসাধ্যসাধন করেছেন। বর্ধমান থেকে পাটনা প্রায় তিনশো মাইল। এই দুর্জয় গরমে তিনি অতটা পথ মাত্র তেরো দিনে চলে এসেছেন। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য জ্বলছে, চারদিকে আগুনের হলকা ছুটছে, তারি মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ফৌজ মার্চ করে এগিয়ে চলেছে। তাদের উৎসাহ বাড়াবার জন্যে ক্যাপ্টেন নক্স সর্বাগ্রে নিজে ঘোড়ায় না চেপে পায়ে হেঁটে হেঁটে সারা পথ চলে এসেছেন। দক্ষিণ দিকে কোনো শত্রু ছিল না, সেই দিক দিয়ে ইংরেজ ফৌজ শহরে ঢুকল। ব্যাণ্ড বাজিয়ে তাদের শহরে ঢুকতে দেখে শহরবাসীদের মনে যে কিরকম আনন্দ-সঞ্চার হয়েছিল তার এক চমৎকার বর্ণনা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর সিয়র-উল মুতাখ্‌খরীন গ্রন্থে দিয়ে গেছেন। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রামনারায়ণ কেমন আছেন দেখতে এসেছিলেন। বিবরণ শেষ করে তিনি বলছেন—শহরবাসী সবাই একবাক্যে বলাবলি করতে লাগল, আর ভয় নেই, ইংরেজ যখন এসে গিয়েছে তখন এ-যাত্রা বেঁচে যাওয়া গেল। আর শত্রুপক্ষ কিছুই করতে পারবে না—পাঁচিল বেয়ে ছাতে উঠেও না, ঘন ঘন কামান দেগেও না, আর টপাটপ গুলি ছুঁড়েও না।

সেদিন রাত্রে চরের মুখে সব খবর নিয়ে পরদিন ঠিক দুপুরবেলা ক্যাপ্টেন নক্স কামগড় খাঁর ক্যাম্পে হানা দিয়ে বসলেন। তখন বাদশাহী সৈন্যদের কেউ রুটি পাকাচ্ছে, কেউ খেয়ে-দেয়ে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তারি মধ্যে ইংরেজদের গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে তারা প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেও পারল না। যা ছিল সবই সেখানে ফেলে রেখে হামাগুড়ি দিতে দিতে অবশেষে ভোঁ দৌড়। কামগড় খাঁও জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে স্বদেশের দিকে ফিরে চললেন। সেনাপতি চলে গেছেন শুনে বাদশাও শহর ঘেরাও তুলে দিয়ে পাটনা ছেড়ে বানীসরাইয়ে সরে গেলেন। জাঁ ল-ও শা আলমের সঙ্গে চললেন।

কামগড় খাঁকে ভাগিয়ে শহরে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন নক্স তাঁর উপরওয়ালা মেজর ক্যাইলোডের কাছ থেকে এক জরুরী চিঠি পেলেন যে, তিনি আর ছোট নবাব মীরন দুজনে মিলে খাদেম হোসেনের ঠিক পিছন পিছন আসছেন, কিন্তু খাদেম হোসেন খানিকটা আগে বের হয়ে পড়ায় তাঁদের ছাড়িয়ে খানিক দূর এগিয়ে গেছেন। এখন ক্যাপ্টেন যদি কোনোক্রমে তাঁর এগোনো বন্ধ করতে

পাবেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে তাঁকে মিলতে দেওয়াটা যে কোনো কাজের কথা হবে না, সেইটেই হল আসল কথা। নক্সকে আর-কিছু বলতে হল না, এসব বিষয়ে তাঁর প্রচুর উৎসাহ। তিনি আদাজল খেয়ে লেগে পড়লেন। সেই রাত্রেই গঙ্গা পেরিয়ে তিনি ওপারের হাজিপুরে গিয়ে উঠলেন। রকম-সকম দেখে পাটনার সবাই একেবারে অবাক হয়ে গেল। এই ছোকরা ক্যাপ্টেন করবে কি? খাদেম হোসেনের দশ হাজার পয়দল সেপাই, ছ-হাজার ঘোড়সওয়ার, আর তিরিশটে কামান। তার সঙ্গে ঐ একরত্তি ইংরেজ ফৌজ লড়বে? এই দারুণ গ্রীষ্মে ছোকরার সত্যিই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? রামনারায়ণের সেপাইদের একজনও কেউ এই পাগলামি কাণ্ডে মাথা গলাতে রাজি হল না। কেবল সিতাব রায় তাঁর ঘোড়সওয়ারের দল নিয়ে ক্যাপ্টেন নক্সের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাতে নকসের খানিক সুবিধা হল, কারণ ইংরেজদের না আছে ঘোড়া, না আছে তার সওয়ার।

সারা রাত নিঃশব্দে মার্চ করতে করতে নকস আর সিতাব রায় খাদেম হোসেনের ছাউনির দশ মাইল পিছনে গিয়ে পড়লেন। নকস ঠিক করে রেখেছিলেন. আকাশ ফরসা হবার আগেই তিনি খাদেম হোসেনের ক্যাম্পে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। রাত্রের যুদ্ধে দেশী সেপাইরা বড়-একটা সুবিধা করে উঠতে পারে না বলে তারা পারতপক্ষে রাত্রে লড়াই করতে চায় না। নকস তাঁর বাক্স-প্যাটরা ইত্যাদি সব এক জায়গায় করে পাহারায় অল্প কিছু সেপাই রেখে, বাকি ফৌজ আর সিতাব রায়কে সঙ্গে নিয়ে খাদেম হোসেনের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু খানিক দূর চলার পর বুঝতে পারলেন, অন্ধকারে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছেন। এদিক-ওদিক খানিক ঘুরেঘারে তাঁরা যখন নিজেদের স্থানে ফিরে এলেন তখন সবে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

পল্টন সেপাইরা সারা রাত ঘুরপাক খেয়ে শ্রান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, এমন সময় দূরে খাদেম হোসেনের ফৌজকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঘুমটুম সব মাথায় চড়ল, চারদিকে শুধু সাজ-সাজ রব। দেখতে দেখতে খাদেম হোসেনের সেপাইরা ইংরেজদের ঐ ছটাকে ফৌজকে ঘেরাও করে ফেলল। তারপর ছ ঘণ্টা ধরে সে কি তুমুল লড়াই! কিন্তু বিস্তর গোলাগুলি ছুঁড়ে, ঘোড়সওয়ার লাগিয়ে বার বার তাড়া করিয়েও ইংরেজদের একটুও হটানো গেল না। নক্স আর সিতাব রায় সমানে লড়ে গেলেন। খাদেম হোসেন বুঝলেন, এরকম চললে তিনি কিছুতেই যুদ্ধজয় করতে পারবেন না, শুধু শুধু কেবল বলক্ষয়ই করবেন। এরই মধ্যে তাঁর দিকের প্রায় পাঁচশো

লোক মরেছে, ইংরেজদের দিকে মাত্র জন পনেরো। বাদশার সঙ্গে মেলবার মনোগত বাসনা খাদেম হোসেনের মনেই রয়ে গেল, তিনি লড়াই ছেড়ে উত্তরমুখো রওনা দিলেন। পাটনার সকলে ধরেই নিয়েছিল, ক্যাপ্টেন নক্স আর সিতাব রায়কে আর পাটনায় ফিরতে হবে না; যুদ্ধক্ষেত্রেই মাটি নিতে হবে। তাই বিকেলের দিকে তাঁদের নদী পেরিয়ে শহরের দিকে আসতে দেখে তাঁদের দেখবার জন্যে চারদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল. সবাই মিলে গলা ছেড়ে তাঁদের জয়জয়কার করতে লাগল।

ওদিকে মেজর ক্যাইলোড আর মীরন খাদেম হোসেনকে ধরবার জন্যে সমানে তাঁর পিছন পিছন মার্চ করে চলেছেন। শেষে গণ্ডক নদীর কাছে এসে তাঁকে প্রায় ধরে ফেললেন। খাদেম হোসেনের মালপত্তর লটবহর মোটঘাট অগুন্তি, তাই নিয়ে তাঁর তাড়াতাড়ি নডাচডা শক্ত, গদাইলশকরী চালে ঢিমেতালে চলতে হয়। ইংরেজ ফৌজ তাঁকে ধর-ধর দেখে তিনি খুব একচোট গোলাগুলি চালালেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ করার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। নক্সের সেই ক্ষুদে ফৌজের সঙ্গে দু-দণ্ড লড়েই ইংরেজদের সঙ্গে আবার হাতাহাতি করে গায়ের জোর পরখ করার শখ তাঁর উবে গেছে। খাদেম হোসেন তার মালপত্তর সব ছেটে ফেলে শুধু দামী দামী ধনরত্ন সব উটের পিঠে বোঝাই করে নদী পার হয়ে উত্তরে নেপাল-তেরাইয়ের দিকে টেনে দৌড় মারলেন। অত ধনরত্ন সব অমনি অমনি হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে ক্যাইলোড তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করলেন, কিন্তু তখন কি আর ধরা যায়? দেখতে দেখতে খাদেম হোসেন হাওয়া হয়ে গেলেন। মীরন দূরে দাঁড়িয়ে হাত-পা গুটিয়ে মজা দেখতে লাগলেন। ইংরেজরা লড়াই করে মরুক, জয় হলে তিনি তার ফলভোগ বারো আনা ছেড়ে ষোলো আনা করবেন, কিন্তু তার জন্যে তিনি কুটোটি পর্যন্ত নাড়বেন না—এই ছিল মীরনের বলিহারি বুদ্ধি! কিন্তু ছালাভরা মোহর, সিন্দুক-বোঝাই মণি-মাণিক্য একটুর জন্যে হাত ফসকে গেল। মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে মাথা নিচু করে ক্যাইলোড আস্তে আস্তে তাঁর ক্যাম্পে ফিরে এলেন।

২রা জুলাই ১৭৬০। ঘোর বর্ষা নেমেছে! সেই সঙ্গে যেমনি ঝোড়ো হাওয়া আর তেমনি মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত। ছোট নবাব মীরন লম্বা-চওড়া এক প্রকাণ্ড তাঁবুতে ছিলেন। ঝড়ে সেটা টেঁকে না দেখে তিনি ছোট একটা তাঁবুতে—যাকে চলতি কথায় লোকে তখন দিলিরখানি পল বলত তাইতে—শুতে গেলেন। এই তাঁবুগুলো বেশ নিচু আর বেশ শক্ত করে খুঁটিতে বাঁধা,

হাওয়ায় সহজে হেলে দোলে না। মীরন আরাম করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি ছিল সে বিদায় পেয়েছে। চাকরে পা টিপে দিচ্ছে, আর মোসাহেবে মজাদার গল্প ছেড়ে ছোট নবাবকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে—এমন সময় চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের আলোয় চারদিকের ঘোর অন্ধকার দিনের মতো উজলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় কড়াৎ—আর পড়বি তো পড় বাজ পড়ল মীরনের ঠিক মাথার উপর। খানিক পরে ঝড়বৃষ্টি একটু নরম পড়তে অনুচরেরা ছোট নবাবের খোঁজ নিতে এসে তাঁর তাঁবুতে ঢুকে দেখে, তিন-তিনটে লোকই নিশ্চল দেহে লম্বা হয়ে পড়ে আছে, কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই।

যাঁরা বিজ্ঞ ব্যক্তি, কার্যকারণের অমোঘ বিধান সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান গভীর, তাঁরা অবশ্য অন্য কথা বলবেন, কিন্তু যাঁরা শাপ-অভিশাপে বিশ্বাস করেন তারা বলেন, ঘসেটি আর আমিনা বেগমের অভিসম্পাতেই নাকি এই কাণ্ডটা ঘটল। নবাব আলীবর্দী খাঁর এই দুই মেয়েকে মীরন বন্দী করে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এইবার পাটনা-অভিযানে বেরোবার আগে ঢাকার ডেপুটি গভর্নরকে হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি ঐ দুই ভগ্নীকে একসঙ্গে কোতল করে যেন কাজ শেষ করা হয়। অর্ডার পেয়ে গভর্নর-সাহেব কাজে ইস্তফা দিলেন। তখন মীরন ছল করে বলে পাঠালেন, বেগমদের মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তিনি যে লোক পাঠাচ্ছেন, তারই হাতে যেন তাঁদের জিম্মা করে দেওয়া হয়। মীরনের অনুচর এসে বন্ধুবান্ধবহীন অসহায় ঐ দুই নারীকে নৌকায় চড়িয়ে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। তাঁদের তীরে নামিয়ে দিয়ে উজু করে নিতে নির্দেশ দিলে। বেগমরা বুঝলেন, তাঁদের অনন্তযাত্রার সময় এসে গেছে। বড়ী বেগম ঘসেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমিনা বেগম (সিরাজউদ্দৌলার মা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কাঁদ কেন? মরতে তো হবেই একদিন। সে-মরণ যদি আজই হয়, তাতে দুঃখ কি?—এই বলে তাঁরা মুখ-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, পাটভাঙা কাপড় পরে বুকে-মাথায় কারবালার মাটি ছোঁয়ালেন। তারপর পশ্চিম দিকে মুখ করে কলমা পড়ে শান্তস্বরে প্রার্থনা করলেন—হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তুমি সর্বজ্ঞ, সকলেরই প্রভু। তুমি জানো আমরা ইহজীবনে মীরনের কোনো ক্ষতি করিনি, বরং সাধ্যমতো উপকারই করেছি। একমাত্র তুমিই সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তোমার আদেশে তোমার বজ্র মীরনের মাথায় পড়ুক।—এই বলে ঘাতকের হাত এড়াবার জন্যে দুই ভগ্নী খোদাতালার নাম স্মরণ করতে

করতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এই ঘটনার সাত দিনের মধ্যে বজ্র তার শিকার খুঁজে ঠিক বের করল। ঘটনাটা ন্যায়শাস্ত্র-বর্ণিত কাকতালীয়বৎ হলেও পরম্পরাটা একটু আশ্চর্যরকমের বটে।

অনুচরেরা চিকিৎসার ঝামেলা না করে চুপি চুপি গিয়ে দু-চারজন বিশ্বস্ত প্রধানকে সংবাদটা জানিয়ে দিল। তাঁরা এসে দেখলেন, মীরনের মাথার পাঁচ-ছ জায়গায় গুলি লাগলে যেমন ফুটো হয় সেই রকম ছেঁদা, আর তাঁর বুকে পিঠে লম্বা লম্বা কতকগুলো লালচে ডোরাকাটা দাগ—দেখলেই মনে হয় কে যেন একটা লোহার তারের চাবুক খুব জোরে জোরে পিঠের উপর কষিয়ে দিয়েছে। ভূতপ্রেতের ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যে মীরনের মাথার বালিশের তলায় বরাবরই একটা করে ছোট ছোরা রাখা থাকত, সেটাও জায়গায় জায়গায় গলে গিয়ে দুমড়িয়ে গিয়েছে।

এখন সমস্যা হল, মীরনের মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়? মরার খবর কানাকানি হয়ে গেলে সেপাইশাস্ত্রীরা আর একদণ্ডও দাঁড়াবে না, সবাই হুড়মুড় করে পালাবে। ভয়ও আছে—বাদশা কাছেই রয়েছেন, তাঁর দলে গিয়ে তারা ভর্তি হয়ে যাবে। মীরনের দেওয়ান ঢাকার রাজা রাজবল্লভ সেন চৌকস ব্যক্তি। তিনি এসে বুদ্ধি দিলেন, মীরনের মরার খবর একেবারে গাপ করে ফেলাই ভালো। মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হোক যাতে দেখলেই লোকে মনে করবে যেন ছোট নবাবের খুব অসুখ করেছে, তিনি মরেননি। তাই করা হল।

কিন্তু বেশি দিন কথাটা চেপে রাখতে পারা গেল না। পচা মড়ার গা দিয়ে এমনি দুর্গন্ধ বের হতে লাগল যে, কার সাধ্য যে তার কাছে দাঁড়ায়? তখন কারো আর বুঝতে বাকি রইল না যে মীরনের হয়ে গেছে। অনেকেরই মনে পড়ে গেল ঠিক তিন বছর আগেকার এমনি আর-এক দিন। সেদিন মীরনের হুকুমে নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা মুর্শিদাবাদ শহর ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল। তবে সেটা অবশ্য একটা অন্য কারণে, এই যা তফাত। তখন দরকার ছিল, শহরের সবাই জানুক নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর ইহজগতে নেই, এখনকার উদ্দেশ্য ঠিক তার বিপরীত, লোকে যেন জানতে না পারে মীরনের মরণ হয়েছে। কিন্তু আর তো তিষ্ঠানো যায় না। রাজমহল আসতেই হাতির পিঠ থেকে মীরনের মৃতদেহ নামিয়ে সেইখানেই গোর দেওয়া হল, মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত আর টেনে নিয়ে যেতে পারা গেল না।

ওদিকে রানীসরাইয়ে বসে বসে বাদশা শা আলম সব শুনলেন। তখন ঘোর বর্ষা, কিছু আর করা যায় না। আসছে বছর আবার দেখা যাবে—মনকে এই প্রবোধ দিয়ে শা আলম এলাহাবাদ ফিরে গেলেন। ল-ও চলে গেলেন স্বস্থানে—ছত্রপুরে। বাংলা-বিহারের সকলেই জানল, কর্নেল ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে গেছেন বটে, কিন্তু যে ইংরেজদের রেখে গেছেন তারাই এখন বিপদে-আপদে রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশী লোকদের রক্ষাকর্তা বান্ধব।

॥ তেরো ॥

গভর্নরের চেয়ারে বসা অবধি জন্ জেফানায়া হলওয়েলের মনে একটুও শান্তি নেই। তিনি কেবলি ভাবছেন, স্বদেশে ফিরে যাবার আগে কি করে দু-পয়সা হাতিয়ে পকেটে পুরে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। ১৭৫৭ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবে, অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসানো ব্যাপারে, তাঁর বিশেষ-কিছু লাভ হয়নি, কারণ সে-সময় কলকাতার কাউন্সিলে তাঁর স্থান ছিল অনেক নিচে। দইয়ের অগ্রভাগ বেশি পরিমাণে পড়েছিল রবার্ট ক্লাইভের পাতে। তারপর হোমরাচোমরা মেম্বরদের দিয়েথুয়ে হলওয়েলের ভাগে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মেটবার কথা নয়। তাই তিনি মনের দুঃখ তখনকার মতো মনে চেপে রেখেই অন্ধকূপ-হত্যার অপূর্ব কাহিনী-রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট হয়ে হলওয়েল দেখতে পেলেন, ইংরেজরা মুসলমানী রাজ্যের বনেদ ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কোনো এক আঁটসাঁট রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না করায় দেশের অবস্থা ক্রমশই নিচের দিকে গড়িয়ে চলেছে। ফলে সর্বত্রই দুঃখাৎ দুঃখং ক্লেশাৎ ক্লেশং দুর্ভিক্ষাদ্ দুর্ভিক্ষম্। তাই আগেকার মতো কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা আমদানির তেমন আর সুবিধা নেই। ওদিকে নবাবের এমন অবস্থা যে, তাঁর ভাঁড়ারে তো দিনে ডাকাতি করেও একটা পয়সা পাবার উপায় নেই। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল, এখন টাকা তো কিছু চাই। টাকা না হলে চলে কি করে, মনে শান্তি আসে কই? হলওয়েল-সাহেব জোর ভাবতে লাগলেন।

অবশেষে ভেবে-চিন্তে হলওয়েল স্থির করলেন, মহাত্মা ক্লাইভ যে-খেলা দেখিয়ে গেছেন, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা খেলা। তাছাড়া সকলেই তো বলেন, মহাজনেরা যে-পথে গেছেন, সেই তো হল পথ। দিব্যচক্ষে দেখা যাচ্ছে, সে-পথেই যা-কিছু লাভ তা খানিক এখনো আছে, অন্য আর-সব পথে কেবল খাটুনিই সার, বকশিশ-পুরস্কার কিছুই নেই। হলওয়েল আবার একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার ফিকিরে ঘুরতে লাগলেন। মীর জাফরকে গদি থেকে সরাতে না পারলে আমদানির পথ যে একেবারে বন্ধ—সেটা হলওয়েল স্থির বুঝে

নিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল এই যে মীরন তখনো জীবিত, যে-হাতে মীর জাফরকে বাংলার মসনদ থেকে নাবাতে হয়, ঠিক সেই হাতেই আবার মীরনকে সেখানে ওঠাতে হয়। আর হলওয়েল এটাও ভালো করেই জানতেন যে, মীরন নবাব হলে সুখ করতে গিয়ে সোয়াস্তির যেটুকু তখনো অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও যাবে। হলওয়েল তখনকার মতো চুপ করে গেলেন।

ইতিমধ্যে মীরন মেজর ক্যাইলোডের সঙ্গে বিহারে থাকায় মীর জাফরের দূত হয়ে মীর কাশিমকে দু-চারবার কলকাতায় আসতে-যেতে হল। মীর কাশিম বুদ্ধিমান লোক, এক আঁচেই হলওয়েলেব মনের অবস্থা ধরে ফেললেন। হলওয়েলও বুঝলেন, মীর কাশিম কাজের লোক, তাঁকে হাতে রাখতে পারলে কাজ দেবে। সবচেয়ে বড কথা, মীর কাশিমের হাতে প্রচুর টাকা। হলওয়েল কৌশলে দেশের অবস্থার কথা পেড়ে তার দুরবস্থার জন্যে মীর জাফরকে দায়ী করতে লাগলেন। কিন্তু দেশের এই দুর্দশা ঘটানোতে ইংরেজদের যে কতটা হাত ছিল, সে-কথা তিনি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ কবলেন না, বেমালুম চেপে গেলেন। মীর কাশিমও সায় দিয়ে বলে উঠলেন, নবাব জাফর আলী খাঁর দফা একেবারে রফা করে না ফেলতে পারলে দেশেব আর কিছুতেই মঙ্গল নেই।

হলওয়েল সাউখুবি করে তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন, মীর কাশিমের মুখে ঐ কথাটা শুনে তিনি একেবারে আঁতকে উঠেছিলেন, কথাটা চাপা দেবার জন্যে নাকি বলেছিলেন, ওসব খুনখারাপির মধ্যে তিনি নেই। হলওয়েলের মতো সাধুসজ্জন ব্যক্তির পক্ষে মীর কাশিমের ঐ নোংরা কথায় চমকে ওঠা একটুও বিচিত্র নয়, কারণ ইংরেজরা খুনও করে আইনের দোহাই পেড়ে— যে-ছুরি গলায় চালায় সেটা মিছরির ছুরি, অর্থাৎ বুঝতেই পারা যাবে না যে গলায় ছুরি ঢুকছে। তবে আশ্চর্য এইটুকুই যে, সব শুনেও ঐ দুর্বৃত্ত মীর কাশিমেরই সঙ্গে হলওয়েলের মতো মহাশয় ব্যক্তির গুপ্ত মন্ত্রণা কিন্তু একবিন্দুও কমতি গেল না। মীর কাশিম তো ধরেই ফেলেছিলেন, হলওয়েলের ব্যথাটা কোথায়, এখন সেই ব্যথার উপর অব্যর্থ রুপোলি মলম বুলোতে তিনি একটুও কসুর করলেন না। মলমের দামটা কাগজে পরিষ্কার লেখাজোখা না থাকলেও সেটা অনুমান করে নিতে কারো একটুও বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তখনি তখনি আর-কিছু করতে না পেরে হলওয়েল-সাহেব মীর্ জাফরের বিরুদ্ধে একটা চার্জ-শিট খাড়া করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। মীর কাশিম টোপ ফেলে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

ঠিক এমনি সময়েই আচমকা বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হল। পুত্রাঢ যতহ

যা হোন না কেন তাঁর উপর মীর জাফরের স্নেহ ছিল অগাধ। তাঁর চরিত্রের প্রায় সবটাই খুঁটো হলেও এই দিকটা তাঁর ছিল একেবারে খাঁটি। কিন্তু এই দারুণ শোক নিবারণের অন্য আর-কোনো উপায় না করতে পেরে দুর্বলপ্রকৃতি মীর জাফর দুঃখ ভোলবার জন্যে অষ্টপ্রহর নেশায় বুঁদ হয়ে রইলেন। রাজকার্যে সামান্য যেটুকু মন দিতেন, তাও ঘুচে গেল। মীরনের মৃত্যুর পর মীর জাফরের এমন আর-কেউ রইল না যে, যিনি এই মহাসংকটকালে রাজকার্যের খানিকটা হাল ধরেন। থাকবার মধ্যে আছে নিজের দুই অপোগণ্ড ছেলে, আর মীরনের এক কোলে-চড়া শিশুপুত্র। আছেন বটে আরো একজন—জামাতা মীর কাশিম—কিন্তু মীর জাফর তাঁকে আদবেই বিশ্বাস করেন না, একটুও আমল দেন না।

মীর কাশিমের জন্ম এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে। এঁর কোনো-এক পূর্বপুরুষ পারস্যদেশ থেকে এসে দিল্লির বাদশার কাছ থেকে বিহারে জাইগির পেয়ে সেই প্রদেশেই বাস করতে থাকেন। মীর কাশিমের পিতামহ ইমতিযাজ খাঁ ভালো কবি ছিলেন, খালিশ নাম নিয়ে তিনি অনেক ফার্সী শ্লোক লিখে গেছেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের লাইব্রেরীতে এখনো খালিশের দিওয়ান-সংগ্রহ একখণ্ড মজুত আছে। ইমতিযাজ খাঁ মোগল-সাম্রাজ্যের মনসবদার হয়ে একসময় পাটনার দেওয়ানিও করে গেছেন। মীর কাশিমের বাবা রাজী খাঁ পলিটিক্সে নামেননি। ভদ্রলোকের মতো চুপচাপ নিজের জাইগিরে বসেই দিন কাটিয়ে গেছেন, টাকাও রেখে গিয়েছিলেন একগাদা।

নবাব আলীবর্দী খাঁ মীর কাশিমকে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে দেখে পছন্দ করে তাঁর সঙ্গে মীর জাফরের মেয়ে ফতমা-বিবির বিয়ে দিইয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে যৌতুক যা দেন, সেটা বেশ মোটারকমের। মীর কাশিমের জন্যে সরকারী খাজাঞ্চিখানা থেকে মাস মাস দুশো টাকার মাসোহারাও বরাদ্দ হয়ে গেল। এই নিয়ে গোড়ায় গোড়ায় মীর কাশিম একরকম সন্তুষ্টচিত্তেই কাল কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন বরাতজোরে মীর জাফর বাংলার নবাব হয়ে বসলেন তখন মীর কাশিমও আশা করতে লাগলেন, এবার তিনিও নিশ্চয়ই বড়-গোছের একটা কোনো সরকারী পদ পেয়ে যাবেন। কিন্তু মীরন তাঁর এই ভগ্নীপতিটিকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। তার প্রধান কারণ মীরনের তুলনায় মীর কাশিমের কর্মদক্ষতা ছিল অনেক উঁচুদরের। তাইতে মীর কাশিমের সম্বন্ধে মীরনের মনে একটু ভয়ও ঢুকেছিল। রকম দেখে, মীর জাফরও জামাইকে নিজের কাছে রাখতে সাহস করলেন না—রংপুরের ফৌজদার করে

সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি সহজে মুর্শিদাবাদে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে না পারেন। অবশেষে মীরন যখন কাছে নেই, পাটনায় গেছেন, আর শা আলম বাংলাদেশে এসে পড়ো-পড়ো হয়েছেন, মারাঠী শিবভট্ট এসেই পড়েছেন তখনই মীর জাফর মীব কাশিমকে রংপুর থেকে ডাকিয়ে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন। তবে শ্বশুর-জামাইয়ের মধ্যে একটুও সদ্ভাব ছিল না।

মীর কাশিম একান্তে বসে নিজের মনেই নিজের মতলব ভাঁজছিলেন, এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যাতে কবে সকলেব দৃষ্টি তাঁর উপর এসে পড়ে। মীরনের মৃত্যু-সংবাদ রাজধানী মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছতেই নবাবী সেপাইরা একেবাবে মাবমুখো হয়ে উঠল। তাবা অনেক দিন ধরে মাইনেপত্র না পাওয়ায় হন্যে হয়ে আছে। মীব জাফবকে বলে বলে তাবা হয়রান হযে গেছে, তিনি কোনো সাড়াশব্দ দেন না। আব দেনই বা কি কবে? ইংরেজদের দেনা শুধতে শুধতে তিনি তো একেবাবে ফতুব, নগদ টাকা রাজকোষে যা আছে, তার থেকে তো এক মাসেরই মাইনে কুলোয় না, তিন বছবের বাকি-বকেয়া শোধা তো বহু দূবের কথা। ভরসা ছিল, খাদেম হোসেনেব বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করে মীরন দেশে ফিবে এসে যাব যা পাওনা তা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেবেন। সে-আশায় তো ছাই পড়ল।

সংবাদ শুনে সেপাইবা ক্ষেপে গিয়ে নবাববাড়ি চড়াও করে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল। এমন অকথ্য ভাষায় নবাবকে গাল পাড়তে লাগল যে, তা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়। রাজকর্মচারীদের, বিশেষত খাজাঞ্চী মুৎসুদ্দীদের পাল্কি থেকে নামিয়ে পিটন দিতেও কসুর করল না। সেপাইদের আর সামলানো যায় না, তারা জোরজবরদস্তি নবাবের অন্দরেই ঢুকে পড়ে আব-কি। পর্দানশীন জেনানারা বেপর্দা হয়-হয়। অন্দবের দেওয়ালে চড়ে তারা চিৎকার করে মীর জাফরকে গাল পাড়ে, আর টাকা না বের করলে তাঁকে খুন কবেবে বলে শাসায়। নবাববাড়ির বড় দেউড়ি দখল করে নিয়ে তারা একজনও কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না, বাইরে বেরোতে দেয় না। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড।

তিন-চার দিন ধরে এই উৎপাত চলল। এতক্ষণ মীর কাশিম দূরে থেকেই সেপাইদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলেন, এইবার সময় উপস্থিত বুঝে অবতারের মতো তাদের মাঝে এসে দর্শন দিলেন। মাতব্বরদের ডেকে নিজের পকেট থেকে নগদ তিন লাখ টাকা বের করে তাদের হাতে সঁপে দিলেন। বাকি টাকার জন্যে নিজেই জামিন হলেন। মীর কাশিমের হাতে টাকার কোনো অভাব নেই। পৈতৃক সম্পত্তি তো ছিলই, তার উঁপর খুব হিসেব

করে চলতেন বলে নিজেও জমিয়েছিলেন বিস্তর। এ ছাড়া সিরাজউদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন, তখন পথের মধ্যে বেগম লুতফউন্নিসার গাড়ি কাদায় আটকে যাওয়ায় স্ত্রীপুরুষের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বেগম যখন অসহায় অবস্থায় পথের ধারে এক পাশে পড়ে আছেন তখন তিনি এই মীর কাশিমের হাতেই ধরা পড়েন। তাঁর দামী দামী যা-কিছু গহনাপত্র, সোনাদানা, মোহর-টাকা সঙ্গে ছিল, সবই মীর কাশিম বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মসাৎ করে নেন, মীর জাফরের তোশাখানায় একটা কানাকড়িও জমা দেননি। কিছু টাকা হাতে পেয়ে আর বাকি টাকার জন্যে মীর কাশিমের মতো আমীর লোকের আশ্বাস পেতে সেপাইরা শান্ত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে চলল। চারদিকে মীর কাশিমের জয়জয়কার পড়ে গেল।

মীর কাশিম যে শ্বশুরের প্রতি আসক্তিবশত এই কাজ করলেন, তা মনে করলে একটু ভুল করা হবে। তিনি মীর জাফরের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যে, জীবিতকালে ছোট নবাব মীরন যেসব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেসবই এখন থেকে মীর কাশিমের হবে। তার জন্যেই তিনি তিন লাখ সেলামি দিলেন। কিন্তু নবাব-বাদশা রাজারাজড়া জমিদার-মহাজনের প্রতিজ্ঞা যে শুধু ভাঙবার জন্যেই করা—সেটা বোঝবার মতো বয়েস মীর কাশিমের হয়েছিল। উপস্থিত ইজ্জত বেঁচে যাওয়াতে হাঁফ ছেড়ে মীর জাফর জামাতাবাবাজীকে কদলীপ্রদর্শনপুর্বক নিশ্চিন্ত মনে আবার নেশায় মশগুল হলেন। রাজকার্যের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ল মীর জাফরের তিনজন অতি জঘন্য চরিত্রের হিন্দু মোসাহেবের উপর। কেনারাম, মুনিলাল আর চুনিলাল, নবাবের এই তিন ইতর ইয়ারের অন্য আর-কোনো গুণ না থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত ছিল না। তারা বেশ জানত, অ্যায়সা দিন নেই রহেগা, সুতরাং যা পার এইবেলা করে নাও। নিজেদের পেট পোরাবার জন্যে তারা চারদিকে এমনি ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিল যে তার জ্বালায় কি হিন্দু আর কি মুসলমান, কি আমীর আর কি ফকির, কি ইতর আর কি ভদ্র—সবাই অস্থির হয়ে একবাক্যে মীর জাফরকে শাপশাপান্ত করতে লেগে গেল। মীর কাশিম সরকারী কোনো কাজেরই ভার পেলেন না ; শুধু খাদেম হোসেনের দরুন পুর্নিয়ার ফৌজদারিটা খালি পড়ে ছিল, সেটা তিনি বকশিশ পেয়ে গেলেন।

শ্বশুরের কাছ থেকে এই ব্যবহার পেয়ে মীর কাশিমের মন যে তাঁর উপর খুশিতে ভরে উঠল—একথা তো কিছুতেই বলা যায় না। বাইরে বিরক্তি প্রকাশ

না করে তিনি ভিতরে ভিতরেই গজরাতে লাগলেন। তিনি জানতেন, মীর জাফর যেমন ইংরেজদের সাহায্যেই নবাবী মসনদ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরও তেমনি ইংরেজদেরই সহায় দরকার। তিনি মুর্শিদাবাদের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করে প্রেসিডেন্ট হলওয়েলকে চিঠি ছাড়তে লাগলেন। মীর জাফরকে হলওয়েল কখনোই দেখতে পারতেন না, তিনি তো আগের থেকেই মীর কাশিমের দিকে ঢলে আছেন, সুতরাং তাকে বেশি কিছু বলতে হল না। কিন্তু হলওয়েল হচ্ছেন সেই প্রকৃতির লোকদের একজন, যারা নিজেরা হাতেনাতে কোনো-কিছু করে তুলতে পারেন না, কেবল পাঁয়তারা কষতেই জানেন। তাই ব্যাপারটা খুব বেশি দূর এগোল না।

হলওয়েল কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি বেশ জানতেন বিপ্লব-বিদ্রোহে সেনাপতিকে নিজের দলে টানতে না পারলে কাজ ফতে হওয়া অসম্ভব। তাই তিনি মেজর ক্যাইলোডকে দলে ভেড়াবার জন্যে মীর জাফরের বিরুদ্ধে আর মীর কাশিমের স্বপক্ষে সত্য মিথ্যা অনেক চোখা চোখা যুক্তি ছেড়ে চিঠি লিখতে লাগলেন। কিন্তু মেজর-সাহেব টোপ গিললেন না। তিনিও যুক্তি দিয়েই হলওয়েলের যুক্তি কাটাতে লাগলেন। তার সোজা কথা এই ছিল যে, এদেশের নবাব বাদশা, আমীর-ওমরাও, জায়গিরদার জমিদার-তাল 'দা সব সমান। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। কাকে ছেড়ে কাকে রাখা যায়, তা বোঝাই দায়। তবে উটকো দুশমন থেকে চেনা শত্রু বরং ভালো। আর যদি মীর জাফরকে গদি থেকে নামাতেই হয় তাহলে মীর কাশিম কেন সে-জায়গায় বসবেন? মীরনের শিশুপুত্র, নৈঃ নিঃশ্রী, কি দোষ করল? নবাবী ফৌজের সকলেই তো তাকেই চায়। সরকারী কাজ ঠিক চলে যাবে, যতদিন না সে বড় হয় ততদিন যদি রাজা রাজবল্লভ তার দেওয়ান থাকেন। ক্যাইলোডের এই প্রস্তাব যে বৈদ্য রাজার উসকানিতে, সেটা তিনি উল্লেখ না করলেও, বুঝতে দেরি হয় না। যাইহোক সেনাপতিকে দলে ভেড়াতে না পেরে হলওয়েল অতঃপর যা চালালেন তার যুতসই একটা দিশি নাম পাওয়া শক্ত, ইংরিজি নাম—উইস্‌পারিং ক্যাম্পেন—মন্দ নয়। পলিটিশিয়নরা সবাই জানেন এটা কি রকম মোক্ষম কাজের জিনিস। হলওয়েল গোপনে প্রত্যহ সিলেক্ট কমিটির মেম্বরদের কানে মীর জাফরের বিরুদ্ধে মৃদুমন্দ মন্ত্র ঝাড়তে লাগলেন।

ব্যাপার যখন এমনি জবুথবু অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তখন পাকা গভর্নর হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। হলওয়েলকে প্রেসিডেন্টের চেয়ার ছেড়ে উঠতে হল। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে তিনি দেশে ফেরবার

উদ্যোগ করতে লাগলেন। হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট অতিশয় সৎপ্রকৃতির মানুষ তবে ঠিক ঐ কারণেই তিনি কখনো তাড়াতাড়ি মনস্থির করে উঠতে পারে না, একবার এদিকে চলেন আর-একবার ওদিকে। পাছে কারো প্রতি কিছু অন্যায় করে বসেন, তাই ভেবে ভেবেই সারা হয়ে এই প্রকৃতির লোকের এমনি সন্তর্পণে চলতে থাকেন যে তাঁদের পা গিয়ে সবার আগে খানায় পড়ে অর্থাৎ যে-অন্যায়কে তাঁরা দূরে পরিহার করে চলতে চান ঠিক সেই অন্যায় তাঁরা নিজেরা শেষ পর্যন্ত করে বসেন। সর্বদাই দোমনা হয়ে ইতস্তত: করতে করতে অজ্ঞান্তে তাঁদের ভিতরটা এমনি নরম তুলতুলে হয়ে ওঠে যে তখন নিকৃষ্ট লোকেরা সহজেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার কোরে, সচ্ছন্দে তাদে দিইয়ে অনেক অপকর্ম করিয়ে নিতে পারে। তাইতেই তো দুষ্কর্মের সমস্ত দোষটাই তাঁদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। ফলকথা ভ্যান্‌সিটার্ট-সাহেব ঠিক সেই জাতীয় লোক যিনি অন্যের তাঁবে থেকে সততার সঙ্গে সুচারুরূপে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু নিজে প্রধান হয়ে সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কোনো কাজ হাসিল করে উঠতে পারেন না, বারে বারে অকাজেরই বোঝা জড়ো করে তুলতে থাকেন।

ভ্যান্‌সিটার্ট একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি মাদ্রাজ সিভিলিয়ন, কোম্পানীর বেঙ্গল এস্ট্যাবলিশ-মেণ্টের লোক নন। তাকে কলকাতার গভর্নরের পদ দেওয়াতে যাবতীয় বেঙ্গল সিভিলিয়ন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে মনে করতে লাগলেন, ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁদের এক ন্যায্য পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করলেন। ভ্যান্‌সিটার্ট সাদাসিধে ভালোমানুষ বলে তার ব্যক্তিত্ব এমন জোরালো ধাঁচের ছিল না যে, তার বলে ক্লাইভের মতো তিনিও হয় ধমকে ধামকে, নয় ভয় দেখিয়ে, না-হয় চাকরি খেয়ে দিয়ে, ঐসব লোককে দুদিনে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। ফলে, তাঁর কাউন্সিলে সর্বদাই কলহ-বিদ্রোহ এমন কি খোলাখুলি খেউড়ও চলতে থাকল।

হলওয়েল মীর জাফরের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট খাড়া করে রেখেছিলেন সেটা তিনি একটা মেমোরিয়লের আকারে নতুন গভর্নরের হাতে তুলে দিলেন। দিয়ে বললেন, ওর থেকেই এদেশের প্রকৃত অবস্থাটা তিনি নিজেই ধরে ফেলতে পারবেন। কি কৌশলে নির্জলা মিথ্যেকে যে নির্খাদ সত্যি বলে চালান করে দিতে পারা যায় তার একটা মডেল হিসেবে হলওয়েলের এই মেমোরিয়লটি অনেকের কাজে লাগতে পারে। আর, মনুষ্যজাতির চরিত্রও এমন বিচিত্র যে, মিথ্যাটাকে তার সহজেই সত্যি বলে বিশ্বাস হয়, সত্যকেই অলীক বলে

ভ্রম হতে থাকে। যাই হোক, হলওয়েলের এই মেমোরিয়লে মীর জাফরকে এমন একটা নির্ভাজ দুষমন বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পড়তে পড়তে অনেক ইংরেজেরও সাদা মুখ লজ্জায় কালো হয়ে ওঠে।

মীর জাফরের অনেক দোষ—সে কথা স্বীকার না গিয়ে উপায় নেই। তার চরিত্রে এমন কোনো গুণই ছিল না যে, যেটার সম্বন্ধে ফলাও করে কিছু লেখা যেতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণকে যতই কালো বলা যাক না কেন ঠিক ততটা কালো সে নয়। আর হলওয়েলের এমনি অসম্ভব কল্পনার দৌড় যে, একটু-কিছু লিখতে বসলেই তিনি তিলকে তাল না করে ছাড়েন না। তার হাতে পড়ে মীর জাফরের যে-চেহারা বেরোলো সেটাকে তাঁর অতি নিকট আত্মীয়েরও চট করে চিনে নিতে কষ্ট পেতে হয়। ইংরেজরা তো জেনেশুনে নিজেদের গরজেই মীর জাফরের মতো এক অপদার্থ বিশ্বাসঘাতককে বাংলার মসনদে বসিয়েছিলেন। এখন বাংলাদেশের যা-কিছু মন্দের জন্যে একা তাঁকেই দায়ী করাটাকে কোন্ শাস্ত্র-অনুসারে ন্যায়বিচার বলা যেতে পারে? হলওয়েলের মেমোরিয়লে ইংরেজদের কুকীর্তির কথা তো কুত্রাপি লেখাজোখা নেই। ভ্যান্সিটার্ট বঙ্গদেশে নতুন এসেছেন, তখনো তার গায়ের চামড়া ঠিক গণ্ডারের চামড়া হয়ে ওঠেনি, চক্ষুলজ্জার সবটা চলে যায়নি, অনেকটাই অবশিষ্ট আছে। তিনি হলওয়েলের প্রস্তাবে ঠিক ষোলো আনা রকম সায় দিয়ে উঠতে পারলেন না।

ওদিকে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যাবার আগে বঙ্গদেশে যে-অবস্থার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন সেটা ভ্যান্সিটার্টকে বেশিদিন স্থির হয়ে কাজ করতে দিল না। ক্লাইভ নিজে হয়তো ঐ জটিল অবস্থার মধ্যে থেকে মুখরক্ষার মতো একটা কোনো উপায় খুঁজে বের করে নিতে পারতেন, কিন্তু সেটা ভ্যান্সিটার্টের মতো নিরীহ লোকের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। নতুন গভর্নর ফোর্ট উইলিয়মের সিন্দুকের চাবি হাতে নিয়েই দেখতে পেলেন, সিন্দুক একেবারে ফাঁকা গড়ের মাঠ। ক্লাইভ সমস্ত টাকা দক্ষিণের যুদ্ধের খরচ বাবদ মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদিকে আমদানি নেই ওদিকে খরচ আছে দেদার। নবাব টাকা পয়সা আর-কিছু দিয়ে উঠতে পারছেন না, তার হাতে কিছুই নেই। লড়াইয়ের খরচ কোম্পানীর ডিরেক্টররা আর এক পয়সাও এখন বের করতে চান না। তাঁরা ভাবেন, যুদ্ধ যখন তাঁদের কথায় হচ্ছে না তখন তার খরচ জোগানোর দায় তাঁদের নয়, তাঁদের কর্মচারীদের। সুতরাং মাদ্রাজের খরচ ক্লাইভ যে বঙ্গদেশের কোম্পানীরই তবিল থেকে নিয়ে চালিয়েছেন, সেটা তাঁদের ঠিক জানা ছিল না।

তাছাড়া তাঁরা তো ধরেই নিয়েছিলেন, নানা নামে নবাবের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় হচ্ছে আর হবে, তাতেই তিন-তিনটে প্রেসিডেন্সীর—বাংলা মাদ্রাজ আর বোম্বায়ের—নিত্যনৈমিত্তিক কাজ চালাবার খরচটা উঠে যাবে। ডিরেক্টররা লণ্ডন থেকে আর টাকা পাঠান না। ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। ওদিকে ইংরেজদের দেশী সেপাইদের মাইনের যে-টাকা রাজ্যরক্ষার নাম করে মীর জাফরেরই তোষাখানা থেকে আসছিল সেটাও হালে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের মাইনে ক্রমাগত বাকি পড়তে লাগল। তাতে ওদের অনেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠে ইংরেজদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাদশাহী ফৌজে গিয়ে নাম লেখাল।

আরো এক বিপদ। এদেশের মাল কেনবার জন্যে কোম্পানী বছর বছর অনেক টাকা আগাম পাঠাতেন। এখন তা আর পাঠান না। কারণ, তাঁরা মনে করেছিলেন, নবাবের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় হবে তার থেকে খরচ খরচা বাদ দিয়েও এতটা টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে যে মাল কেনা-কাটা সব তাতেই চলে যাবে। সুতরাং ধীরে ধীরে মাল কেনাও বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। মাল কিনে বিদেশে চালান না দিতে পারলে তো আর লাভে মাল বেচা যায় না। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম। বেচারী ভ্যান্সিটার্ট একেবারে আথান্তরে পড়ে গেলেন। এই বিষচক্র ভেদ করে সসম্মানে বেরিয়ে পড়াটা তাঁর হিম্মতে কুলিয়ে উঠল না।

সুযোগ বুঝে হলওয়েল সময় নেই অসময় নেই স্থানে-অস্থানে মীর কাশিমের গুণগান করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মতে ঐ বিপন্ন অবস্থা থেকে ইংরেজদের টেনে বের করতে একা মীর কাশিমই পারবেন, আর কেউ নয়। হলওয়েল মীর কাশিমের যথেষ্ট নুন খেয়েছেন এখন তাঁর খানিক গুণ না গেয়ে তিনি স্বদেশে ফেরেন কি করে? সব শুনে কাউন্সিলের মেম্বররা একবাক্যে হাঁকতে লাগলেন, তাহলে মীর কাশিমকে কলকাতায় ডাকিয়ে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলা হোক, এরকম করে তো আর জলে ভাসা চলে না। ভ্যান্সিটার্ট কি আর করেন? মীর কাশিমের কি বলবার আছে একবার তাঁর মুখ থেকেই সেটা শোনা যাক, এই মনে করে তিনি তাঁকে শিগ্‌গির কলকাতা চলে আসতে চিঠি লিখে দিলেন।

কিন্তু মীর কাশিমের মতো লোককে তো আর এমনি এমনি কোথাও ডেকে পাঠানো যায় না? মীর জাফরের তাতে সন্দেহ হবেই হবে। মীর কাশিম নিজেই তার এক উপায় বাতলিয়ে দিলেন—বাদশা শা আলম আবার

বঙ্গবিজয়ের তোড়জোড় করছেন বলে শোনা যাচ্ছে, সেই সংক্রান্তেই ইংরেজরা মীর কাশিমের সঙ্গে শলাপরামর্শের জন্য তাঁকে কলকাতায় ডাকছেন—একথা বললে নবাব আর আপত্তি তুলতে পারবেন না। তাই করা হল। মীর কাশিম কলকাতা যাবার অনুমতি পেয়ে গেলেন। ভ্যান্সিটার্ট কিন্তু তখনো পযন্ত মীর জাফরকে হটিয়ে তাঁর জায়গায় মার কাশিমকে নবাবী গদিতে বসাতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। সেটা নিতান্ত পাপ কাজ হবে বলেই তিনি নবাবের সঙ্গে পুরনো চুক্তি ভাঙতে আদবেই রাজী নন। তবে মীর জাফরকে বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যাতে তিনি মীর কাশিমকে দেওয়ান করে রাজ্যচালনার ভার তাঁরই উপর কতকটা ছেড়ে দেন, তার চেষ্টা করতে তিনি সম্মত হলেন। হলওয়েল আর কাউন্সিলের মেম্বররা দেখলেন আর বেশি টানাটানি করতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, তাই তাঁরাও তথাস্তু বলে তখনকার মতো ক্ষান্ত দিলেন।

মীর কাশিম কলকাতায় আসতে তাকে হলওয়েলের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। হলওয়েল মীর কাশিমকে পড়িয়ে-শুনিয়ে তুতিয়ে-পাতিয়ে তৈরি করে নিয়ে সিলেক্ট কমিটির সামনে হাজির করলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৭৬০) দু-পক্ষের মধ্যে একটা একরারনামা সই হয়ে গেল। চুক্তিপত্রে যা যা লেখা ছিল তার মর্ম সাদা বাংলায় সংক্ষেপে এই যে, মীর জাফর নামে-মাত্র বাংলার নবাব সেজে মসনদে বসে থাকবেন, তার খাওয়া-পরা, বিলাস-ব্যসনের দরুন উপযুক্ত মাসোহারা তিনি ঠিক ঠিক পেয়ে যাবেন। কাজে নবাবী করবেন মীর কাশিম যতদিন না পযন্ত মীর জাফরের মৃত্যু ঘটছে, তারপর তিনি নামেও বাংলার নবাব হবেন। আর স্থির হল, ইংরেজদের সমস্ত পাওনাগণ্ডা মীর কাশিম কড়াক্রান্তিতে শোধবোধ করে দেবেন। মীর কাশিমকে কায়দায় পেয়ে কাউন্সিল একটা বড় মজার শর্ত করিয়ে নিলেন। বাংলার নবাবকে বাংলার মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে ইংরেজদের যে সৈন্য মোতায়েন রাখার দরকার, তার দরুন যখন যা খরচ হবে, তার জন্যে তাদের আর বারেবারে নবাব-দরবারে গিয়ে কারো কাছে হাত পাততে হবে না, তার বদলে বঙ্গদেশের তিন-তিনটে বড় বড় জেলার—বর্ধমান, মেদনিপুর, আর চাটগাঁর—রাজস্ব ইংরেজ কোম্পানীই আদায় করবেন, কোম্পানীই তা ভোগ করবেন।

মীর কাশিম ইংরেজ চরিত্র এ-কয়দিনেই বেশ ভালো করে বুঝে নিয়েছিলেন। সুলেনামা সই করেই তিনি পকেট থেকে ফস্ করে একটা ফর্দ বের করে সেটা গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের হাতে গুঁজে দিলেন, তার সঙ্গে

একটা মোটা টাকার হুণ্ডি। ফর্দে কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির মেম্বরদের নাম পরের পর লেখা আছে, আর নামের পাশে আছে বড-বড় মোটা-মোটা অঙ্ক। পড়ে দেখা গেল, তাতে প্রেসিডেণ্ট ভ্যান্‌সিটার্টের নামে উঠেছে পাঁচ লাখ, হলওয়েলের নামে দু লাখ সত্তর হাজার (হাতে হাতে যা পেয়েছিলেন তা বাদে). মেজর ক্যাইলোডের নামে দু লাখ। বাকি মেম্বররাও কেউ ফেলনা যাননি, তাঁদেরও প্রত্যেকের কপালে যা উঠেছিল তাকে কিছুতেই মন্দ বলা চলে না। ইঙ্গিতটা বুঝতে ভ্যান্‌সিটার্টের মতো লোকেরও খুব বেশি দেরি হল না। তিনি এসব আবার কি—এসব আবার কি—বলে খানিকটা আমতা আমতা করে এক স্পীচ ঝেড়ে বসলেন—নিজেদের প্রাপ্তির আশায় তারা এসব কিছু করছেন না, বঙ্গদেশের মঙ্গলের জন্যেই যা-কিছু করা। এই বলে হুণ্ডিটা তিনি মীর কাশিমকে ফেরত দিয়ে দিলেন। তারপর যখন লক্ষ্য করলেন যে, কমিটির অন্য মেম্বররা লোলুপ দৃষ্টিতে হুণ্ডির উপর নজর দিচ্ছেন তখন তিনি কথাটার জের টেনে বললেন, তবে যদি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা ফৌজের বাকি বকেয়ার টাকা সব শোধ করে, দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনে মীর কাশিম তখন যদি স্বেচ্ছায় তাঁদের কিছু বকশিশ দিতে চান, তাহলে সেটা নিতে তাঁদের কোনোই আপত্তির কারণ থাকবে না। কথা অবশ্য তখনকার মতো শুনতে খুবই ভালো লেগেছিল, কিন্তু কার্যোদ্ধার হয়ে যাবার পর মীর কাশিম যখন এ-সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন না, এমন ভাব দেখান যেন ওসব কথা কোনো কালেই ওঠেনি তখন আর থাকতে না পেরে তাগাদার-পর-তাগাদা লাগিয়ে মীর কাশিমের কাছ থেকে কড়াক্রান্তিতে হুণ্ডির সব টাকাটা আদায় করে নিয়ে. সেটা কাগজে লেখা অঙ্ক-অনুসারে মেম্বরদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজটা অবশ্য নীতিশাস্ত্রের যে ঠিক কোন্ প্রকরণে পড়ে তা কেবল নীতিবাগীশেরাই বলতে পারেন।

কলকাতার ব্যাপার চুকিয়ে মীর কাশিম মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে ভালো-মানুষ সেজে বসলেন। নবাবকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বুদ্ধি করে ইংরেজদের সঙ্গে সব বিলিবন্দোবস্ত করে এসেছেন, আর কোনো ভাবনা নেই। শুনে, জামতাবাবাজীকে বহু সাধুবাদ জানিয়ে মীর জাফর খুশমেজাজে আবার নেশায় দম দিলেন। নাচগানে মজলিশ জমে উঠল। ভিতরে ভিতরে যে কি রকম লঙ্কাভাগ হয়ে গেল তার বিন্দুবাষ্পও মীর জাফর টের পেলেন না।

॥ চোদ্দ ॥

মীর কাশিমের সঙ্গে তো ইংরেজদের বোঝাপড়া একরকম হয়ে রয়ে চুকে গেল। এখন মীর জাফরকে তাতে তো নওয়ানোর দরকার? সকলেই ভেবেছিলেন যে, হলওয়েল বোধ হয় এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়ে মুর্শিদাবাদ যাবেন, কিন্তু তাঁকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তিনি ভাবলেন, তাঁর কাজ তো তিনি সেরেই দিয়েছেন, আর ইাকে নিয়ে টানাটানি কেন? বাকিটুকু এখন অন্যে করুক। তখন তার পেট একরকম ভরেছে, তাই কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি দেশে ফিরে চললেন।

অগত্যা ভ্যানসিটার্টকে নিজেই নবাব-সন্দর্শনে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করতে হল। নবাবের উপর জোর-জবরদস্তি না করে, তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাযোদ্ধার করার ঝোঁকটা গভর্নরের একটু উৎকট রকমের হতে দেখে, কাউন্সিলের মেম্বররা মুখে আর-কিছু বললেন না। শুধু কর্নেল ক্যাইলোডকে (এখন তিনি মেজর থেকে কর্নেল হয়েছেন) সঙ্গে নিতে অনুরোধ জানালেন। মীর কাশিমও গোপনে ক্যাইলোডকে যথেষ্ট সেপাই পল্টন সঙ্গে আনার পরামর্শ দিয়ে পাঠালেন। আসল কথাটা না ভেঙে তিনি শুধু এই বললেন যে, তা না আনলে ইংরেজদের প্রেস্টিজের হানি হতে পারে। মীর কাশিম বেশ বুঝে নিয়েছিলেন ইংরেজেরা অনেক-কিছু তুচ্ছ করে উড়োতে পারে কিন্তু প্রেস্টিজের দোহাই তাদের কাছে অব্যর্থ। তার মনে অবশ্য এই ছিল যে, মূর্খের ওষুধ সবসময়ে হাতের কাছে থাকা ভালো। শ্বশুরমশায় যদি হঠাৎ বিগড়িয়ে গিয়ে একটা বদখত কাণ্ড কিছু করে বসেন তাহলে ওষুধটা তখন খুবই কাজে লাগবে।

সিলেক্ট কমিটি মীর কাশিমের কথাটাকে একেবারে সারকথা মেনে নিলেন। গভর্নর আর কমানডার-ইন-চিফের সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজিয়ে গোরা পল্টন আর কালা সেপাই চলল একরাশ। মীর জাফর অত সেপাই-পল্টন দেখে পাছে ঘাবড়িয়ে যান তাই তাঁকে অভয় দেবার জন্যে লিখে দেওয়া হল—কর্নেল-সাহেব তাঁর লোকজন নিয়ে পাটনায় যাচ্ছেন। তবে গভর্নর-সাহেব যখন নবাবের দর্শন পাবার জন্যে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন তখন কর্নেলও দু-চার দিন সেখানে থেমে

নবাবকে সেলাম করে পাটনা রওনা হয়ে যাবেন। সেখানকার অবস্থা যা শোনা যাচ্ছে তাতে প্রচুর সেপাই-পল্টন সেখানে না পাঠালেই নয়।

২রা অক্টোবর (১৭৬০) যাত্রা আরম্ভ হল। ভ্যান্‌সিটার্ট ধীরেসুস্থে পথে থামতে থামতে চলেছেন, কারণ মীর কাশিমের তাঁর আগেই রাজধানীতে পৌছনো দরকার, নইলে সব বিষ্টে তো ফাঁস হয়ে যাবে। ১৪ই অক্টোবর ভ্যান্‌সিটার্ট আর কর্নেল ক্যাইলোড মুর্শিদাবাদ পৌছলেন। মুরাদবাগে সিরাজউদ্দৌলার দরুন পুরনো বাড়িটা তখন ইংরেজদের অধিকারে। ভ্যানসিটার্ট সেখানেই গিয়ে উঠলেন। কাশিমবাজারের কুঠিবাড়িতে থাকার চেয়ে ঐখানে থাকলে ইংরেজ গভর্নরকে মানাবে ভালো। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে বেশ রাত হয়ে গেল, তাই সেদিন আর কিছু করা গেল না।

পরদিন সকালে এটিকেট-মাফিক নবাব মীর জাফর মুরাদবাগে এসে ইংরেজ গভর্নরকে দর্শন দিলেন। পান-সুপুরি আতর-গোলাপ নজর-খেলাত ইত্যাদি আদানপ্রদানের পর নবাব নিজের থেকেই পাটনার অবস্থার কথাটা তুলে বললেন, কর্নেল-সাহেবকে যত শিগ্‌গির সম্ভব হয় সেখানে পাঠানো হোক। এতে ভ্যান্‌সিটার্টের একটু সুবিধাই হল। তিনি কি করে আসল কথাটা পাড়বেন তাই ভেবে এতক্ষণ অস্থির হচ্ছিলেন। মীর জাফরের কথার প্রত্যুত্তরে তিনি সম্প্রতি দেশের যে কি হাল হয়েছে পঞ্চমুখে তারই বর্ণনা করতে লেগে গেলেন। ভ্যান্‌সিটার্টের মনটা আদবেই প্যাঁচালো ধরণের ছিল না। তাই তিনি স্পষ্টাস্পষ্টিই লিখে গেছেন যে, মীর জাফরকে লওয়াবার জন্যেই তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা অনেকখানি বাড়িয়ে-সাড়িয়ে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়েই নবাবের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

কিন্তু নির্বোধ মীর জাফরও কি ধরতে পেরেছিলেন যে গভর্নর-সাহেব ইচ্ছে করেই তার সব উক্তিই অত্যুক্তিতে দাঁড় করাচ্ছেন? তিনি চুপ করে সবটা শুনে গিয়ে বললেন, কেন গভর্নর-সাহেব এত অবান্তর কথা তুলছেন? তবু এই বলতেই সাহেব যখন কষ্ট করে এতটা দূর এসেছেন তখন নবাব ভালো করে সবটা একবার আগাগোড়া ভেবেচিন্তে দেখবেন। কিন্তু সেটা সেদিন আর নয়, পরদিন এই নিয়ে আবার আলাপ-আলোচনা করা যাবে, এই আশ্বাস দিয়ে মীর জাফর নদীর ওপারে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। সরলমনা ভ্যান্‌সিটার্ট ভাবলেন, বিনা জোর-জুলুমেই তিনি কাজ ঠিক গুছিয়ে নিতে পারবেন!

কিন্তু পরদিনটাও ঐরকম শিষ্টাচারেই কেটে গেল। আমাদের দেশের লোকের হাতে সময় এত অপর্যাপ্ত যে, কোনো কাজেই আমাদের তাড়াহুড়া

নেই, তা সে কাজ যতই জরুরী হোক না কেন। এর পর আরো-একটা দিন সেই ছেঁদো কথাতেই কেটে যাচ্ছে দেখে ভ্যান্‌সিটার্ট ভাবলেন, এরকম চললে তো কিছু না করেই তাকে কলকাতা ফিরতে হয়, কিন্তু তা হলে তো আর কাউন্সিলরদের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। তাই পরদিন মীর জাফর আবার যখন মুরাদবাগে গভর্নর-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন আর কথা না বাড়িয়ে ভ্যান্‌সিটার্ট একটা মেমোর‍্যাণ্ডামের মতো করে ফার্সীতে লেখা তিন-তিনটে চিঠি এরসঙ্গেই নবাব-বাহাদুরের হাতে তুলে ধরলেন।

নবাব আর তাঁর রাজ্যপরিচালনা সম্বন্ধে যাবতীয় কেচ্ছা এই তিন চিঠিতে খোলাখুলিভাবে লেখা ছিল। আর হুল যেমন লেজের দিকে থাকে তেমনি বিষের টাটি ছিল শেষ চিঠিটার তলার দিকে। সেখানে নবাবকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তিনি এখন অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, রাজকার্যের মতো কঠিন কর্ম তাকে আর সাজে না। অত ভার এই বয়সে তার সহ্য হবার কথাও নয়। তার আত্মীয়দের মধ্যে কোনো একজনের ঘাড়ে সে-ভার চাপিয়ে দিয়ে তিনি খানিকটা হালকা হয়ে নিশ্চিন্তে নবাবী করতে থাকুন—এই হল ইংরেজ কাউন্সিলরদের বিনীত অনুরোধ। তারা নবাব আর তার দেশের সর্বপ্রকারে হিতকামী, তাই তাঁদের এত সব কথা বলা। ইংরেজদের স্বার্থের কথা চিঠিতে অবশ্য ঘুনাক্ষরেও কোথাও লেখা ছিল না।

খাসমুন্সীর মুখে আচমকা এসব পিলে-চমকানো চিঠির মর্ম শুনে মীর জাফরের চক্ষু তো চড়কগাছ। হাজার মোটাবুদ্ধি হলেও এটুকু তার বুঝতে একটুও কষ্ট হল না যে, তার আত্মীয়দের মধ্যে একজন বলতে কাউন্সিলররা কাকে ইঙ্গিত করছেন। ইংরেজের হাতে তার এতবড় অপমান এর আগে কখনো ঘটেনি। তার রক্ষাকর্তা কর্নেল ক্লাইভ কখনো ঠারেঠোরেও এমন কথা ইঙ্গিত করতে সাহস করেননি। খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে তিনি বিদায় নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দেখে মনে হল নবাব-বাহাদুর যেন আরো দশ বছর বেশি বুড়িয়ে গেছেন।

ভ্যান্‌সিটার্ট কিন্তু কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেবেন না। চিনে জোঁকের মতো নবাবের পিছনে লেগে রইলেন। মনে হল, কথাটার একটা হেস্তনেস্ত না করে তিনি নবাবকে আজ আর বাড়ি ফিরে যেতে দেবেন না বলে পণ করেছেন। নবাবের রাতের খানা সেখানেই আনিয়ে নিতে বললেন, যেহেতু কনফারেন্স শেষ হতে আরো ঢের দেরি হবে। বেগতিক দেখে মীর জাফর মিনতি করতে লাগলেন, তিনি একেই বুড়ো হয়ে পড়েছেন, তায় তাঁর অন্ধের যষ্ঠি সাদেক

আলী (মীরন) তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে আর বেঁচে নেই। নবাবের কথা শুনে ভ্যানসিটার্ট বলে উঠলেন—মীর কাশিমের চেয়ে বড় হিতৈষী আপনার আর কে আছে এখন? তাঁকেই ডেকে পাঠান, তিনিই সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিতে পারবেন। ঐ কথা শুনে মীর জাফর আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াতে চাইলেন না। বাড়ি ফেরবার জন্যে বিষম জিদ করতে লাগলেন। ভ্যানসিটার্ট তাকিয়ে দেখলেন, নবাবকে সত্যিই এত অসম্ভব রকম ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে এর পর আর পেড়াপীড়ি করলে তার উপর অত্যাচারই করা হবে। আর কিছু না বলে তিনি নবাবকে বিশ্রাম করতে যেতে ছেড়ে দিলেন।

মীর জাফর চলে যাবার ঠিক পরেই মীর কাশিম এসে হাজির। এসে দেখলেন, ভ্যানসিটার্ট বিষম চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছেন। গভর্নর-সাহেবের ধারণা ছিল, মীর জাফরকে বলে-কয়ে রাজী করিয়েই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার নায়েব নাজিমের অর্থাৎ ডেপুটি গভর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত করে কলকাতা ফিরে যেতে পারবেন। এখন বুঝলেন, জবরদস্তি ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু অত দূর অগ্রসর হতে ভ্যান্‌সিটার্টের মন উঠছে না। শেষ পর্যন্ত মীর কাশিমের সঙ্গে সব বাটান-ছাড়ান করে কলকাতায় ফিরে যাবেন কি না, ভ্যানসিটার্ট সেইটেই ভাবছিলেন, ঠিক অমনি সময়েই মীর কাশিমের সেখানে আগমন।

গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টকে অমন অশান্তিতে পড়ে দোমনা হতে দেখে মীর কাশিমের এত দিনের আশা ভরসা সব বরবাদ হয়ে যাবার দাখিল। তখন তিনি মরীয়া হয়ে উঠে এক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টকে দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন যে, পাশার দান তার পড়ে গেছে, সে-দান আর ফেরবার নয়। এখন যদি ইংরেজরা তাকে ছেড়ে চলে যান তো তার আর মুর্শিদাবাদে থাকা চলে না। এখন সবই তো জানাজানি হয়ে গেছে, এখন এখানে থাকলে নবাবের হাতে তাঁর প্রাণদণ্ড অনিবার্য। তার চেয়ে তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে নিয়ে বীরভূমের জঙ্গলে চলে যাবেন। সেখানে আর কিছু না হোক চুরিডাকাতি করেও তো পেট চালাতে পারবেন। সেখান থেকে বাদশা শা আলমকে চিঠি দেবেন। তিনি যদি দয়া করে তাঁকে গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর দলেই গিয়ে জুটবেন, নচেৎ যা কপালে লেখা আছে তাই হবে।

কথাটা বাঁকা রাস্তায় চলল দেখে ভ্যান্‌সিটার্ট মীর জাফরকে পথে আনবার জন্যে আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় নিলেন। তার মধ্যে যা হোক একটা-কিছু এসপার-ওসপার করে ফেলবেন বলে তিনি আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে উঠলেন। মীর কাশিম বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন, নবাবকে আর সময় দেওয়া বৃথা।

তিনি কিছুতেই বাগ মানবেন না। ইংরেজদের প্রস্তাবে তিনি কখনোই রাজী হবেন না। কেন যে হবেন না, সেটা ভ্যান্‌সিটার্ট বুঝে উঠতে না পারলেও, মীর কাশিম সেটা পরিষ্কার জানতেন। নবাব কোনোক্রমে একবার মীর কাশিমের হাতে পড়লে মীর কাশিম যে তাঁকে শ্বশুর বলে ছেড়ে দেবেন না, এ কথা মীর কাশিমও যেমন জানতেন মীর জাফরও ঠিক তেমনই বুঝতেন। এদেশে স্বার্থের কাছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউই যে কিছু না—এইটেই ছিল সবচেয়ে খাঁটি কথা।

তবুও ভ্যান্‌সিটার্ট একবার শেষ চেষ্টা না করে মীর জাফরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সম্মত হলেন না। কিন্তু তাতে অবশ্য কোনো ফল পেলেন না। সারাদিন অপেক্ষা করেও মীর জাফরের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তখন ভ্যানসিটার্ট রেগে উঠে সৈন্য দিয়ে মীর জাফরের বাড়ি ঘেরাও করতে কর্নেল ক্যাইলোডকে অর্ডার দিয়ে ফেললেন। ইংরেজরা ধরেই নিয়েছিল তারা মীর জাফরের জন্যে যা ভালো মনে করে, সেইটাই হল তাঁর পক্ষে যথার্থ ভালো। তিনি যদি সেটাকে ভালো বলে মেনে না নেন তাহলে সেটা তাঁর শয়তানি। তখন জবরদস্তি ছাড়া মামলা আর মেটে কিসে?

সেই রাত্তিরটা ছিল বিজয়াদশমীর রাত্তির। মীর জাফরের সিদ্ধিতে নিপুণ হিন্দু মন্ত্রীরা আর তাদের লোকজন সবাই সিদ্ধিদেব কৃপায় একদম বেএক্তিয়ার, কে কাকে দেখে তার কিছুই ঠিক নেই। মুসলমান আমীর-ওমরাও সেপাই-শান্ত্রী সবাইকে মীর কাশিম আগের থেকে হাত করে রেখেছেন। তাই কোথাও একটু টু-শব্দটিও নেই। রাত্তির তিনটেয় কর্নেল ক্যাইলোড তাঁর লোকজন নিয়ে চুপি চুপি গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলেন। ওপারে মীর কাশিম তাঁর দলবল নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলেন। দুই দলে মিলে একত্র হয়ে নিঃসাড়ে মার্চ করে গিয়ে রাতারাতি নবাব-বাড়ি ঘেরাও করে ফেললে। বাইরের উঠোনে জমায়েত হয়ে কর্নেল-সাহেব তাঁর সৈন্য সাজাতে লাগলেন। এমন সন্তর্পণে সব কাজ সারা হল যে কাক পক্ষীতেও একটু-কিছু টের পেল না।

সকাল হতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নবাব মীর জাফর দেখলেন, চারিদিকে অগুণতি লালকোর্তা সেপাই-পল্টন। তারা কাউকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না, ভিতরেও আসতে দিচ্ছে না। নবাবের বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি নিজেরই বাড়িতে বন্দী হয়ে পড়েছেন। ভ্যান্‌সিটার্ট ক্যাইলোডের

হাতে মীর জাফরকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইংরেজ দোভাষী হেনরী লাসিংটন কুর্নিশ করে সেটা নবাবের কাছে পেশ করলেন। চিঠিতে সেই পুরনো কাসুন্দি আবার ঘাঁটা হয়েছে, সেই বাঁধাগতে নবাবকে ফের অনুরোধ জানানো হয়েছে, তিনি যেন মীর কাশিমকে নায়েব নাজিম বানিয়ে তাঁরই হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে নবাবী করতে থাকেন।

চিঠির মর্ম শুনে মীর জাফর রাগে ফেটে পড়লেন। তড়পে উঠে লাসিংটনকে বললেন, ইংরেজ সেপাই-পল্টন যতক্ষণ না মুরাদবাগে ফিরে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু প্রবলের কাছে দুর্বলের রাগ দেখাতে যাওয়াটা হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে আসে না। নবাবের আস্ফালন দেখে প্রত্যুত্তরে কর্নেল ক্যাইলোড অন্দরে যাবার দেউড়ির ঠিক মুখের উপরই কামান পেতে বসলেন। তাই দেখে নবাবের যে-সব বডিগার্ড অন্দরের পাহারায় ছিল, তারা চোখের পাতা ফেলতে-না ফেলতেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

নবাব বুঝলেন, ইংরেজরা একবার যখন ধরেছে তখন সহজে তারা ছাড়বে না। সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর অপমানিত হওয়ার চেয়ে মানে মানে হার মেনে নেওয়াই ভালো মনে করে তিনি নবাবী শীলমোহর, চেন্না, সরঞ্জাম ইত্যাদি সবই মীর কাশিমের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন, বাংলার মসনদ তিনি তাঁকেই ছেড়ে দিলেন। বাও যে ঠিক এই রকমই ঘটবে মীর কাশিম তা আগের থেকেই জানতেন। ইংরেজরা যতই যা-কিছু বলুক না কেন, বড়-বড় গনৎকাররা গুণে বলে দিয়েছেন, তার কপালে নবাবী নাচছে। তিনি কি দুঃখে নায়েব নাজিম হতে যাবেন? তার অদৃষ্টে হয় নবাবী, নয় ফকিরি, এ-দুয়ের মাঝামাঝি কিছু নেই। মীর জাফর যে তার হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে তাঁরই আওতায় শুধু নামে নবাব হয়ে বসে থাকবেন না—এক ভ্যান্‌সিটার্ট ছাড়া আর সবাইকারই তা জানা কথা। নবাবী থাকলে কি হয়? প্রাণভয় বলেও তো একটা বস্তু সবসময়েই আছে।

শান্ত হয়ে মীর জাফর লাসিংটনকে ডেকে ধীরে ধীরে বললেন—ইংরেজরাই আমাকে বাংলার মসনদে বসিয়েছিলেন, এখন তারাই আবার আমাকে সেখান থেকে নামাচ্ছেন। তাঁদের মনোরথ পূর্ণ হোক। তাঁদের সঙ্গে আমি যে-চুক্তি করেছিলুম তার একটি-কোনো শর্তও আমি ভাঙিনি, তাঁরাই ভাঙলেন। এই রকম যে ঘটবে তা সাদেক আলী (মীরন) আমায় অনেক আগের থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমিই নিতান্ত গণ্ডমূর্খ, আমি সে কথায় তাই

তখন কান দিইনি। আজ আমার সে ছেলে [illegible] থাকত মীর জাফরের গলা ধরে এল, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

লাসিংটন আসল ঘটনার সমস্ত বিবরণ দিয়ে ক্লাইভকে একটা চিঠি লিখে ছিলেন। সে-চিঠি এখনো পড়তে পাওয়া যায়। অনেক সত্যি কথা তাতে লেখা আছে। হেনরী লাসিংটন ছোকরা অবস্থা থেকেই এদেশে আছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো তিনিও ভালো করে ফার্সী লিখতে পড়তে, বলতে-কইতে শিখেছিলেন। ১৭৫৬ সালে যে গোটা বাটেক ইংরেজ অন্ধকূপে বন্দী হয়, লাসিংটন ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। আবার যে তেইশজন পরদিন সকালে ব্ল্যাকহোল থেকে জ্যান্ত বেরোতে পেরেছিল, তাদেরও মধ্যে হলওয়েলের সঙ্গে লাসিংটনও ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের কদিন আগে উমিচাঁদকে ঠকাবার জন্যে ক্লাইভ যে জাল দলিল বেঁধেছিলেন সেটায় অ্যাডমিরল ওয়াটসন সই দিতে নারাজ হওয়ায় ক্লাইভ এই ছোকরা সিভিলিয়ন লাসিংটনকে দিইয়েই ওয়াটসনের নাম সই করিয়েছিলেন। লাসিংটন কলকাতা থেকে কাশিমবাজারের কুঠিতে বদলি হয়ে সে এখন সেইখানেই আছেন

মীর জাফর আর এক দণ্ডও বাড়ি থাকতে চাইলেন না। কোথায় থাকতে চান জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলে পাঠালেন, ... সাবুতজঙ্গের (ক্লাইভের) কাছে তার যাবার উপায় নেই তখন তিনি ... ইংরেজ গভর্নরের আশ্রয়ে থাকবেন। ভ্যানসিটার্ট তখন ... কলকাতায় তাঁর থাকার সব বন্দোবস্ত করে রাখবার জন্যে চিঠি লিখে দিলেন। বড়বাজারের গায়ে চিৎপুরে কাশিবিহারী শেঠ আর শোভারামের বসাকের দরুন যে দুখানা বাড়ি ছিল মীর জাফরের বাসের জন্যে কোম্পানীর তরফ থেকে সে-দুটো ভাড়া নেওয়া হল। ভ্যান্সিটার্ট মীর কাশিমকে ধরে মীর জাফরের জন্যে মাস মাস পঁচিশ হাজার টাকার মাসোহারা বরাদ্দ করিয়ে নিলেন। একবিন্দু রক্তপাত না করে এতবড় একটা ওলোট-পালোট কাণ্ড ঘটিয়ে তুললেন— তাইতে ভ্যান্সিটার্ট মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করে খুশি হয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। তার মতো ভালোমানুষ লোকেদের অতি অল্পেই তুষ্ট হতে দেখা যায়।

সেই রাত্রের মধ্যেই মীর জাফর কলকাতা যাবার জন্যে সব গোছগাছ করে ফেললেন। ঢাকার থেকে আনানো বজরা গঙ্গার ঘাটে লাগানো ছিল, তাতে গিয়ে উঠলেই হয়। অন্য অন্য পারিষদ পরিজনরা সবাই তৈরি হয়ে নিলেন।

কেবল তাঁর পাট-বেগম [illegible]ন আর ফতিমা বিবির মা—বুড়ো বয়সে অজানা-অচেনা জায়গায় যেতে রাজী হলেন না, জামাইয়ের ভরসায় মুর্শিদাবাদেই রয়ে গেলেন। সারা রাত ধরে ইংরেজ গোরারা মীর জাফরের বাড়ি পাহারা দিতে লাগল। রাতের অন্ধকারে জানলায় বসে বসে আবছায়া শহরের দিকে তাকাতে তাকাতে মীর জাফরের কি মনে পড়তে লাগল যে, ঠিক তিন বছর চার মাস আগে বাংলার মসনদের লোভে তিনি কি করে ইংরেজদের সঙ্গে সড করে তাঁর নিকট আত্মীয় সিরাজউদ্দৌলাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? সেই ঘটনারই তো আজ পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল। তফাত শুধু এই যে, তাঁর হাতে ধরা পড়ে সিরাজউদ্দৌলা অনেক কাকুতি-মিনতি করে প্রাণভিক্ষা চেয়েও কোনো ফললাভ করেননি, আর তিনি ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের কল্যাণে জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন। সেই কথা স্মরণ করেই কি তিনি ইংরেজদের আশ্রয়ভিক্ষা করলেন, নিজের নিকট আত্মীয়দের কাছে থাকতে সাহস পেলেন না?

ভোর হতেই দূর থেকে নহবতের স্বর কানে ভেসে আসতে লাগল। শহরময় নাকাড়া দামামা পিটে নকিবরা হেঁকে চলেছে—মীর মহম্মদ কাশিম আলী খাঁ নসরতজঙ্গ বাহাদুর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার হলেন। এতক্ষণে কি সেই পুরনো দরবারখানায় আবার সেই পুরনো অভিনয় শুরু হয়ে গেল? আবার কি ইংরেজরা সারবন্দী হয়ে মাথা নুইয়ে মীর কাশিমকে কুর্নিশ করছে, নবাব বলে অভিনন্দন জানাচ্ছে—ঠিক যেমনটি জানিয়েছিল তাঁকে, আজ থেকে ঠিক তিন বছর চার মাস আগে? ভাগ্যবিধাতার কি অমোঘ বিধান! নিয়তির কি নিদারুণ পরিহাস! যে বিষবৃক্ষ মীর জাফর নিজের হাতে পুঁতেছিলেন তার ফল তো তাঁকে নিতেই হবে, সে তো ফেলা যাবার কথা নয়। বৃদ্ধ মীর জাফরের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

পরদিন ইংরেজ পল্টনদের হেফাজতে তিনি ধীরে ধীরে বজরায় চড়ে মাঝিদের ডেকে নৌকো খুলে দিতে বললেন। বজরাগুলো সারবন্দী হয়ে কলকাতা চলল।

॥ পনরো ॥

সব-কিছুরই একটা শেষ আছে। অনেক ধুমধামের পর নতুন নবাবের অভিষেকপর্বেরও সমাপ্তি হল। নাচ-গান, বাজি রোশনাই, জশ্‌ন্‌ ঝাশ্‌ন্‌, উৎসব সমারোহের জের আর টানা চলে না। এইবার রাজকার্যে মন দিতে হয়। মীর কাশিম নবাব হয়ে সরকারী তোষাখানা খুলে দেখলেন, সেখানে নগদ আছে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা। আর আছে কতক সোনারুপোর বাসন-কোসন আর অল্পসল্প দামী সাজ সরঞ্জাম যা মীর জাফর তাড়াতাড়িতে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যেতে পারেননি। বাসনপত্র গালিয়ে মোহর টাকা করবার জন্যে সে-সব তখনি টাঁকশালে পাঠানো হল। সাজ সরঞ্জামগুলো গোপনে এদিক ওদিক বিক্রি হতে চলে গেল।

মীর কাশিম বেশ বুঝতে পেরেছেন, টাকার জোগাড় না হলে তার নবাবী একদণ্ডও টিঁকবে না। মীর জাফরের সঙ্গে করার বাবদ কোম্পানীর প্রাপ্য বাকি টাকা, মুর্শিদাবাদের নবাবী ফৌজের মাইনের বাকিবকেয়া—যার জন্যে তিনি নিজে থেকে জামিনদার হয়েছেন—পাটনায় ইংরেজ সেপাই-পল্টনের মাইনের দরুন বকেয়া পাওনা, সঙ্গে সঙ্গে নবাবী ফৌজের যে অংশ তখনো রাজা রাজবল্লভের কর্তৃত্বে পাটনায় বসে আছে, তাদেরও পাওনাগণ্ডা, এসব কতকটা করে এখনি চুকিয়ে দিতে না পারলে গদি রাখা দায়। তাছাড়া দক্ষিণ দেশে ফরাসী ইংরেজে যে লড়াই চলছে, তার খরচ বাবদ লাখ পাঁচেক টাকা দু-চার দিনের মধ্যে ইংরেজ গভর্নরের হাতে তুলে না দিতে পারলেও আর রক্ষা থাকবে না।

তাই রাজকোষ থেকে যেটুকু পাওয়া গেল, তার সঙ্গে নিজের ট্যাঁক থেকে বের করা খানিক টাকা জুড়ে দিয়ে আর বাকি টাকাটা শেঠেদের কাছ থেকে ধার নিয়ে মীর কাশিম তখন কাজ চালিয়ে নেবার মতো টাকাটা সংগ্রহ করে ফেললেন। সে-টাকা ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে একটু দম নেবারও ফুরসত পেলেন। কর্নেল ক্যাইলোড সাত লাখ টাকা হাতে গুণে নিয়ে পাটনা রওনা হয়ে গেলেন। শা আলম আবার পাটনা আক্রমণের উদ্যোগ করছেন, সেখানে কখন কি হয় তা বলা যায় না। ঐ সাত লাখের দু লাখ ইংরেজ ফৌজের দরুন,

আর পাঁচ লাখ মীর[illegible] তাদের নবাবী ফৌজের জন্যে। ইংরেজ ফৌজের বাকি পাওনা রইল আর পঞ্চাশ হাজার মাত্র। এখন থেকে তাদের খরচ চলবে বর্ধমান, মেদনিপুর আর চট্টগ্রাম—এই তিন জেলার মালগুজারির টাকা থেকে। মীর কাশিম তো ঐ জেলাগুলোর রাজস্ব কোম্পানীকেই লিখে দিয়েছেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টররা হুকুম পাঠিয়েছেন যে, কর্নেল ক্যাইলোড দক্ষিণে গিয়ে সেখানকার ইংরেজ ফৌজের ভার নেবেন, আর মেজর কারন্যাক তাঁর জায়গায় বাংলার ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার হয়ে থাকবেন ততদিন, যতদিন পর্যন্ত কর্নেল আয়ার কুট দক্ষিণে তার কাজ সেরে বাংলাদেশে চলে আসতে না পারছেন। মেজর কারন্যাক ছুটি নিয়ে বন্ধুবর ক্লাইভের সঙ্গে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথে সেণ্টহেলেনায় নামতেই অর্ডার হাতে পেলেন। তাকে আবার বঙ্গদেশে ফিরে যেতে হবে। কারন্যাক আর কি করেন? কোম্পানীর হুকুম তো মানতেই হয়। ক্ষুণ্ণ মনে ক্লাইভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কলকাতার জাহাজ ধরলেন। কলকাতায় নেমে তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে গিয়ে ক্যাইলোডের সঙ্গ নিলেন। গভর্নর ভ্যানসিটার্ট কর্নেল ক্যাইলোডকে আরো কিছুদিনের জন্যে বাংলাদেশে ধরে রাখলেন। পাটনায় রাখা ইংরেজ ফৌজের একটা ভালোরকম বিলিব্যবস্থা করে, কারন্যাককে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে তবেই তিনি রেহাই পেয়ে মাদ্রাজে ফিরে যেতে পারবেন—এই রকম বন্দোবস্ত হল। মেজর কারন্যাকও দলের সঙ্গে পাটনা চললেন।

কর্নেল ক্যাইলোড আর মেজর কারন্যাককে পাটনা রওনা করিয়ে দিয়ে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট সেইদিনই কলকাতা যাত্রা করলেন। দক্ষিণে লড়াইয়ের খরচ চালাবার জন্যে তিনও পাঁচ লাখ টাকা হাতে পাওয়াতে মন তার বেশ প্রফুল্ল আছে। মীর জাফরকে ঐ রকম করে গদিচ্যুত করাতে তাঁর মনের ভিতরটা কেমন যেন একটু খচখচ করছিল, টাকা হাতে পেয়ে সে সব কোথায় দূর হয়ে গেল। তিনি খুশি মনে তাঁর বইয়ে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, মীর কাশিম যে-রকম মন দিয়ে রাজকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন তাতে মনে হয়, তিনি দুদিনেই দেশের হাল ফিরিয়ে ফেলতে পারবেন। বিদায়কালে নবাবকে ডেকে খানিকটা সদুপদেশও ঝেড়ে গেলেন—প্রজার সুখবৃদ্ধি করাই নবাবের প্রধান কর্তব্য। প্রজার ভক্তি-ভালোবাসার উপরই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলে তবেই তো সেটা টেকসই হয়।

কিন্তু মীর কাশিমের তখন এমনি খাঁকতির দশা যে, ওসব সদুপদেশ তাঁর

কানেই গেল না। কিসে দু-পয়সা তাড়াতাড়ি আমদানি হয়, তিনি তারই ফিকিরে ঘুরতে লাগলেন। রাজভাণ্ডার তো একেবারে শূন্য, অথচ টাকার নিতান্ত দরকার। সুতরাং যারই কাছে টাকা আছে তারই ঘাড় মটকিয়ে তিনি টাকার জোগাড় করা সাব্যস্ত করলেন। কথাটা শুনতে একটু খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু যাঁরই হাতে যখন ক্ষমতা এসেছে, তিনিও তো ঐ একই পন্থা অবলম্বন করেছেন—দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের কপালগুণে আবহমান কাল থেকে এই ব্যাপারই তো সেখানে সদাসর্বদা ঘটতে দেখা গেছে। এরই এক মনোহারী নাম—আপদ্ধর্ম। নবাব মীর কাশিম সেই ধর্মই পালন করতে সাব্যস্ত করলেন। কবি সাদী তাঁর মহাকাব্য গুলিস্তানে লিখেছেন—সবার কাছে একটু একটু আদায় হলে তবেই তো ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে। মীর কাশিম ফার্স্ট ক্লাস ফার্সী স্কলার। ছেলেবয়সে ভুলে ভুলে বহুবার গুলিস্তানের শ্লোক আউড়িয়েছেন। এ-নীতি তিনি অনুসরণ করবেন না তো আর কে করবে?

মীর কাশিমের প্রথম কোপ পড়ল মীর জাফরের তিন মন্ত্রী—কেনারাম, মুন্নালাল আর চুনিলালের উপর। তারা রাতারাতি ভালোমানুষ সেজে গিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, তাদের হাত দিয়ে সরকারী যে-টাকা আনাগোনা করেছে, সে-সবই তারা নবাবের তোষাখানায় মজুত করে দিয়েছে, হাতে একটা পয়সাও রাখেনি। জবাবে মীর কাশিম একটি কথাও না কয়ে তিন মূর্তিকে ধরে সোজা কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের বাড়িঘরদোর ক্রোক করে তাদের সব সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। বিস্তর টাকা ঘরে উঠে এল। মীর জাফরের আমলের একটিও রাজকর্মচারী পার পেলেন না, সবাইকার পিছনেই মীর কাশিম এক এক করে অডিটর লাগিয়ে দিলেন। নতুন নবাবের হরিহরাত্মা আলী ইব্রাহিম, আর তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট সীতারাম, অডিটিং ব্যাপারে ঝানু ব্যক্তি। হিসেব যতই প্যাঁচালো হোক না কেন, তার জট ছাড়িয়ে তার থেকে ছল বের করতে এঁদের মতো ওস্তাদ শুধু তখন কেন, এখনকার দিনেও -যখন অডিটিং একটা মস্ত ফাইন আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে—সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে হল কি, নবাবের খাজাঞ্চিখানায় হু হু করে টাকা এসে জমা পড়তে লাগল।

নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলের পুরনো রাজকর্মচারীরা—যাঁরা অনেক দিন হল রিটায়ার করে ঘরে বসে একটু আরাম করছিলেন তাঁরাও—নতুন নবাবের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। মীর কাশিম তাঁদেরও উৎখাত করে মারলেন। তাঁর ধারণা, রাজকর্মচারীদের হাতে টাকা থাকা মানেই সে-টাকা সরকারী টাকা

তছরূপ-করা টাকা, সুতরাং সেই টাকা তাঁদের ট্যাঁক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেখানকার জিনিস সেইখানেই ফেরত পাঠিয়ে দিলে, তাতে অন্যায় কিছু হয় না। মীর কাশিমের ধারণাটা যে একেবারে আজগুবি, তা ঠিক বলা চলে না। তবে এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটাও কোনো কাজের কথা নয়। তাছাড়া তামাদি বলেও তো একটা জিনিস আছে? সেটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করলে চলবে কেন?

রকমসকম দেখে জগৎসিংহ বলে আলীবর্দী খাঁর এক পুরনো কর্মচারী অনেক বছর ধরে জমানো নিজের যা-কিছু বিষয়-আশয় নগদ টাকাকড়ি ছিল, সে-সবেরই এক ফর্দ বানিয়ে মীর কাশিমের কাছে দাখিল করে দিলেন। লিস্ট দেখে নবাব-বাহাদুর তো চমকে গেলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি জগৎসিংহের অত টাকা। তা হবে না কেন? জগৎসিংহ তো বড় কম দিন ধরে মহারাজা জানকীরাম আর তস্য পুত্র রাজা দুর্লভরামের তাবে দেওয়ানি করে আসেননি—অতটা সময় কি তিনি বৃথাই নষ্ট করেছিলেন? যাই হোক, ঠিকঠাক ফর্দ দেওয়ায় জগৎসিংহের ধন বাঁচলো না বটে, কিন্তু নবাবের দরবারে তাঁর মানটা অনেক বেড়ে গেল। মীর কাশিম তাঁর বারো আনা সম্পত্তি আত্মসাৎ করে চার আনা অংশ তাঁকে রাখতে অনুমতি দিলেন আর সেই সঙ্গে বিস্তর খাতির করে দরবারে নিজের ঠিক বাঁ পাশেই তাঁর বসবার ঠাঁই করে দিলেন। যথা লাভ।

এইসব কাজের সুবিধার জন্যে মীর কাশিম একটা ভদ্রলোক স্পাই-এর দলও খাড়া করলেন। তারা সবাই ভালোঘরের ছেলে, সম্ভ্রান্ত সমাজের সর্বত্রই তাদের গতিবিধি। তারা কেউ কেউ নিজে সরকারী কাজে থাকায় দপ্তরের কোথায় কি গলদ, তা টক টক করে বলে দিতে পারে। ওদের কাজই হল, সারা শহর চষে খবর আনা, কার কাছে কতটা গুপ্তধন আছে। এদের জ্বালায় চারিদিকে এক ঘোর আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কারণ, এদের সব খবরই যে সত্যি খবর তা তো নয়, অনেক উড়ো খবরও এরা চালান করে। কিন্তু তখন সত্যি-মিথ্যে যাচায় কে? নবাবের যে শুধু দেহি দেহি রব। স্পাইরা খবর এনে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। কিছু-না-কিছু দণ্ড না দিয়ে কারো নিস্তার নেই। কিন্তু কারা যে খবর চালাচালি করে, অনেক দিন তা কেউ ধরতে পারেনি। অবস্থা এমনই হল যে, লোকে তাদের প্রাণের বন্ধুকেও পরম শত্রু বলে মনে করতে লাগল।

একবার চরেরা এসে খবর দিয়ে গেল যে, মীর জাফর আর মীরনের রক্ষিতা

গণিকারা সোনাদানা, হীরেজহরত, মণিমুক্তো, দামী দামী সাজসজ্জা আসবাবপত্র বিস্তর সরিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মজুদ করেছে। তারা বকশিশ যা পেয়েছে সরিয়েছে তার চতুর্গুণ। আর যায় কোথায়? শহরের কোতোয়াল রাতারাতি তাদের বাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভয় দেখিয়ে যা-কিছু পাওয়া গেল সবই উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নবাবের গুদামজাত করা হল। নবাববাড়ি ছাড়া বড-বড় আমীর-ওমরাও শেঠ-সওদারগবদের কাছ থেকেও বেচারীরা যা-কিছু পেয়েছিল কোতোযালের তাডাব চোটে তা-সুদ্ধ উগরে দিতে হল।

নবাব মীর কাশিম এবার জমিদারদের নিয়ে পডলেন। জমিদারী প্রথার উপর মীব কাশিমের অনেক দিন ধবেই ঘোর অনাস্থা। তিনি বরাবরই জমিদারী উচ্ছেদেরই পক্ষপাতী। কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে একটু একটু কবে খাজনা আদায়ে তখন অনেক অসুবিধা। তার উপর তসিলদারদের তছরূপ কাবচুপি কারসাজিও অনেক রকমের আছে। অ্যাডমিনিসট্রেশন চালাবার ভালো লোক তখন হাতের কাছে বেশি ছিল না। তাই রাজস্ব আদায়ের জন্যে একদল মধ্যবর্তী লোককে—অর্থাৎ জমিদারকে, দায়ী রাখা ভালো মনে করে মীব কাশিম আপাতত উচ্ছেদ-ব্যাপাবে অগ্রসর হলেন না। তার বদলে উত্তরবঙ্গের শাঁসালো জমিদাবদের কাউকে কযেদের ভয় দেখিয়ে, কারো জমিদারী কেডে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেবাব ভয় দেখিয়ে, আবার কাউকে মুসলমান কবে জাত মারবার ভয় দেখিয়ে, মীর কাশিম তাদের দেয় জমার খাজনার পরিমাণ ডবল বাডিয়ে নিলেন। পূর্ববঙ্গকে নবাব-বাদশারা তখনো খানিকটা পাণ্ডববর্জিত দেশ বলেই মনে করতেন। সেখানকার দুর্ধর্ষ ডাকাতে জমিদারদের জব্দ করার জন্যে মহম্মদ রেজা খাঁর মতো এক জাঁদরেল ডেপুটি গভর্নবের হাতে তাঁদের ছেডে দেওয়া হল। তাতে ফল কিছু খারাপ পাওয়া যায়নি।

বাকি রইল পশ্চিমবঙ্গ। সেখানকার সবচেয়ে বড দুটো জেলার—বর্ধমান আর মেদনিপুরের—রাজস্ব তো এখন ইংরেজদেব ভোগে লাগছে। বর্ধমানরাজের পরই ধনে-মানে বিখ্যাত নদিয়ারাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। অত্যাচারের ভয়ে তিনি কলকাতায় ইংরেজ এলাকায় পালিয়ে গিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত খুব সুবিধা করতে পারলেন না। মীর কাশিমের জুলুম তাঁকে মেনে নিতেই হল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজও গোড়ায় একটু তড়পে ছিলেন, কিন্তু শিগগিরই কাবু হয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। কেবল

এক বীরভূমের রাজা আসাদ জমান খাঁ হার না মেনে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন।

সুবে বাংলারই অন্তর্ভুক্ত আরো দুটি প্রদেশ—বিহার ও উড়িষ্যা। উড়িষ্যা তখন মারাঠাদের অধিকারে, সুতরাং তার সম্বন্ধে কোনো কথা ওঠে না। বিহারের ডেপুটি গভর্নর রামনারায়ণ তাঁর অধীনস্থ জমিদারদের সঙ্গে সবসময় পেরে ওঠেন না। তাঁরা তাক বুঝে কখনো বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, কখনো বা ঠাণ্ডা থেকে খাজনা কিছু দেন। শা আলমের বছরের-পর-বছর অভিযানের ফলে বিহারপ্রদেশ ইদানীন্তন সুশাসনে রাখা বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। মীর কাশিম স্থির করলেন, ঐদিকে শিগগিরই মন দেওয়ার দরকার, কিন্তু তার আগে বীরভূমরাজকে শায়েস্তা না করলেই নয়। তাঁর রাজত্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদের একেবারে গায়ে লাগাও, সেখানে একটা বিদ্রোহী ছেড়ে রাখা মহা বিপজ্জনক।

বীরভূমের জমিদারদের পূর্বপুরুষরা রাজপুত। কোনো-এক সময়ে তাঁদের একজন কে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বীরভূমের জমিদারিটি হস্তগত করেন। বীরভূমের চারিদিক শালের জঙ্গল আর কাঁকরের ঢিবি দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সেখানকার জমিদাররা পুরুষানুক্রমে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করে এসেছেন। তাঁরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বোধ হয় পূর্বসংস্কারবশত অনেক হিন্দু আচাব একেবারে বর্জন করে উঠতে পারেননি। হিন্দু জমিদারদের মতো নিজেদের তাঁরা রাজা বলে অভিহিত করতেন, বেগমদের ডাকতেন রানী বলে। খাওয়া-দাওয়ায়, বিবাহ-ব্যাপারে, উৎসব-আনন্দেও হিন্দুয়ানি চাল অনেকটা বজায় রেখেছিলেন। এই বংশের বাদী-উস্-জমান মুর্শিদ কুলী খাঁর আমল থেকে বীরভূমে রাজত্ব করে আসছেন। তিনি মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন, আবার নবাবের সৈন্যসামন্ত তাড়া করে এলে খানিক শান্ত হয়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। ছেলেবয়স থেকেই ইনি বিলাস-ব্যসনে দিলদরিয়া হয়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বুড়ো বয়সে চোখের সামনে উপযুক্ত বড় ছেলের মরণ হওয়ায় তিনি ছোট ছেলে আসাদ জমানকে গদি ছেড়ে দিয়ে ফকিরেব বেশ ধারণ করে বিবাগী হয়ে নির্জনে বসবাস করতে থাকেন।

মীর কাশিম এই আসাদ জমানের কাছ থেকে তাঁর দেয় ন্যায্য খাজনার উপর অনেক বেশি করে টাকা চাপিয়ে দিয়ে রাজস্ব চেয়ে পাঠালেন। ন্যায্য করের উপর অতিরিক্ত টাকা একবার দিলে সেটা করের সঙ্গে যোগ হয়ে

বরাবরই বেশি টাকার খাজনা দিতে হবে বুঝে, আসাদ জমান কোনো টাকাই দিলেন না। সুতরাং যুদ্ধ বেধে গেল। ভ্যান্সিটার্ট কলকাতা ফেরবার আগে মীর কাশিমের সাহায্যের জন্যে মেজর ইয়র্ককে মুর্শিদাবাদে রেখে গিয়েছিলেন। এখন বীরভূমরাজের সঙ্গে লড়াই বাধে দেখে তিনি বলে পাঠালেন যে, ইংরেজ গোরা পল্টনদের নবাব আপনার কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু মীর কাশিম ঐ সামান্য ব্যাপারে নবাবী ফৌজই যথেষ্ট হবে মনে করে তাঁর একদল সেপাইকে মহম্মদ তকী খাঁর অধীনে বীরভূম পাঠিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদের কুড়ি মাইল দক্ষিণে বুধগ্রামে তাদের ছাউনি পড়ল।

আসাদ জমান খাঁরও লোকবল কিছু কম যায় না। তিনি সব গুছিয়ে নিয়ে তাঁর রাজধানী নগর—আজকালকার রাজনগর—থেকে বেরিয়ে কাড়োয়ারের জঙ্গলে ঢুকে সেখানে আস্তানা গাড়লেন, আর বন থেকে রোজ একবার করে বেরিয়ে নবাবী সৈন্যদের ঘাড়ে আচমকা লাফিয়ে পড়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। মীর কাশিম যখন দেখলেন নবাবী ফৌজ একটা জমিদারের সেপাইদের কাছে হেরে যাবার জো হয়েছে তখন তিনি আর থাকতে পারলেন না, মুখরক্ষার জন্যে তাঁকে সেই ইংরেজদেরই শরণাপন্ন হতে হল। মেজর ইয়র্ক কামান নিয়ে সামনে থেকেই বনের মধ্যে আসাদ জমানকে তেড়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন ওয়াইট বর্ধমানে ছিলেন, তাঁকেও খবর দেওয়া হল। তিনি চুপিচুপি এগিয়ে এসে নিঃসাড়ে পিছন থেকে আসাদ জমানের ক্যাম্পের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পড়েই সঙ্গে সঙ্গে দুড়ুমদাড়াম গোলাগুলি চালাতে লাগলেন। কামানগর্জনের শব্দ পেয়ে মেজর ইয়র্কও সেদিকে দৌড়ে গিয়ে রাজার ক্যাম্প ঘেরাও করে ফেললেন। আসাদ জমানের তখন আর যুদ্ধ না দিয়ে বেরোবার উপায় রইল না। ঘণ্টাখানেক ধরে খুব লড়াই চলল। তার পরেই আসাদ জমানের সৈন্যসামন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল সেদিকে পালাল।

কাড়োয়ারের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে বেদম মার খেয়ে আসাদ জমান একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। নবাবের কাছে মাফ চেয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন। অমন কাজ আর কখনো করবেন না বলে খেসারত দিয়ে তবে রেহাই পেলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মীর কাশিমকে সেই খেসারত থেকে খানিক টাকা বকশিশ হিসেবে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে বেঁটে দিতে হল। চতুর নবাব বেশ বুঝলেন, নবাবী ফৌজ দিয়ে আর যা-কিছু করা যাক না কেন, যুদ্ধজয়ের আশা মোটেই করা যায় না। তাদের নিয়ে তাঁর নবাবী করা চলতে পারে,

কিন্তু রাজত্ব করা চলবে না। খোল নলচে বদলে মীর কাশিম তাঁর ফৌজ আগাগোড়া ঢেলে সাজানো মনস্থ করলেন। বেশ বুঝলেন, তা না করতে পারলে মীর জাফরের মতো তাঁকেও চিরকাল ইংরেজদের দাসত্ব করে মরতে হবে। আর তাই-ই যদি করতে হয় তো অত তোড়জোড় করে নবাবী গদি নেবারই বা কি দরকার ছিল? মীর কাশিম ঐদিকে ভালো করেই মন লাগালেন।

আরো-একটা কাজ মীর কাশিম করলেন। সরকারী সমস্ত বাজেখরচ একেবারে মূলে হাবাত করে ছাড়লেন। তিনি গণিতের মেধাবী ছাত্র, অঙ্কের হিসেব সবসময় তাঁর মাথায় বিজবিজ করছে। তিনি জানতেন, চৌবাচ্চায় যতই জল ঢালা যাক না কেন, ফুটো দিয়ে ক্রমাগত জল চোঁয়াতে থাকলে জল সেখানে কখনোই থিতয় না। তিনি ফুটো বন্ধ করতে লেগে পড়লেন। প্রথমে সরকারী দপ্তরে যে-কটা লোক না রাখলেই নয়, নিতান্ত কাজ অচল হয়ে পড়ে, ঠিক সেইকটা লোক রেখে বাকি সবাইকে হাতে হাতে জবাব দিয়ে দিলেন। সিভিল মিলিটারী সবরকম খরচের দিনকের দিন অডিট হতে লাগল যাতে একটি পয়সারও যেন গড়বড় না হয়। নবাবী দানখয়রাত, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-আয়োজন, বিলাস-ব্যসন সবই একে একে বন্ধ হয়ে গিয়ে সব যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল।

আলীবর্দী খাঁ পশুপক্ষী বড ভালবাসতেন, তাই তাঁর আমলে মুর্শিদাবাদে একটা বড়গোছের জু গডে উঠেছিল। কিন্তু তাতে তো খরচ বিস্তর। মীর কাশিম মাতব্বর জমিদারদের কাছে সমস্ত জীবজন্তু বিক্রি করে দিয়ে ঐ ডিপার্টমেণ্টকে ডিপার্টমেণ্টই তুলে দিলেন। বাংলার নবাবরা গোঁড়া শিয়া, মহরমের সময় খুব ঘটা করেই তাঁদের তাজিয়া বেরত। মীর কাশিম নবাব হয়ে এককথায় তা বন্ধ করে দিলেন। ইমামবাড়াগুলোতে যে-সব সরকারী দান ধরা ছিল, তা আর বেরল না। বরং সেখানকাব সোনারুপোর জিনিসপত্র যা-কিছু ছিল তা সব উঠিয়ে নিয়ে এসে নবাবী তোষাখানায় জমা করে দেওয়া হল।

• মীর কাশিম তাঁর আপন শ্বশুরকেও ছাড় দিলেন না। মীর জাফরের মাসোহারা কমাবার জন্যে তিনি উঠে পড়ে বিষম জেদাজেদি লাগিয়ে দিলেন। ইংরেজ গভর্নরকে জানালেন, গদিচ্যুত নবাবকে মাসে দু-হাজার টাকা করে পেনসন দিলেই যথেষ্ট, ওরকম অন্য অনেক নবাব আছেন যাঁরা তো একেবারে কিছুই পান না। বিস্তর ধ্বস্তাধ্বস্তি করে মীর জাফরের মাসোহারার টাকা

পঁচিশ হাজার থেকে মীর কাশিম দশ হাজারে নামালেন। গভর্নর ভান্‌সিটার্ট সেটাকে আর কমাতে দিলেন না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি ওটাকে কিছুতেই পনরো হাজারে ওঠাতে পারলেন না। আজকালকার দিনের ডিফিসিট বাজেট ফাইনান্সিং-এর রহস্য তখনকাব দিনে জানা ছিল না, থাকলে অবশ্য মীর কাশিমের অত তকলিফ ওঠাতে হত না।

কিন্তু এতসব করেও মীর কাশিম শেষরক্ষা কবতে পাবলেন না। তাব কারণ, চরিত্রে যে-সব গুণ থাকলে বড একটা কিছু গডে তুলতে পারা যায়, মীর কাশিমের চরিত্রে তার অনেক অভাব ছিল। মীর কাশিম শরীরে ক্ষীণ খর্ব, মনও তাঁর দুর্বল ভীতু। ফলে তিনি যা-কিছু করতে যেতেন, তাতে একটা সামঞ্জস্য বক্ষা করে উঠতে পারতেন না, সর্বদাই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলতেন। এই ধাতের লোকেরা প্রায়ই প্রচণ্ড রকমের নির্দয় নিষ্ঠুর হন। সেটা অন্য আব কিছু নয়, ওটা তাঁদের দর্বল প্রকৃতিরই একটা লক্ষণ মাত্র, তাঁরা নিজে যদিও সেটাকে পৌরষেরই চিহ্ন বলে মনে করেন। প্রকৃতিগত বলহীনতাব দরুন ফলিত-জ্যোতিষে তাঁদের অগাধ বিশ্বাস। আস্থা এতই বেশি যে, একবার কুষ্টিবিচার না কবিয়ে কিম্বা হাত না গুণিয়ে তাঁরা কোনো কাজে একপাও অগ্রসব হন না,—তা সে কি রাজকার্যে আর কি সাংসারিক ব্যাপাবে। গ্রহকে নির্বিচারে মেনে চলেন বলে তাঁরা সহজে শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন না, চালাকি বুদ্ধির দ্বারাই সব মেরে নেবাব ফিকিরে ঘোরেন। তাদেব চবিত্রের আব-এক নিদর্শন হচ্ছে বিদঘুটে-রকমের এক সন্দেহ-বাই। যেখানে সন্দেহের কোনো কারণ নেই সেখানেও তাঁদের ঘোর সন্দেহ। ফলকথা এই যে, মীর কাশিম খানিকটা দূর উপরে উঠে তার উর্দ্ধে আর উঠতে পারলেন না, বড হতে-হতে রয়ে গেলেন, হতে পারলেন না। কিন্তু মীর কাশিম যে বড হতে চেষ্টা করেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা কিম্বা মীর জাফরের মতো হাত গুটিযে বসে থাকেননি, সেইটেই হল তাঁর চরিত্রের একটা মস্ত বড দিক।

॥ ষোলো ॥

দেখতে দেখতে সন ১৭৬১ সাল এসে পড়ল।

গত বছর যে-সময় ইংরেজদের হাতে বাংলাদেশের নবাবী গদি নিয়ে ওঠবোস খেলা চলেছে, ঠিক ঐ সময় ভারতবর্ষের উত্তরাপথে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয়ের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই পালার শেষ অভিনয় সাঙ্গ হল ১৭৬১ সালের গোড়ায়—তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে। তার সঙ্গে আমাদের এই প্রসঙ্গের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ যদিও খুব বেশি নয় বটে তবু এই বিপত্তিরই ফলে পরোক্ষে বঙ্গদেশে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে গিয়েছিল।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময় ইংরেজদের আগে বাড়বার পথে মারাঠারাই ওরই মধ্যে যা-একটু কিছু বাধার সৃষ্টি করতে পারত, কিন্তু দুরানীরাজ আহমদ শা আবদালী পানিপথের মাঠে তাদের ধরে এমনি এক মার লাগালেন যে ঠিক সে-রকম দারুণ মার তারা আর কখনো খায়নি—না এর আগে, না এর পরে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধশেষে দেখা গেল, এমন কোনো মারাঠা পরিবার নেই যে সে-পরিবারের কাউকে-না-কাউকে এই মহারণে প্রাণ দিতে হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বংশের গোটা একপুরুষকে পুরুষ মরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার পর প্রায় দশ বছর আর মারাঠাদের মাথা তুলতে হয়নি। যখন তুলতে পারল তখন দেখা গেল কাবুলীরা এদেশের পলিটিক্স থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার জায়গায় আর-এক বিদেশী শক্তি ছুঁচ থেকে ফাল হয়ে বেরিয়ে পড়ে সবাইকার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। এই কয় বছরে ইংরেজরা এতই উপরে উঠে গেছে যে, তাদের ঠেকায় এমন ক্ষমতা এদেশে আর কারো রইল না—না আলাদা করে, না জোট বেঁধে একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে।

যেদিন পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠারা কাবুলী পাঠানদের হাতে ঐ হাড়-গোড়-ভাঙা মার খেল, ঠিক তার পরদিন, অর্থাৎ ১৭৬১ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে, মোহানী বলে বিহারের একটা নগণ্য নদীর পাড়ে বাদশা শা আলমও ইংরেজদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে সে স্থান ছেড়ে পালালেন।

উপরি উপরি দু-দুবার বঙ্গবিজয়ে বিফল হয়েও শা আলম জয়ের আশা একেবারে ছাড়েননি, বরং ঐ বিষয়ে তাঁর জেদ যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ১৭৬০ সালের বর্ষার পর শরৎকাল পড়তেই তিনি বিজয়যাত্রার তোড়জোড় করতে লেগে গিয়েছিলেন। তখন মীর জাফরের নবাবী যায় যাঁয় অবস্থায়, সুবে বাংলাকে তখন এক অরাজক দেশ বললেও কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। এই সুযোগ নিয়ে বিহারের অনেক বড়-বড় জমিদার শা আলমের দিকে চলে গেলেন। নবাবী ফৌজের অনেক সেপাই নবাবী চাকরী ছেড়ে বাদশাহী নোকরি ধরল। তার পর থেকে শা আলমের দল রোজই একটু করে বেড়েই চলেছে, কিন্তু সে-দল গুণতিতে ভারী হলেও কাজের কাজী একটুও নয়। যাই হোক এর মধ্যে বিহারপ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের কতক জায়গা একে একে শা আলমের দখলে এসে গেল, তিনি সেখানকার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে পকেটভর্তি করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজ কমাণ্ডার কর্নেল ক্যাইলোড মাদ্রাজ চলে গেছেন, তাঁর জায়গায় মেজর কারন্যাক এখন বাংলায় ইংরেজ ফৌজের সর্দার। তিনি যখন শুনলেন, শা আলম পাটনা দখল করবার জন্যে সদলবলে বেরিয়ে পড়েছেন, উত্তরের দিকে অনেকটা এগিয়েও এসেছেন, তখন তিনিও তৈরি হয়ে নেবার উপক্রম করলেন। দেখা গেল, নবাবী সেপাইরা পাওনাগণ্ডার অনেকটাই হাতে পেয়ে গিয়েও তেমন খুশি নয়, তখনো কেমন যেন মারমুখো হয়ে আছে। তাদের দুই কর্তারও মধ্যে একটুকুও বনিবনা নেই। কায়স্থ রাজা রামনারায়ণ ভাবেন তিনিই সর্বেসর্বা, আবার বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ মনে করেন তিনিই তো বড়কর্তা। দুজনের মধ্যে সর্বদাই বাদবিসম্বাদ রেষারেষি লেগে আছে, কিছুতেই তাঁরা কোনো বিষয়ে একমত হন না।

ব্যাপার দেখে মেজর কারন্যাক বিরক্ত হয়ে উঠে নবাবী ফৌজের তোয়াক্কা না রেখে কেবল ইংরেজ সেপাই-পল্টন নিয়েই পাটনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাই দেখে, নবাবী সৈন্যরাও সুড়সুড় করে তাদের পিছন পিছন এগিয়ে চলল। ভয় আছে, পাছে ইংরেজ কাছে না থাকলে একা পড়ে গিয়ে, তাদের কপালে একটা হিতেবিপরীত কাণ্ড না কিছু ঘটে যায়। বিপদের মুখে পড়লে তারাও ইদানীন্তন ইংরেজদের উপরই ভরসা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল।

চলতে চলতে শা আলম যেখানে সৈন্য সাজিয়ে বসেছিলেন মেজর কারন্যাক তারই কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। তখন আর-একটুও দেরি না করে তিনি ইংরেজ গোলন্দাজদের জোর জোর কামান দাগতে হুকুম দিলেন। লড়াই বেশ

জমে উঠেছে এমন সময় ইংরেজদের কামান থেকে একটা ছ-সেরী গোলা ছুটে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে খোদ বাদশার হাতির মাথার উপরেই গিয়ে পড়ল। মাহুত তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়ে কোথায় যে ছিটকে পড়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল তার আর কোনো ঠিকানাই পাওয়া গেল না। হাতি একে গোলা লাগার চোটে যন্ত্রণায় অস্থির, তার উপর আবার মাহুতের বাঁধনছাড়া, বাদশাকে পিঠে নিয়ে সে এমন জোর দৌড় মারল যে কেউ আর তাকে রুখতে পারে না। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে বাদশাহী বীরেরা মনে ভাবলেন, তবে বুঝি তাঁদের হয়ে গেছে, আর নিশ্চয় তাইতেই বাদশা 'চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা' বলে সে-তল্লাট থেকে সটকান দিচ্ছেন। ব্যাস্, আর ভাবনাচিন্তা নয়, কোনো খোঁজ-খবর নেওয়া নয়, লড়াইয়ে ইস্তফা দিয়ে সেপাইরা সটান রাইট-আবাউট-টার্ন নিয়ে ডবল কুইক মার্চ লাগিয়ে দিল।

যুদ্ধক্ষেত্র সাফ। শুধু কামানের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফরাসী ক্যাপ্টেন জাঁ ল, আর তাঁরই অধীনস্থ গোটাকয়েক ফরাসী পল্টন আর তাদের কজন অফিসর। মোগলদের কাণ্ডকারখানা দেখে ল-সাহেবের হরিভক্তি উড়ে গেছে। তিনি মনে মনে ঠিক করেছেন, আর না, ওদের সঙ্গে আর না। হয় লড়াই করতে করতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণে চলে যাবেন, নয় সে-যাত্রা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেবেন। ফরাসীদের যুদ্ধের উদ্যোগ করতে দেখে ইংরেজ পল্টনরা এগিয়ে গিয়ে তাদের চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ফরাসী গোরারা বেগতিক দেখে সবাই সরে পড়ল, পড়ে রইলেন কেবল ল-সাহেব নিজে আর জনদশেক ফরাসী অফিসর—তাঁদের প্রত্যেকের হাতে শুধু একটা করে তলোয়ার।

খানিক দূর থেকে ঐ দৃশ্য দেখে মেজর কারন্যাক তাঁর পল্টনদের থামতে ইঙ্গিত করে ক্যাপ্টেন নক্‌সকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ল-এর কাছ-বরাবর এসে টুপি তুলে অভিবাদন করে সবিনয়ে তাঁকে আর তাঁর সঙ্গীদের অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তলোয়ার ছাড়তে ফরাসীরা কেউই রাজী হলেন না। তখন ইওরোপীন যুদ্ধরীতি-অনুসারে তলোয়ার-সুদ্ধ তাঁদের প্রিসনর অভ্ ওয়ার হিসেবেই বন্দী করা হল। ইংরেজ পল্টনরা সবাই এই বীরপুরুষদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। মেজর কারন্যাক অতি সমাদরেই এই ফরাসী যোদ্ধাদের থাকার জন্যে নিজের পাশের তাঁবুগুলোতে তাঁদের জায়গা করে দিলেন। শত্রুর সঙ্গে ইংরেজদের এইরকম ব্যবহার দেখে দেশী লোকেরা তো সবাই অবাক।

বাদশাহী ফৌজের পিছন পিছন ইংরেজদের যে-সব সেপাই-পল্টন তাড়া করে গিয়েছিল, মেজর কারন্যাক তাদেরও সবাইকে ক্যাম্পে ফিরতে অর্ডার দিলেন। নবাবী সেপাইরা এতক্ষণ ইংরেজদের পিছনে গা-আড়াল করে হাত-পা গুটিয়ে তামাশা দেখছিল। তাদেরও বাদশাহী সৈন্যের পিছনে ধাওয়া করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা নড়েনি। বিদেশ-বিভূঁয়ে কারন্যাক তাঁর সৈন্যদের একা একা ক্যাম্প ছেড়ে খুব বেশি দূরে গিয়ে বেঘোরে পড়তে দিতে চাইলেন না। তাছাড়া মেজর-সাহেব যুদ্ধে অফেনসিভ নিয়ে তেড়ে যাওয়াটা তত পছন্দ করতেন না। তিনি একটু আয়েশী লোক, ডিফেনসিভ অ্যাকশনই তাঁর ভালো আসে। ইংরেজ সেপাই-পল্টন ক্যাম্পে ফিরে গেল। লড়াইয়ে জিতলেও পুরো জিত তাদের হল না।

ওদিকে শা আলমের সৈন্যদের সামান্যই ক্ষতি হয়েছিল। পালানোর দরুন অনেকেই বেঁচে গিয়েছিল। শা আলম খানিক দূর হটে গিয়ে তাদের আবার একজোট করলেন। ঐখানে ইংরেজদের দূত হয়ে এসে রাজা সিতাব রায় বাদশার তাঁবুতে দেখা দিলেন। আগুপিছু তিনবার কুর্নিশ করে দস্তুরমতো নজরআনা পেশ করে তিনি অতি মোলায়েম স্বরে বিনীতভাবে বাদশাকে জানালেন যে, ইংরেজরা যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে সন্ধি-শান্তিই পছন্দ করে বেশি। দুপক্ষ যাতে নির্বিবাদে থাকতে পারে মেজর কারন্যাক তারই একটা ব্যবস্থার জন্যে তাঁকে হুজরত বাদশার কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে সন্ধির শর্তগুলো আগের থেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারা যায়। এখন হুজুরের যা মর্জি। সন্ধি একটা করতে শা আলমের একটুও অনিচ্ছা ছিল না। তিনি সেই যে বছর তিনেক আগে দিল্লি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আর দিল্লির মুখ দেখেননি। এর মধ্যে কত কি যে ঘটে গেল, কত ওলোট-পালোট কত বিপ্লব-বিপর্যয়। শা আলমের মন দিল্লিতেই পড়ে আছে, বাদশাহী তখ্‌তের জন্যে দিনরাত তাঁর মন কেমন করছে।

কিন্তু সন্ধির কথাটা আর-একটুও এগোতে দিলেন না বাদশার মন্ত্রণাদাতা কামগড় খাঁ। যুদ্ধ চললেই তাঁর বৃদ্ধি, সন্ধিতে বাদশার লাভ হতে পারে, কিন্তু তাঁর তো ক্ষতির একশেষ। সিতাব রায়কে বিফলেই ফিরতে হল। যাবার আগে তিনি বাদশাকে জানিয়ে গেলেন—হুজুর জাঁহাপনা শাহেন শা, আপনি এখন গরিবের কথা শুনলেন না বটে, কিন্তু শিগগিরই দেখবেন, এমন একদিন এসে পড়ছে যে তখন হুজুরকে নিজেই সন্ধির জন্যে দরবার করতে ছুটতে হবে, কিন্তু এখন যে-শর্তে সন্ধি করতে পারতেন তখন আর সেই শর্তে পারবেন না।

তখন যা পাবেন তা হবে এখনকার চেয়ে ঢের নিরেস। আর সেটা যে হুজুরের পক্ষে খুব গৌরবের হবে তা বলেও তো মনে ধরে না। এই বলে সিতাব রায় পিছু হঠে আবার কুর্নিশ করতে করতে বাদশার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

রাজা সিতাব রায় চলে যেতেই কামগড খাঁ শা আলমকে সঙ্গে নিয়ে পাটনার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু চরের মুখে শুনতে পেলেন, মেজর কারন্যাক বুদ্ধি করে আগেভাগেই পাটনা ঢোকার রাস্তা আগলে সসৈন্যে সেখানে ওত পেতে বসে আছেন। সেই শুনে কামগড খাঁ আপাতত পাটনা-জয়ের আশায় ছাইচাপা দিয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ ফেরালেন। ইংরেজ ফৌজ এবার আগের থেকেই কতকগুলো বিশ্বাসী গাইড সংগ্রহ করে রেখেছে, যেই দেখলে বাদশাহী ফৌজ আর আসছে না অমনি তারা খানিকটা এগিয়ে চলল।

কিন্তু বাদশা তো আর পেরে ওঠেন না। বড-বড জমিদারদের সবাই কামগড খাঁর বেয়াদবিতে বিরক্ত হয়ে উঠে শা আলমের সঙ্গ ত্যাগ করে যাঁর যাঁর নিজের জমিদারিতে ফিরে চলে গেলেন। এর উপর আর-এক বিপদ। দক্ষিণ বিহারে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য শা আলম যে-সব তশিলদার রেখে গিয়েছিলেন, বাদশা চোখ ফেরাতেই তারা এমনি দেডেমুষে প্রজাদের সবস্ব আত্মসাৎ করতে লেগে গেল যে, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। শা আলম তো কর্মচারীদের কাছ থেকে এক পয়সাও উদ্ধার করতে পারলেন না, উল্টে প্রজাদেরও এমন হাল হল যে আর-কিছু বের করে দেবে যে তারও শক্তি তাদের রইল না। উপরন্তু আর-এক বিভ্রাট। কোথাও একদানা রসদ পাওয়া ভার। হাটবাজার দোকানপাট গোলাগঞ্জ সব বন্ধ, মাঠও খালি। তার উপর বাদশা যেদিকে যান খবর পেয়ে ইংরেজরা পিছন পিছন ঠিক সেদিকেই তাড়া করে আসে।

সিতাব রায় ফিরে যাবার পর পনরোটা দিনও পেরোল না, অস্থির হয়ে শা আলম নিজেই সন্ধির প্রস্তাব করে মেজর কারন্যাকের কাছে দূত পাঠালেন। মেজর কারন্যাক দূতকে বুঝিয়ে বললেন, পাকাপাকি চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা একমাত্র কলকাতার কাউন্সিলেরই আছে। তবে যদি শা আলম কামগড় খাঁকে এখনি বরখাস্ত করেন, আর শোন নদের ওপার থেকে এপারে আসার কোনো উদ্যোগ না করেন, তাহলে সন্ধির প্রস্তাব মঞ্জুরির জন্যে তিনি তখনি কলকাতায় লিখে পাঠাবেন। তবে যতদিন না ফয়সালা একটা-কিছু হচ্ছে, ততদিন বাংলার নবাবের তরফ থেকে রাজা রামনারায়ণ বাদশার হাতখরচ বাবদ দৈনিক হাজার টাকা ভাতা দেবেন।

কিন্তু মেজর কারন্যাক মার্চ থামালেন না। ইংরেজ ফৌজ যখন বাদশার ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে তখন শা আলম একটু ভড়কে গেলেন। ইংরেজ সেপাই-পল্টনের যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি গোছের ভাব দেখে তিনি সে স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ বলে মনে করে আরো কুড়ি মাইল দক্ষিণে, প্রায় গয়ার কাছে, গিয়ে আস্তানা গাড়লেন। আর একটুও গড়িমসি না করে কামগড় খাঁকে তখনি বরখাস্ত করে তার দেশেই তাকে সোজা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেজর কারন্যাকের সমস্ত প্রস্তাবেই রাজী হয়ে গিয়ে দূত মারফত তাঁকে একবার দেখা করতে বলে পাঠালেন। তখন মেজরও তাঁর সেপাই-পল্টনদের থামতে বললেন, আর এগোতে দিলেন না।

পরদিন মেজর কারন্যাক অল্প কজন লোক নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেন, উল্টো দিক থেকে শা আলমও আগুয়ান হয়ে এলেন। দুই দলের ক্যাম্পের মাঝপথে দুজনের মিলন হল। ইংরেজরা সবসময়েই ভারী এটিকেট-দোরস্ত। তখ্‌তহীন রাজধানী-ছাড়া শা আলমকেও কারন্যাক দিল্লির বাদশার প্রাপ্য সম্মান দিতে একটুও কসুর করলেন না। আদরের ঘটায় শা আলম একেবারে গলে গিয়ে ইংরেজদের পরম আত্মীয় বলে মনে করতে লাগলেন। নিজের ক্যাম্প ছেড়ে এসে তিনি ইংরেজদের ক্যাম্পেই আশ্রয় নিলেন। সেখানকার সবচেয়ে বড় তাঁবুটা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল।

মেজর-সাহেবের মনোগত ইচ্ছা, শা আলমকে সঙ্গে করে নিয়ে একেবারে পাটনায় যান। বাদশাকে একবার সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে তাঁকে দিইয়ে অনেক কাজই হাসিল করে নেওয়া যেতে পারবে। ইংরেজদের কোটপ্যান্টের সবকটা পকেটই প্লিজ, থ্যাঙ্ক ইউ, কাইণ্ডলি ইত্যাদি বিনয়-বচনে ভরা। লাগুক-না-লাগুক যত্রতত্র সে-সব ছাড়তে তারা কিঞ্চিৎমাত্র কার্পণ্য করে না। মুগ্ধ হয়ে গিয়ে শা আলম তখনি ইংরেজদের সঙ্গে পাটনা যেতে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনো তিনি বুঝতে পারেননি, ইংরেজদের এক হাত লোকের পায়ে থাকে আর-এক হাত থাকে গলায়—তাদের পায়ে ধরতেও যতক্ষণ আবার গলা টিপতেও ততক্ষণ।

পাটনার কাছাকাছি এসে শহরে ঢুকতে শা আলম প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগলেন। তাই দেখে মেজর কারন্যাক বলে বসলেন, বাদশা যদি এখনো ইংরেজদের সন্দেহের চোখে দেখেন, তাহলে তো সন্ধির কথাবার্তা এখানেই ভেঙে দিতে হয়, আর তো কথা এগোয় না। তার পর এক মোক্ষম অস্ত্র ছেড়ে বললেন—বাদশার জন্য যে-টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাও তাহলে বন্ধ করে

দিতে হয়। তাই শুনে শা আলম আর কথাটি না বলে সুবোধ বালকের মতো সুড়সুড় করে শহরে ঢুকে পাটনার কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে কেবল ছোট এক বডিগার্ড মোতায়েন রইল, আর থাকলেন বাদশার কজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব। কিছুদিন সেখানে বসবাস করার পর শা আলম যখন দেখলেন ইংরেজরা আর যাই করুক না কেন, আচমকা কাউকে প্রাণে মেরে বসে না তখন তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই মেজর কারন্যাককে ভজাতে লাগলেন, ইংরেজ পল্টনরা যেন তাঁকে সঙ্গে করে দিল্লি নিয়ে গিয়ে তাঁকে তাঁর পিতৃপিতামহদের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

এইসব ব্যাপার খানিকটা অতিরঞ্জিত হয়েই মুর্শিদাবাদে নবাব মীর কাশিমের কানে গিয়ে পৌঁছল। শুনে নবাব-বাহাদুর যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে বেড়াতে শুরু করে দিলেন না, সে-কথা না বললেও চলে। ইংরেজদের ওরকম উপরপড়া হয়ে শা আলমকে পাটনায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে আদব-আপ্যায়ন করাটা তিনি আদবেই সুনজরে দেখলেন না। বাদশার সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা হয়, সেটা তাঁর একটুও পছন্দ নয়, কারণ এর আগে থেকেই সর্বত্র কানাঘুসো চলছিল যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারি বাদশা যাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখে দেন, ইংরেজরা নাকি গোপনে গোপনে সেই চেষ্টাই করছে। তাছাড়া বাদশা-উজিররা একটু তফাতে থাকলেই মঙ্গল, কাছে এলে তাঁদের নিয়ে নানারকম উৎপাতের সৃষ্টি হতে থাকে। আর বাদশাকে পোষাও তো চাট্টিখানি কথা নয়। হাতির খোরাকেও যে তাঁর শানায় না। হিসেবী নবাব মনে মনে অঙ্ক কষে খরচের বহর দেখে আঁতকে উঠতে লাগলেন। কিন্তু অতিবুদ্ধির অনেক সময় গলায় দড়ি—অতি হিসেবীরও হয় ঠিকে ভুল। মীর কাশিম বুঝলেন না, বছর বছর শা আলমের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার দরুন যে খরচ হচ্ছে তার তুলনায় বাদশাকে শান্ত রাখার জন্যে দৈনিক হাজার টাকার ভাতা তো নস্যির সামিল। ব্যাপারটা সত্যি কি দাঁড়াচ্ছে সেটা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে নবাব আর একটুও দেরি না করে পাটনা যাত্রা করলেন।

মেজর কারন্যাকের মনোভাব মীর কাশিমের অনুকূলে আদবেই ছিল না। তিনি ক্লাইভের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ক্লাইভের পেটোয়া মীর জাফরের জায়গায় বাংলার মসনদে মীর কাশিমকে বসানোটা তাঁর একটুও মনে ধরেনি। দুদিকেরই মনোভাব যখন এমনি বিপরীত ধরণের তখন সংঘর্ষ একটা না লেগে যায় না। আর হলও তাই। কামগড় খাঁকে জব্দে রাখার জন্যে মেজর কারন্যাক রাজা রামনারায়ণ আর রাজবল্লভকে গয়ার কাছেই রেখে এসেছিলেন। তাঁদের

সাহায্যার্থে ছিলেন ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার চ্যাম্পিয়ন। নবাব ইংরেজ কমাণ্ডারের এই কর্তামি সহ্য করতে না পেরে দুই রাজাকেই পত্রপাঠ পাটনায় ফিরে আসতে হুকুম করে পাঠালেন। ইংরেজ-বাচ্চাও কম যায় না। মেজর কারন্যাকও নবাবের হুকুমের কথা যেই শুনলেন অমনি তিনিও ক্যাপ্টেন চ্যাম্পিয়নকে তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সেপাই-পল্টন নিয়ে পাটনায় ফিরে আসতে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন।

নবাব মীর কাশিম পাটনার কাছে বৈকুণ্ঠপুরে পৌছলে কারন্যাক রামনারায়ণ রাজবল্লভ—সকলেই মিলে তাঁকে সেলাম ঠুকতে সেখানে এগিয়ে গেলেন। প্রথম দর্শনেই দরবারের মধ্যেই গরম হয়ে উঠে মীর কাশিম সবার সামনেই কারন্যাককে তাইস করতে শুরু করে দিলেন। কেন তিনি চ্যাম্পিয়নকে পাটনা ফিরে আসতে হুকুম করে পাঠিয়েছেন? তিনি কি জানেন না যে, ইংরেজ সেপাই-পল্টনের মাইনে মাস মাস কে গুণছেন? স্বয়ং নবাব যখন তার পাই পয়সাটাও পর্যন্ত গুণে দিচ্ছেন তখন তাদের খিদ্‌মদ্‌গিরি যখন-তখন তলব করার অধিকার মীর মহম্মদ কাশিম আলী খাঁর অতি অবশ্যই আছে। আর, তাঁর কথা নিশ্চয়ই তাদের মানতে হবে।

ইংরেজদের একটা মস্ত সুবিধা যে, ঠাণ্ডা দেশের লোক বলে তারা চট্ করে গরম হয়ে ওঠে না। জবাবে বিনীতভাবে কিন্তু বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই মেজর কারন্যাক জানিয়ে দিলেন যে, অন্য সববিষয়ে তিনি মাননীয় নবাবের নির্দেশ মানতে রাজী আছেন, কিন্তু মিলিটারী ব্যাপারে তাঁর নিজের কথাই হচ্ছে শেষ কথা। নবাব যখন তাঁকে না জানিয়েই রাজা রামনারায়ণ আর রাজা রাজবল্লভকে নবাবী ফৌজসমেত পাটনায় ফিরিয়ে এনেছেন তখন তিনিও ইংরেজ সেপাই-পল্টনদের ঐ অচেনা-অজানা জায়গায় একা একা ফেলে রাখাটা সমীচীন মনে করেন না, তাই বাধ্য হয়েই তিনিও তাদের ফেরত আনাচ্ছেন।

মুখের উপর এই স্পষ্ট জবাব শুনে নবাব একেবারে সপ্তমে চড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—ইংরেজরা তাঁকে বাংলার সুবেদার বলে মনে করে কি না? কথাটা নেহাৎ বাঁকা পথে চলল দেখে মেজর কারন্যাক কুর্নিশ করে সেখান থেকে সরে পড়লেন। তবে বখেড়া আর না বাড়িয়ে ক্যাপ্টেন চ্যাম্পিয়ন যে-পর্যন্ত এগিয়েছেন, তাঁকে সেখানেই থেমে যেতে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন। ভাগ্যিস দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, নইলে এক বিভ্রাটের সৃষ্টি হত। ইংরেজরা গয়ার কাছের জায়গাটা ছেড়ে গেল দেখে কামগড় খাঁ তাঁর পাহাড়ী-জঙ্গুলে জমিদারি থেকে বেরিয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামগুলো লুঠ করতে শুরু করলেন। ক্যাপ্টেন চ্যাম্পিয়ন খুব বেশি দূর যাননি, খবর পেয়েই তিনি এমন জোর তাড়া

করে এলেন যে, কামগড খাঁ সুডসুড় করে ফের নিজের জমিদারির মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন।

কারন্যাকের উপর নবাবের রাগ হবার আরো-একটা কারণ ছিল। মীর জাফর মীরনের মতো মীর কাশিমও রামনারায়ণকে শেষ করাই সাব্যস্ত করেছেন। তার ধারণা, মেজর কারন্যাকই রামনারায়ণের সহায় হয়ে তাঁকে নবাবের হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে দিচ্ছেন না। নবাবের ধারণাটাকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইংরেজদের তরফ থেকে স্বয়ং ক্লাইভ রামনারায়ণকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজরা কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করবে না। ফলে রামনারায়ণও কায়মনোবাক্যে ইংরেজদের একান্ত অনুগত হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন। তাছাড়া এই সেদিনও কলকাতা কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি মেজর কারন্যাককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে রামনারায়ণ ইংরেজদের সত্যিকার হিতৈষী বন্ধু, মেজর কারন্যাক যেন পদে পদে রামনারায়ণকে রক্ষা করে যান। যাই হোক, সেই দিন কারন্যাককে মুখপাত্র করে মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যে বিরোধ ঘটল সে-বিরোধ আর কখনো মিটল না।

মেজর কারন্যাক অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই মীর কাশিমকে পাটনা ফোর্টের ভিতর গিয়ে শা আলমকে একবার দেখা দিতে রাজী করাতে পারলেন না। মেজর-সাহেব বুঝতে পারেন না, কেন যে মীর কাশিমের এই দুর্জয় পণ। প্রবল প্রতাপান্বিত তৈমুর-লঙ-এর বংশধর তো এখন সহায়সম্পত্তিহীন নিস্তেজ নির্বিষ এক অভাজন ব্যক্তি মাত্র, তাঁকে দেখলেই মায়া হতে থাকে। নবাবের তাঁকে এত কিসের ভয়, তা তিনিই জানেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মীর কাশিম শহরের মধ্যে ঢুকলেনই না, শহরের বাইরে জাফর খাঁর বাগানে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন।

সব নিয়ে জিনিসটা একটু বেশি কটু দেখতে দাঁড়াচ্ছে বুঝে মীর কাশিম শেষে ইংরেজদের কুঠিবাড়িতে বাদশাকে একবার দেখা দিয়ে আসতে রাজী হলেন। কিন্তু পাঁজিতে ভালো দিনক্ষণ আর কিছুতেই মেলে না। ফলিত-জ্যোতিষে মীর কাশিমের অগাধ বিশ্বাস। তাই নিয়ে তিনি চর্চাও করেন সর্বক্ষণ। তিনি যেখানেই যান তাঁর সঙ্গে চলে একপাল হিন্দু জ্যোতিষী। তাঁরা খড়ি পেতে ছক কেটে অনেক গুণেগাস্তে শেষে একটা শুভদিন বের করে ফেললেন। মীর কাশিম কারন্যাককে জানিয়ে দিলেন, তিনি ঐ দিন ইংরেজ কুঠিতে হাজির থাকবেন।

পাটনার ইংরেজ কুঠিবাড়ির বড় হলঘরটা ঝেড়েমুছে নতুন করে সাজানো হল। মেঝেতে দামী দামী কার্পেট, দেওয়ালে মখমলের ঢাকনা, জানালায় কিংখাবের পর্দা। মসনদের জন্যে হাতের কাছে অন্য আর কিছু না পাওয়াতে খাবার ঘর থেকে দুটো ডাইনিং টেব্‌ল টেনে নিয়ে এসে পাশাপাশি রেখে একসঙ্গে জোড়া হল। তার উপর কালো বনাত বিছিয়ে তাতে কটা গিকের তাকিয়া ফেলে বাদশার আসন তৈরি করা হল। দিল্লির তখ্‌ত-তাউস এই পোড়া বিহারপ্রদেশে কোথায় মিলবে? তাইতে তো দুধের স্বাদ ঘোলেতেই মেটানোর এই ব্যবস্থা।

কুঠির সর্দার ম্যাগুয়ার-সাহেব হন্তদন্ত হয়ে একবার এ-ঘর আর-একবার ও-ঘর করে বেড়াচ্ছেন। ছোকরা সিভিলিয়নরা এই উপলক্ষে তাদের সাটিনের উপর জরিদার কোটপ্যাণ্ট বের করেছে। সেপাই-পল্টনদের লাল বনাতের উপর কালো পাড় দেওয়া পুরোদস্তুর মিলিটারি সাজ। মেজর কারন্যাক তাদের নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সদর রাস্তার দুধারে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বেয়নেট ধরা। রাস্তা থেকে কুঠিবাড়ি ঢোকবার সমস্ত পথটুকু লাল শালুর কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। সব নিয়ে সে ভারী জেল্লা-জলুস।

খানিক পরে রোশনচৌকি বেজে উঠল। চার দিকে বাদশা আসছেন রব শোনা গেল। রঙিন জোব্বা পরে, জরির কোমরবন্ধ এঁটে, হাতে আসা-সোটা নিয়ে নকীবরা হাঁকতে হাঁকতে চলেছে। তাদের পিছন পিছন বাদশার খাস বডিগার্ড। মধ্যিখানে এক চতুর্দোলায় চড়ে চলেছেন হিন্দুস্থানের বাদশা—শা আলম শানি বাহাদুর। কুঠিবাড়ির সামনে দোলা থেকে নাবতে ম্যাগুয়ার-সাহেব মেজর কারন্যাক ও আরো কজন হোমরা-চোমরা কুঠিয়াল এগিয়ে এসে মাটিতক মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করতে করতে বাদশাকে অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে মসনদের উপর বসালেন।

ডাইনিং টেব্‌লের বেদীর উপর শা আলম আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন। তাঁর দুধারে ইংরেজরা পর পর সটান দাঁড়িয়ে গেল। তারা সবাই স্থির ধীর

শান্ত, কেউই নড়ে না চড়ে না। দেখে মনে হয় যেন মোমের পুতুল সব সার-সার দাঁড় করানো। খানিক পরে বাংলার নবাব মীর মহম্মদ কাশিম আলী খাঁ তাঁর পাত্রমিত্র নিয়ে এসে দেখা দিলেন। মোগলাই প্রথায় দোরগোড়া থেকেই বাদশাকে বারবার কুর্নিশ করতে করতে তাঁর মসনদের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার কুর্নিশ করে বাদশার সামনে হাজার-এক আসরফির তোড়া ধরে নজরআনা পেশ করলেন। তখন নবাবের আবদালিরা মাথায় করে একশো-এক ট্রে-ভর্তি নানারকমের উপহারদ্রব্য বয়ে এনে বাদশার সামনে একে একে সাজিয়ে ফেলল। এক নজরে জিনিসপত্রের বহর দেখে বাদশা খুশিতে ভরপুর হয়ে হাসিমুখে এক সেট দামী খেলাত মীর কাশিমকে বখশিশ করে ফেললেন। সেগুলো মাথা পেতে নিয়ে মীর কাশিম পাশের ঘরে ম্যাগুয়ারের খাস কামরায় কাপড় ছাড়তে গেলেন।

মীর কাশিম ইংরেজদের আগের থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন, ঐ দরবারেই বাদশা যেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারী সনদটা তাঁর হাতে তুলে দেন। যদিও কাজে মীর কাশিম কিছুদিন ধরেই নবাবী করছেন তবু তখনকার দিনের ধারা অনুসারে দিল্লির বাদশার মঞ্জুর করা সনদ না পেলে লোকে সেটাকে ঠিক পাকা হল বলে মনে করত না। সেই জন্যেই মীর কাশিমের অত মাথাব্যথা। কিন্তু সুবিধা তেমন-কিছু হল না। গোল বাধল বাদশার প্রাপ্য আর নবাবের দেয় সুবে বাংলার রাজস্ব নিয়ে।

মীর কাশিমের কথা হল—আসলে ইংরেজরাই তো তাঁকে নবাব বানিয়েছেন আর তার জন্যে খেসারতও তিনি কিছু কম দেননি। কোম্পানীকে তো যথেষ্টই দিয়েছেন, এমন কি কলকাতার সিলেক্ট কমিটির সব-কটা মেম্বরেরও পেট তিনি অল্পবিস্তর ভরিয়েছেন। ইংরেজ ফৌজের খরচ-জোগান বাবদ তিন তিনটে বড়-বড় জেলায় মালগুজারি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সে-জায়গায় সত্যি বলতে গেলে বাদশা তাঁর জন্যে কি করেছেন? তিনি তো শুধু একটা কাগজের উপর সই মেরে তার উপর তাঁর সীলমোহর ছেপে দেবেন। তার জন্যে আবার দিতে কি হবে? যদি দিল্লিতে দরবার করতে যেতে হত তাহলেও বা একটা কথা ছিল, কিন্তু বাদশার তো এখন ঘর বলতে গাছতলা। হিসেবী মীর কাশিম এর জন্যে ইংরেজদেরই দুষতে লাগলেন। কারন্যাক যদি খামকা শা আলমকে মাঠ থেকে কুড়িয়ে এনে পাটনায় কেল্লায় না ঢোকাতেন তাহলে কি এত খিটকেল বাধত? না, মীর কাশিমেরই এত ভোগান্তি হত?

নবাবের উগ্রমূর্তি দেখে ম্যাণ্ডয়ার-সাহেব বিনয়-বচনে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন—এতদূর এগিয়ে এখন পিছতে গেলে সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়ে এক কেলেঙ্কারী বেধে যাবে। নবাবকে ইংরেজদেরকে—সবাইকে মহা অপ্রস্তুতে পড়তে হবে। তখন পরগণার-পর-পরগণার জমা-ওয়াশীল-বাকির হিসেব নিয়ে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল। অবশেষে হিসেবে কোনো ছুতো বের করতে না পেরে মীর কাশিম মুখভার করে সুবে বাংলার রাজস্বের দরুন বছর বছর চব্বিশ লাখ টাকা বাদশার সরকারে দাখিল করতে স্বীকার হয়ে গেলেন। মনে মনে ঠিক করা আছে—আগে সনদটা তো হাতের মুঠোয় এসে পৌছে যাক, তার পর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।

তখন বাদশার দেওয়া খেলাতী পোশাক পরে মীর কাশিম আবার দরবারে ঢুকে কুনিশ করে শা আলমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর্জি পেশ করলেন—সুবে বাংলার সুবেদারি অধীনকে দেবার হুকুম হয়ে যাক, অধীন হুজুর সরকারে সাল সাল চব্বিশ লাখ টাকা সালিয়ানা দিতে প্রস্তুত। শা আলম তথাস্তু বলে মীর কাশিমকে সুবেদারের পদে অভিষিক্ত করলেন বটে, কিন্তু সনদ হাতে হাতে দিলেন না। বাদশাহী পরওয়ানা দস্তখত করে তাতে সীলমোহর লাগিয়ে পরে পাঠিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে সভা ভঙ্গ করার ইঙ্গিত দিলেন। মুখ গোমরা করে মীর কাশিম কুনিশ করতে করতে পিছু হেঁটে দরবার থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মৌখিক সুবেদারি দেওয়ার সঙ্গে ঐ দরবারেই বাদশা মীর কাশিমকে সাতহাজারী মনসবদারের পদে তুলে ধরলেন। তাঁর নতুন টাইট্‌ল হল—নবাব আলীজা নশীম-উল্-মুল্‌ক ইমতিয়াজউদ্দৌলা মীর মুহম্মদ কাশেম আলী খাঁ নশরৎজঙ্গ বাহাদুর। তখনকার দিনের লোকেরা আজকালকার লোকেদের মতো এক-কথার কি দু-কথার টাইট্‌লে—সার্, লর্ড, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ ইত্যাদিতে—খুশি হতেন না, তাঁরা চাইতেন বেশ গালভরা দাঁতভাঙা ইয়া লম্বাচওড়া টাইট্‌ল। পেতেনও ঠিক সেইরকম। যিনি যে মন্ত্রে তুষ্ট।

সভা ভঙ্গ হল। বাদশা পাটনার কেল্লায় ফিরে গেলেন। মীর কাশিম গেলেন তাঁর তাঁবুতে—জাফর খাঁর বাগানে। তার পর চলল সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। বাদশা বাংলার রাজস্ব বাবদ অগ্রিম কিছু আদায় না নিয়ে সুবেদারী পরওয়ানা বার করবেন না, নবাবও শা আলমকে বাদশা মেনে তাঁর নামে টাকা ছাপাবেন না, মসজিদে খুৎবা পড়তে দেবেন না, যতক্ষণ না সনদ হাতে পাচ্ছেন। এইরকম যখন টানাপোড়েন চলছে ঠিক

অমনি সময় বাংলার ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার-ইন-চিফ হয়ে কলকাতা থেকে কর্নেল আয়ার কুট পাটনায় এসে নাবলেন।

এর কিছুদিন আগে থেকে প্রায় প্রত্যহই গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট মেজর কারন্যাকের কাছ থেকে নবাবের নামে আবার নবাব মীর কাশিমের কাছ থেকে কারন্যাকের বিরুদ্ধে একটা করে নালিশ-ফরিয়াদের চিঠি পাচ্ছেন। গতিক ভালো নয় দেখে তিনি তাড়াতাড়ি আয়ার কুটকে পাটনায় পাঠিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন বুঝি এইবার অবস্থাটার একটু সুবাহা হবে, খোঁচাখুঁচি কমে গিয়ে সব সোজাপথে চলবে। সাউখুরি করে তিনি নবাবকে এক পত্রাঘাতও করে বসলেন। তাতে লিখলেন যে, এবার যিনি কমাণ্ডার হয়ে যাচ্ছেন তিনি নবাবের সমস্ত নির্দেশই মেনে চলবেন। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। কারো নির্দেশ মেনে চলার ছেলে আয়ার কুট মোটেই নন --বিশেষ করে সে-নির্দেশ যদি আসে এদেশের কোনো নবাব-বাদশা কি জমিদার-মহাজনের কাছ থেকে —কারণ, তাঁদের উপর কুটের অবজ্ঞার আর সীমা ছিল না।

কলকাতা কাউন্সিলের অনেকের মতো আযার কুটেরও ধারণা হয়েছিল, বাংলার গদি ন্যায়ত মীর কাশিমের প্রাপ্য নয়, তিনি সেটা জবরদখল করেছেন। আর মীর জাফরকে বাংলার মসনদ থেকে নাবিয়ে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট অত্যন্ত অন্যায় কাজই করেছেন। আয়ার কুটের ঐ ধারণাটা মীর জাফরের প্রতি প্রেমবশত, কি অত বড় একটা ওলট-পালোটের যজ্ঞভাগ নিজের অংশে কিছু না পড়ার দরুন, সেটা অবশ্য জোর করে কিছু বলা যায় না। তার উপর কর্নেল কুট কুচক্রীদের পালের গোদা নন্দকুমার রায়কে তাঁর দেওয়ান করে পাটনায় নিয়ে এসেছেন। কলকাতায় নন্দকুমার এখন মীর জাফরের প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছেন, দুজনের মধ্যে গলাগলি ভাব। মীর জাফর আবার গদি পেলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রিত্ব তাঁর কপালে বিলকুল নাচছে। নন্দকুমার মীর কাশিমের বিরুদ্ধে আয়ার কুটের কানে বিষমন্ত্র ঝাড়তে লাগলেন।

পাটনায় পা ফেলতে-না-ফেলতেই কুটকে নিয়ে চতুর্দিকে টানা-হেঁচড়া পড়ে গেল। রাজা রামনারায়ণ তাঁকে হাত করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। আয়ার কুটকে বেশি-কিছু বলতে হল না। তিনি আগের থেকেই মীর কাশিমের উপর বিরূপ। তার উপর প্রথম সাক্ষাতেই কুট বুঝে নিয়েছিলেন যে, রাশ টেনে ধরে না রাখতে পারলে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের হাত থেকে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে যাবেন। মীর জাফরের মতো তিনি মোটেই সুবোধ সুশীল নন যে, উঠতে বললেই উঠবেন, বসতে বললেই বসবেন। মীর কাশিম

নিজেও কর্নেল কুটকে বাগাবার চেষ্টা কম করলেন না, কিন্তু অনেক ফিকির-ফন্দি খাটিয়েও, এমন কি সাড়ে-সাত লাখ টাকার ঘুষ কবলিয়েও, তাঁকে নিজের দলে টানতে পারলেন না।

ওদিকে আয়ার কুট চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে বাদশার সঙ্গে নবাবের একটা বোঝাপড়া হয়ে সব মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু মীর কাশিম আর বাদশা শা আলমের দরবারে পা বাড়ালেন না, তাকে বাদশা বলে মেনে নিয়ে সেটা কেতামাফিক প্রচারও করলেন না। উল্টে তিনি গভর্নর ভ্যানসিটার্টের কাছে নালিশ ঠুকলেন যে, কর্নেল আয়ার কুটই তাঁর সুবেদারী সনদ পাওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর তিনিই বাদশাকে তাড়াতাড়ি দিল্লি ফিরে যেতে দিচ্ছেন না, পাটনায় ধরে রেখেছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, গোড়া থেকেই বাদশারও মীর কাশিমকে একবিন্দুও পছন্দ হয়নি। তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাবার ভার তিনি একা মীর কাশিমের উপর ছেড়ে যেতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তার মনোগত ইচ্ছা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বঙ্গদেশে কায়েম হয়ে বসুক, তাহলে তার পাওনাগণ্ডা তিনি কড়ার মতো ঠিকঠাক পেয়ে যেতে থাকবেন, তাতে কোনো খেলাপ হবে না—এইসব নানা জল্পনা কল্পনাতেই বাদশার বেরোতে এত দেরি হচ্ছিল।

কাজ থাকতে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে তামশা দেখবার ছেলে কর্মিতকর্মা নবাব মীর কাশিম আলী খাঁ নন। তিনি সোনালি সালসা খাইয়ে শা আলমের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আর বিশ্বাসী কর্মচারীদের দুদিনেই বশ করে ফেললেন। তাঁরা শা আলমকে ক্রমাগত জপাতে লাগলেন, বাদশার পক্ষে বেশি দিন অমন করে পাটনায় বসে থাকাটা মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না, সবদিক থেকেই সেটা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া পাটনায় আরো বেশি দেরি করলে শেষ পর্যন্ত হয়তো দিল্লি তার আর যাওয়াই ঘটে উঠবে না। যে রকম হাওয়া বইছে, তাতে কখন যে কি ঘটে যায় তা বলা শক্ত। ওদিকে কাবুল থেকে আহমদ শা আবদালী, দিল্লি থেকে নাজীবউদ্দৌলা, ফরাক্কাবাদ থেকে নবাব আহমদ শা বঙ্গশ—সবাই মিলে চাইছেন, শা আলম যেন দিল্লি ফেরার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন।

শা আলমও দেখলেন, তাঁর কথায় ইংরেজদের আর যেন তেমন উৎসাহ নেই, দেওয়ানি সম্বন্ধেও তারা কোনো গা দিচ্ছে না, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবারও তাদের কোনো চাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন

তিনি ইংরেজ-ছাড়া নিজেনিজেই দিল্লি যাবেন বলে মন স্থির করে ফেললেন। তবে সেখানে যাবার আগে নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে একটা শলাপরামর্শের দরকার, তাই বাদশা প্রথম তাঁরই কাছে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। কিন্তু নবাব-বাদশারা শাঁখের করাত- আসতেও কাটেন আবার যেতেও কাটেন। দক্ষিণান্ত না হলে তাঁরা সহজে বিদায় হন না। প্রচুর হাতি-ঘোড়া, সিল্ক কিংখাব মসলিনের থান, সোনাদানা মণিমুক্তো ছাড়াও নগদ আড়াই লাখ টাকা বাদশাকে উপহার দিয়ে তবে মীর কাশিম রেহাই পেলেন। জুন মাসের গোড়াতেই শা আলম পাটনা ছেড়ে গেলেন। যাবার আগে দয়া করে নবাবী সনদটা মীর কাশিমের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। কুটের অর্ডারমতো মেজর কারন্যাক ইংরেজ সেপাই-পল্টন নিয়ে বাদশাকে কর্মনাশা নদী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চললেন।

বাদশা চলে যেতে মীর কাশিম স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে রাজা রামনারায়ণকে নিয়ে পড়লেন। তখনকার নবাবদের একটা বিদ্‌ঘুটে রোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, গদি পেয়েই তাঁরা বড়-বড় রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে সরকারী আদায়ী টাকার পুরনো হিসেব তলব করে বসতেন। এসব ক্ষেত্রে তামাদি বলে যে কিছু আছে, সেটা তাঁরা একেবারেই মানতেন না। বেশ জানতেন, কর্মচারীরা হিসেব কখনই ঠিকঠাক দিতে পারবেন না, কারণ টাকা হাতে পড়লে হিসেব করে চলাটা তাঁদের কারো ধাতে কখনো সইত না। তাই সবাইকারই হিসেবে গলদ খানিক থাকতই থাকত। তার উপর সরকারী টাকাকে নিজের টাকা বলে মনে করাটা এদেশে নতুন কিছু নয়। সেটা আত্মসাৎ করলে যে অধর্ম হয়, সে-জ্ঞান কারো মনে কখনো ভালো করে বসলই না। মীর কাশিম নিজে যখন রংপুরের ফৌজদার তখন তিনি নিজেও ঐ একই কাণ্ড করেছিলেন, হিসেব চাইলে তিনিও কিছু সত্যিকার হিসেব দাখিল করতে পারতেন না। এদেশের সবাই জানত ঐরকম হিসেব চাওয়ার মানে আসলে অন্য আর-কিছু নয়, জুলুমবাজিরই একটা অছিলা মাত্র। যাঁদেরই সর্বস্বান্ত করে উচ্ছেদ করার মতলব, নবাবরা তাঁদেরই কাছ থেকে লোক-দেখানোর জন্যে পুরনো হিসেবপত্র সর্বাগ্রে তলব করে পাঠাতেন।

এর আগে একবার ঐরকম করে রামনারায়ণের সর্বনাশ করতে নবাব মীর জাফরও উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু ক্লাইভ রাজার সহায় থাকায় সেটা কাজে ঘটে ওঠেনি। কর্নেল-সাহেবের দরুনই মীর জাফর আর মীরন রামনারায়ণের চুলের টিকিটি পর্যন্ত ছুঁতে পারেননি। ক্লাইভের ধারণা ছিল, রাজা রাম-

নারায়ণকে তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারলে তাঁকে দিয়েই ইংরেজরা নবাবকে চেপে রাখতে পারবে, বেশি বাড় বাড়তে দেবে না। তাতে নবাবের না হোক ইংরেজদের যে খুব সুবিধা, সেটা বলা বাহুল্য। কর্নেল আয়ার কুট আর মেজর কারন্যাক দুজনেই ক্লাইভের শেখানো ঐ পলিসিই ঠিক মনে করে সেটাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তা কেবল কর্নেল আর মেজরই কেন? কলকাতা কাউন্সিলের প্রায় সবাইকার তো গোড়ায় গোড়ায় ঐ পলিসিই ছিল। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কাউন্সিল কুটকে আর কারন্যাককে উপদেশ দিয়ে পাঠাচ্ছেন, নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে তাঁরা যেন রাম-নারায়ণকে সর্বদাই সামলে রাখেন। নবাব মীর কাশিম কিন্তু সামলাতে দিলেন না।

ব্যাপার যখন অমনি থমথমেগোছের তখন কর্নেল আয়ার কুট হুট করে একটা মস্ত অবিবেচনার কাজ করে বসলেন। তিনি অনেক দিন থেকেই মীর কাশিমের কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন যাতে জাফর খাঁর বাগানের ক্যাম্প ছেড়ে তিনি পাটনার কেল্লায় উঠে এসে সেখানেই বসবাস করেন। মীর কাশিমের নিজেরও তাই ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু শা আলম সম্বন্ধে তাঁর মনে এমন একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে, তাইতেই সেটা কাজে ঘটে ওঠেনি। ভয়ের সত্যি কোনো কারণ ছিল কিনা, তা এখন আর ঠিক বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু বাদশা চলে যেতেই নবাব আয়ার কুটকে জানিয়ে দিলেন, তিনি কেল্লায় বাস করতে যাবেন—তবে একটা শর্তে। ইংরেজদের যেসব সেপাই-পল্টন কেল্লার ফটকে ফটকে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের সেখান থেকে হটিয়ে নিতে হবে, নইলে তিনি কিছুতেই কেল্লায় ঢুকবেন না। এটা কি ভয়ের দরুন, না স্রেফ মান-অভিমানেরই পালা? নবাব বোধ হয় ভাবলেন, তাঁর কেল্লায় ইংরেজ গার্ড পাহারা দিলে তাঁর মানহানি হবে। ওদিকে ইংরেজ কর্নেল আয়ার কুটও বোধ করি ঐ একই কথা মনে করলেন, গার্ডদের ফোর্ট থেকে সরালে ইংরেজদের প্রেস্টিজ একেবারে মাটি হয়ে যাবে। প্রেস্টিজ বড় বালাই, কেউ কি সহজে প্রেস্টিজ ছাড়তে চায়? ফলে ফয়সালা একটা-কিছুই হল না, উভয় পক্ষই রাগে ফুলতে লাগলেন।

রাগ যখন মাথায় চড়ে বসে তখন অনেক অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব বলে মনে হতে থাকে। সুযোগ উপস্থিত মনে করে রাজা রামনারায়ণ নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তাঁর মারফত অনেক উট্‌কো খবর কর্নেল কুটের কানে তোলাতে থাকলেন। আর কুটও একের-পর-এক সেইসব বেমালুম গিলতে লাগলেন।

রামনারায়ণ একদিন হঠাৎ খবর পাঠালেন, নবাব-বাহাদুর জোর করে ইংরেজ সেপাই-পল্টনদের তাড়িয়ে পাটনার কেল্লা দখল করে নেবার সব তোড়জোড় করছেন। ইংরেজদের তখন লোকবল কম, বেশির ভাগ সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে মেজর কারন্যাক বাদশাকে কর্মনাশা নদী পর্যন্ত পৌছে দিতে গেছেন। কর্নেল কুট কথাটা তলিয়ে না ভেবে ধরেই নিলেন, নিশ্চয় ঐ সুযোগে নবাব একদিন কেল্লা আক্রমণ করে বসবেন।

কর্নেল-সাহেবের স্বভাবই এই যে, কোনো কাজেই তাঁর একটুও তর সয় না, সব ব্যাপারেই তাঁর তড়িঘড়ি। কথাটা কানে আসবামাত্রই তিনি স্থির করে ফেললেন, ঐ নিয়ে তখনই নবাবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া দরকার। ফার্সী-জানা উইলিয়ম ওয়াটসকে তিনি তখনি নবাবের কাছে রওনা করে দিলেন, যাতে ওয়াট্‌স গিয়ে নবাবকে আগের থেকে জানিয়ে রাখতে পারেন যে, কর্নেল কুট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। সকাল ছ-টায় কুট একদল সেপাই আর গোটা-তিরিশ গোরা ঘোড়সওয়ার সঙ্গে নিয়ে নবাবকে দেখা দিতে বেরিয়ে পড়লেন। নবাবের ক্যাম্পে পৌছতেই ওয়াট্‌স খবর দিলেন, নবাব তখনো জেনানায় শুয়ে ঘুমচ্ছেন, কখন যে বেরোবেন তা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না। এখন কি করা?

তখন ঘোড়া থেকে নেবে, দু-হাতে দুই পিস্তল ধরে, যে বড় তাঁবুতে নবাবের দরবার বসে সেই তাঁবুতে ঢুকে কুট চিৎকার করে ডাক ছাড়তে লাগলেন—কোথায় নবাব? ড্যাম ইট্‌, কোথায় নবাব? সকলেরই এটা জানা কথা যে, রাগ হলে মানুষের মুখের চেহারা খানিকটা বিকৃত হয়ে পড়ে, হাত-পাগুলোও বেশ জোরজোর চলতে থাকে, গলার স্বরও দু-পদা উঁচুতে চড়ে কতকটা অস্বাভাবিক রকমের কর্কশ হয়ে ওঠে। মীর কাশিম জেগে আছেন, শুয়ে শুয়েই জেনানা-তাঁবু থেকে রকমসকম সব দেখছেন, চিৎকার-ঝামেলা সব শুনছেন, কেবল মুখে রা নেই, মনে মনেই তিনি মতলব ভেঁজে চলেছেন।

শূন্য দরবার ঘর। তাঁবুর ভিতরে পাঁচ-সাত মিনিট ধরে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পায়চারি করার পর আয়ার কুটের রাগটা একটু পড়ে এল। যারা চট্‌ করে রেগে ওঠে তাদের রাগ পড়তেও খুব বেশি দেরি হয় না। কুটের তখন চৈতন্য হল—কাজটা তিনি ভালো করেননি। ঠাণ্ডা হয়ে তিনি তাঁর একজন অফিসরকে ডেকে বলে দিলেন যে, নবাব উঠলে যেন তাঁকে জানানো হয় যে অত সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্যে কর্নেল কুটের যে

বেয়াদবি হয়েছে তার জন্যে তিনি নবাব-সাহেবের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা জানিয়ে গেছেন। সেই নির্দেশ দিয়ে আয়ার কুট তাঁর দলবল নিয়ে পাটনার কেল্লায় ফিরে গেলেন।

ঐ তিল-পরিমাণ ঘটনাকে একটা তাল-পরিমাণ ব্যাপারে দাঁড় করিয়ে মীর কাশিম গভনর ভ্যান্‌সিটার্টকে ইনিয়ে-বিনিয়ে ইয়া এক লম্বা চিঠি ঝেড়ে বসলেন যে, কর্নেল আয়ার কুট সসৈন্যে পিস্তল হাতে করে তাঁর জেনানায় ঢুকে তাকে বেইজ্জত করে গেছেন, তাঁকে গড্‌ড্যাম, গড্‌ড্যাম বলে গালাগাল দিয়েছেন, সকলের সামনে তাকে হাস্যাস্পদ করে তবে ছেড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণের কথাটাও উল্লেখ করতে নবাব ভুললেন না। আয়ার কুট রামনারায়ণের দিক হয়ে তাকে আশকারা দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় চড়িয়েছেন। ফলে রামনারায়ণ নবাবের কর্মচারী হয়েও তাকে আর কেয়াবই করেন না। সরকারী টাকাকড়ির হিসেবপত্র কিছুতেই দাখিল করছেন না, খাতাপত্তর সব কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন। ইংরেজদের যদি সত্যিই এই ইচ্ছা যে, নবাবের ঘরোয়া ব্যাপারে অযথা মাথা গলিয়ে তাঁকে সবার সামনে অপদস্থ করা, তাহলে গভনর-সাহেব স্বয়ং এসে নবাবের হাত থেকে রাজ্যভার তুলে নিয়ে সেটা নিজের হাতে গ্রহণ করে রাজত্ব চালাবার দায় থেকে তাঁকে রেহাই দিন। অমন করে মাঝদরিয়ায় ভেসে বেড়াতে নবাবের একটুও ইচ্ছা নেই।

আলাভোলা ভ্যান্‌সিটার্ট মীর কাশিমের চারানো টোপ সহজেই গিলে বসলেন। নবাবের কাঁদুনিতে তার মন গলে পাঁক হয়ে গেল—নবাব যা লিখেছেন সবই সত্যি বলে তাঁর মনে হতে লাগল। পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ ম্যাগুয়ার-সাহেবও মীর কাশিমের পক্ষ হয়ে একখানা চিঠি লিখলেন। তিনি নবাবের নুন খেয়েছেন, তাঁর গুণ না গেয়ে তিনি যান কোথা? ভ্যান্‌সিটার্ট কাউন্সিলে প্রস্তাব করলেন, কর্নেল কুট আর মেজর কারন্যাককে পাটনা থেকে সরিয়ে আনা হোক। আয়ার কুটের গরম মেজাজ আর উদ্ধত ব্যবহারের দরুন কাউন্সিলের অনেকেই তাঁর উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তার উপর তখন বর্ষা নেমে গেছে, সামনে যুদ্ধ-বিগ্রহের বড়-একটা আশংকা নেই। কাউন্সিলররা কুট আর কারন্যাককে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে মত দিলেন। জুলাই মাসের গোড়াতে তাঁরা দুজনেই পাটনা ছেড়ে গেলেন।

কাউন্সিল আর-একটা কাজ করলেন যেটা কি দেশী আর কি বিদেশী সকলেরই মতে একটা অতিশয় জঘন্য কাণ্ড। আশ্রিতকে আশ্বাস দিয়ে অবশেষে তাঁকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে দিলেন। এখানে মীর কাশিমের

ডিপ্লোম্যাসী ইংরেজদেরও হার মানাল। রাজা রামনারায়ণকে তারা গাছে তুলে স্বচ্ছন্দে মই কেড়ে নিয়ে তাকে মীর কাশিমের কবলে ঠেলে ফেলে দিল। হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট এই নিয়ে তার বইয়ে যতই সাফাই গেয়ে যান না কেন, ইংরেজদের এই কলঙ্ক কখনো ঘোচবার নয়। ইতিহাসের পাতায় তা জ্বলজ্বলে অক্ষরেই লেখা থাকবে। ক্লাইভ অনেক মেহনত করে এদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেব মনে ইংরেজদের উপর যে-আস্থা একটু একটু করে গড়ে তুলছিলেন সেটা এককথায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

॥ আঠারো ॥

গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের মনে যদি এই ছিল যে, মীর কাশিম যে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তাতে রামনারায়ণকে বলি দিলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্বের বনেদটা আরো পাকা হয়ে বসবে, তাহলে তাঁর সেই আশার মাথায় বাজ পড়ল।

ক্লাইভ ঠিকই বুঝেছিলেন, পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের যে স্বাদ পেয়েছে তাতে করে তারা আর আগের মতো স্থির হয়ে বসে কেবল কাজকারবার নিয়েই খুশি থাকবে না, রাজত্ব করতে চাইবে। সেইজন্যে তিনি আগের থেকেই কৌশলে নবাবের ক্ষমতা কতকটা খর্ব করে সেই জায়গায় ইংরেজদের হাল খানিকটা জোরালো করবার দিকেই মন দিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁর সে-কৌশল ধরতেই পারলেন না। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মতো তিনিও মনে করে বসলেন, রাজত্ব করা তো নবাবদের কাজ, বাণিজ্য করাই সওদাগরদের কর্তব্য। সুতরাং সুবেদার-বাহাদুরের সঙ্গে দোস্তি রাখতে পারলেই কোম্পানীর লাভ, তাহলেই তাদের ব্যবসা বেশ জোর চলতে থাকবে। দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর ডিরেক্টররাও বার বার চিঠিপত্রে তাঁদের কর্মচারীদের ঐ একই নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বিধাতা যাদের কপালে রাজত্ব করাটাই মেপেছেন, তাদের শুধু ব্যবসা নিয়ে মেতে থাকতে ইচ্ছে যাবে কেন?

রামনারায়ণকে হাতে পেয়ে মীর কাশিম সর্বাগ্রে তাকে বিহারের ডেপুটি গভর্নরের পদ থেকে হটিয়ে ফেললেন। তাঁর হিসেবপত্র খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে তাঁরই সঙ্গে যাঁর সর্বদা টক্কাটক্কি চলছে সেই রাজা রাজবল্লভকেই ঐ কাজে বসিয়ে দিলেন। অনেকদিন ধরেই রাজবল্লভের বিহারের ডেপুটি গভর্নরির উপর প্রচণ্ড লোভ, শুধু ইংরেজদেরই ভয়ে এতদিন রামনারায়ণকে ল্যাং মেরে কাত করে ফেলতে পারেননি। সুতরাং তাঁর অডিট রিপোর্ট যে কি ধরণের হল তা বোধ করি আর খুলে বলে দিতে হবে না। তবে আসল কথা হচ্ছে, হিসেব-টিসেব নেওয়া ওসব একটা মস্ত ফার্স—ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সাজানো জিনিস। তবু এই রিপোর্ট দেওয়ার ফলেই

রাজা রাজবল্লভ বিহারের নায়েব নাজিম হয়ে পাটনায় জাঁকিয়ে বসলেন। কিন্তু সে নিতান্ত দু দিনেরই তরে। দু-মাসও যেতে তর সইল না।

মীর কাশিম রামনারায়ণের যথাসর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়েও সন্তুষ্ট হলেন না। সমস্ত খুইয়ে রামনারায়ণ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি ভিক্ষা করলেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। মীর কাশিম তাকে পাটনা ফোর্টে কয়েদ করে রাখলেন। রামনারায়ণের বাড়ি থেকে প্রত্যাশা মতো টাকা না পাওয়ায় মীর কাশিম অনুমান করে নিলেন যে, রাজাবাহাদুর তাঁর ধনসম্পত্তি আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব আশ্রিত-অনুগতদের মধ্যে চারিয়ে রেখেছেন। সুতরাং তাঁদেরও উপর জুলুম জবরদস্তি শুরু হতে কিছুমাত্র দেরি হল না। রামনারায়ণের ব্যাংকার থেকে আরম্ভ করে সামান্য দাসদাসী পর্যন্ত কেউই বাদ গেল না, কিছু-না-কিছু উগরে দিয়ে অবশেষে সবাইকেই ফাটকে যেতে হল। পলিটিক্সে দেখা যায়, যিনিই হাতে ক্ষমতা রাখতে চান তিনিই তো প্রতিপক্ষের ঝাড়কে ঝাড় উপড়ে সাফ করে দেন—এইটেই তো সনাতন ধর্ম, নতুন কিছু নয়। তাতে অনেক নির্দোষ নিরীহ লোকের প্রাণ যায় বটে, কিন্তু তার আর উপায় কি?

এই হিড়িকে বিহারের অনেক মান্যগণ্য মালদার ব্যক্তিরও সর্বনাশ হল, তা সে কি হিন্দু আর কি মুসলমান। কারো প্রাণ গেল, কেউ সর্বস্বান্ত হলেন, কেউ জেলে গেলেন, কেউ দেশ ছেড়ে পালালেন, কেউ-বা আবার দীনহীন অবস্থায় আত্মগোপন করে দিন কাটাতে লাগলেন। রাজা মুরলীধর, ব্যাংকার মনসারাম সাহু, রাজা সুন্দরসিং, তাঁর খাচাঞ্চি গঙ্গাবিষ্ণু, পাটনা শহরের কোতোয়াল মহম্মদ ইশাখ, মুস্তাফা কুলী খাঁ, শাদুল্লা খাঁ—কত আর নাম করব—সবাই একে একে মীর কাশিমের কোপে পড়লেন। ডেপুটি অডিটর-জেনারল সীতারাম এতদিন অন্যকে ধরিয়ে দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি করছিলেন। ভেবেছিলেন, তিনি পর্বতের আড়ালে আছেন, তাঁর কিছু হবে না। কিন্তু তিনিও শেষে নবাবের সন্দেহ এড়াতে পারলেন না। মীর কাশিম তাঁরও সর্বস্ব আত্মসাৎ করে নিয়ে শেষে গুণ্ডা লাগিয়ে তাঁকে খুন করালেন।

সিয়র-উল্-মুতাক্ষরীনের গ্রন্থকার গোলাম হোসেনের সঙ্গে ইংরেজদের সদ্ভাব থাকায় মীর কাশিম তাকে মাঝে মাঝে দূতের কাজে লাগাতেন। সম্প্রতি কাউন্সিলের বড় এক মেম্বর পিটর এমিয়টকে ভজাবার জন্যে মীর কাশিম গোলাম হোসেনকে কলকাতা পাঠালেন। কাউন্সিলের যেসব মেম্বর নবাবের বিরুদ্ধে, তাঁদের মধ্যে এমিয়ট প্রধান। পাটনা কুঠির এই পুরনো বড়-সাহেব গোলাম হোসেনের বন্ধু। গোলাম হোসেন পুরো না হোক, খানিকটা

কার্যোদ্ধার করে এসে নবাবকে সব নিবেদন করলেন। নবাব তাঁকে অনেক সাধুবাদ দিয়ে অবশেষে জানালেন, তাঁর কাছে নবাবের এক প্রার্থনা আছে। গোলাম হোসেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিনয়ের বহর দেখে সহজেই অনুমান করে নিলেন, এইবার একটা মারাত্মক-রকমের কোনো প্রস্তাব আসছে। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে রেখে তিনিও বাইরে ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন— এই দীনহীন অভাজনের কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব-বাহাদুরের কি প্রার্থনা থাকতে পারে? গরিবের এমন কি বস্তু আছে যা সে হুজুরের দৌলতখানায় নিবেদন করতে পারে?—এই বলে সঙ্গে সঙ্গে এক ফার্সী বয়েতও আউড়ে দিলেন—বোগদাদের কোন জিনিসটাই মহামাণ্য খলিফার নয়?

তখন মীর কাশিম ভদ্রতার ঘোরপ্যাঁচ ছেড়ে সাদা কথায় জানিয়ে দিলেন, মুঙ্গেরে গোলাম হোসেনের যে জাইগির আছে সেইটেতেই নবাবের দরকার পড়েছে। ঐ জাইগিরটা নবাব তাঁর জেনারল গুরগিন খাঁকে বখশিশ করবেন বলে আগের থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, এতক্ষণ যা বলে গেলেন, সে শুধু কথার কথা। জাইগির তিনি গোলাম হোসেনকে কিছু না জানিয়ে ইতিপূর্বেই দখল করে নিয়েছেন। সেখানে যে কেল্লা ছিল সেটার মেরামতও শুরু করিয়ে দিয়েছেন। গোলাম হোসেনকে মাথা নিচু ক'রে চুপ থাকতে দেখে নবাব বললেন, ঐ কেল্লার পাশেই তো সরকারী কেল্লা। দুই কেল্লার লোকদের মধ্যে কারণে অকারণে সর্বদাই কথা কাটাকাটি চলবে. শেষে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে গিয়ে দাঁড়াবে। তাই নবাব আগেভাগেই সাবধান হয়ে ওটা নবাব প্রস্তাব করছেন, তিনি তার বদলে ওর চেয়ে ঢের ভালো এক জাইগির তাঁকে বখশিশ দেবেন। কিন্তু ভালো জাইগির ছেড়ে মন্দ একটুকরো জমিও গোলাম হোসেনের কপালে আর জুটল না।

নবাব শুধু এঁটে উঠতে পারলেন না রাজা সিতাব রায়কে। দারুণ অত্যাচারে কাবু না হয়ে সিতাব রায় নিজের বাড়িতে বসেই মীর কাশিমের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া স্থির করলেন। কিন্তু তখনো পাটনার কুঠিতে এমন কজন ইংরেজ কুঠিয়াল ছিলেন যাঁরা সিতাব রায়ের বারত্বের কথা একেবারে ভুলে যাননি। ইংরেজ সেপাইদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি কি অসীম সাহসেই না পুনিয়ার বিদ্রোহী ফৌজদার খাদেম হোসেনের সঙ্গে লড়াই করে জিতে এসেছিলেন, সে-কথা তো সহজে ভোলবার নয়। তাঁরা সকলে গিয়ে মীর কাশিমকে কোনোক্রমে ঠাণ্ডা করে সিতাব রায়কে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতার কাউন্সিল অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন,

তাঁর এখন আর নবাবের এলাকায় বাস করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সিতাব রায় নিজেও তাই ঠিক বলে মনে করলেন। পাটনায় ফিরে এসে সব গোছগাছ করে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। একদল ইংরেজ সেপাই-পল্টন তাঁকে সরযূনদী পার করে দিয়ে এল। সিতাব রায় সেখান থেকে বাদশা শা আলমের কাছে গিয়ে তাঁর সরকারে চাকরি স্বীকার করলেন।

এইবার মীর কাশিম নিশ্চিন্ত মনে জমিদারদের নিয়ে পড়লেন। দক্ষিণ-বিহারের দু-জন বড় জমিদার—ফতেসিং আর বুনিয়াদসিং—নবাবের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টায় পাটনায় এসে পা ফেলতেই সোজা কয়েদ হলেন। তার পর উত্তরের দুর্ধর্ষ ভোজপুরী জমিদারদের পালা। নবাব ভোজপুর-অভিযানে যাচ্ছেন শুনে ভ্যান্সিটার্ট তাকে একদল ইংরেজ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন, কিন্তু নবাব তা নিলেন না। না-নেবার একটা খুব বড় কারণ ছিল। সেটা একটু খুলেই বলতে হয়। সেবার বীরভূম জয় করতে গিয়ে মীর কাশিম পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, নবাবী ফৌজ কতদূর অকেজো হয়ে পড়েছে। সেই থেকে তিনি স্থির করেছেন, তাঁর সৈন্যসামন্তদের ইওরোপীয়ন রীতিতে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তাদের এমনি কাজের লায়েক করে তুলবেন যে, তারা যেন ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু তার জন্যে তো জনকতক ভালো অফিসর দরকার, তা পাওয়া যায় কোথা? মীর কাশিম ইংরেজ অফিসর মোটেই চান না। ফরাসীরা তো বঙ্গদেশ থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। অগত্যা মীর কাশিমের নজর পড়ল আরমানীদের উপর। তাদের মধ্যে থেকে তিনি খুঁজে বের করলেন খোজা গ্রেগরীকে। খোজা গ্রেগরী ব্যবসাসূত্রে ইসপাহান থেকে বঙ্গদেশে আসেন। হুগলি আর চুঁচড়োয় তখন অনেক আরমানী সওদাগরের বাস। গ্রেগরী হুগলিতে দোকান খুলে গজকাঠি দিয়ে কাপড় মেপে মেপে তাই খদ্দেরদের বেচতেন। তাঁর বড়ভাই খোজা পিত্রুসের সেসময় বেশখানিকটা নামডাক ছিল। তিনি যদিও কারবারী লোক তবু লাভের আশায় যখন-তখন পলিটিক্সে ঠোকর মারতেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে মীর জাফরকে যখন বাংলার মসনদে বসাবার চক্রান্ত চলছিল তখন এই খোজা পিত্রুসই মধ্যস্থ হয়ে মীর জাফরের তরফ থেকে ইংরেজদের সঙ্গে কথাচালাচালি করেছিলেন। তারপর পলিটিক্সে সচরাচর যা হয়, পিত্রুসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। মীর জাফর বাংলার নবাব হয়ে বসে উপুড়হস্ত তো হলেনই না, উপরন্তু খোজা পিত্রুসকে আর তেমন আমলই দেন না, এমন ভাব দেখান যে, যেন

কস্মিনকালেও তাঁকে চোখে দেখেননি। তখন খোজা পিক্রুস মীর কাশিমের দলে ভিড়ে গিয়ে মীর জাফরের উচ্ছেদসাধনে মন লাগালেন।

বোধ হয় ঐ সূত্রেই খোজা গ্রেগরী মীর কাশিমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকবেন। কিন্তু জোর করে কিছু বলা যায় না, কারণ ও-সম্বন্ধে কোনো ইতিহাসের বইয়ে কোনো কথার উল্লেখ নেই। সে যাই হোক, এই কাপড়াওয়ালা আরমানীর মধ্যে মীর কাশিম কি করে যে এক বড় যোদ্ধার সন্ধান পেলেন, তা বলা শক্ত। কিন্তু দেখা গেল, নবাব হবার অল্প কিছুদিন পরেই মীর কাশিম খোজা গ্রেগরীকে তাঁর ফৌজের কমাণ্ডার-ইন-চিফ করলেন, মুসলমান কেতায় তাঁর নতুন নামকরণ হল গুরগিন খাঁ। নবাব মীর কাশিম কিন্তু লোক চিনতে খুব ভুল করেননি। লড়াই সম্বন্ধে গুরগিন খাঁর এমন একটা সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল যার বলে ক্লাইভের মতো তিনিও যুদ্ধবিদ্যা না শিখে, তার চর্চা না করেও, এক বড় জেনারল হতে পেরেছিলেন।

গুরগিন খাঁ নবাবী ফৌজ ঢেলে সাজাবার ভার নিজের হাতে নিলেন। এক মস্ত জোরালো কাজের কাজী ফৌজ তিনি প্রায় গড়েও এনেছিলেন। আর দুটি বছর সময় পেলে গুরগিন খাঁর হাত দিয়ে মীর কাশিমের এমন এক ফৌজ তৈরি হয়ে বেরোত যে, তাদের লড়াইয়ে হারাতে ইংরেজদের মতো দুঁদে লড়িয়েদেরও হিমসিম খেয়ে যেতে হত। শুধু ফৌজ তৈরি নয়, গুরগিন খাঁ নতুন ধরনের বন্দুক কামান গড়ারও বন্দোবস্ত করে ফেললেন। মুঙ্গের ফোর্টের ভিতর তিনি হাতিয়ারের এক বিরাট কারখানা ফেঁদে বসলেন। গুরগিন খাঁর তদারকে মুঙ্গেরে তৈরি বন্দুক পিস্তল কামান বিলেতে তৈরি ঐসব অস্ত্রকেও টেক্কা দিতে আরম্ভ করল।

যেখানে যত আরমানী কি ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো ইওরোপীয়ন সৈন্য কিম্বা অফিসর পাওয়া যেত, সবাইকে আদর করে ডেকে নিয়ে এসে মীর কাশিম তাঁর ফৌজে ভর্তি করতে লাগলেন। আরমানী ক্যাপ্টেন মারকার অফিসর হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন। আর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ক্যাপ্টেন সমরুর জোড়া পোক্ত লোক ঐ দলে দ্বিতীয় আর একটি কেউ ছিল না। সমরুর আসল নাম ওয়ালটার রাইনহার্ট। ইনি জারমান সুইস। কেউ কেউ বলেন ইনি প্রথমে কসাই ছিলেন পরে পল্টন হন। শোনা যায়, তাঁর এমন ভীষণ বদখত চেহারা ছিল যে, ইওরোপীয়নরাও সবাই নাকি তাঁকে "সাম্বার" আখ্যা দিয়েছিল, মুখে মুখে তারই অপভ্রংশ দাঁড়াল সমরু। অনেক ঘাটের জল খেয়ে ইনি শেষে মীর কাশিমের সৈন্যদলে এসে ভর্তি হলেন। জীবনের শেষ

দিকে ইনি জেবউন্নিসা বলে উত্তরপ্রদেশের এক মুসলমান নর্তকীকে বিবাহ করে সেইখানেই নবাবী করতে থাকেন। বেগম সমরু অনেক বয়েস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। শেষে মস্ত বড় এক জমিদারনী হয়ে পলিটিক্সেও নেমে ছিলেন।

মীর কাশিম পরখ করে দেখবার জন্যে গুরগিন খাঁর হাতের আধা-তৈরি একদল সেপাই নিয়েই ভোজপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। ভোজপুরী জমিদাররা নামে জমিদার হলেও আসলে ছিলেন এক একটি দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার। তাঁরা নবাব-বাদশাকে তুচ্ছজ্ঞান করে এমনভাবে চলতেন ফিরতেন যে মনে হত যেন সবাই এক একটি করে স্বাধীন নৃপতি। রাজা রামনারায়ণ বিহারের ডেপুটি গভর্নর হয়েও তাদের কখনো ঘাঁটাতে সাহস করেননি, বাপু বাছা করে যতটা পারেন ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। মীর কাশিম বুঝে দেখলেন, তাঁর সুবেদারিতে ঢোকার মুখেই ঐ প্রান্তদেশে তাঁর নাগালের বাইরে যদি একদল দুর্দর্ষ জমিদার স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে থাকেন, তাহলে তাঁকে তো সবদাই তাদের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতে হয়। খাজনা তো তাঁদের কাছ থেকে এক পয়সাও আদায় হবে না, উলটে যিনিই যখন লোভবশতঃ সুবে বাংলার দিকে দৃষ্টি হানবেন, ভোজপুরিয়ারা লাভের আশায় তখনি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তুলকালাম লাগিয়ে ছাড়বে। মীর কাশিম তাঁদের উচ্ছেদেরই সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

মীর কাশিম এত বেশি সেপাই নিয়ে যুদ্ধে চললেন যে, তা দেখে লোকদের মনে হতে লাগল নবাব-বাহাদুর মশা মারতে কামান পাতছেন। কিন্তু তাতেই কাজ হল। লড়াই করতে হল না, ধারের বদলে ভারেই কাটল। ভোজপুরী জমিদারদের প্রধান ছিলেন পালোয়ানসিং। নামে পালোয়ান হলেও কাজের বেলায় দেখা গেল অষ্টরম্ভা। ডাকাতি করতে পারেন বটে, কিন্তু মরদের মতো প্রাণপণ করে লড়তে জানেন না। নবাবী ফৌজের বহর দেখেই তিনি পিট্টান দিলেন। পালের গোদাকে ঐরকম করে সরে পড়তে দেখে, আর সবাই নিমেষের মধ্যে কর্মনাশা পার। শেষে কাশীরাজ বলবন্তসিং-এর দয়ায় তাঁরই আশ্রয়ে গাজিপুরে মাথা গোঁজার মতো একটু স্থান পেয়ে দৌড়নো থামিয়ে সেইখানে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে থিতিয়ে বসলেন। ভোজপুরের সব পরগণাই একে একে মীর কাশিমের দখলে এসে গেল। নেপালের সীমান্তে বেতিয়া, সে-অঞ্চলও নবাবের হাতে আসতে দেরি হল না। নবাব আসছেন শুনে অন্যসব জমিদারের মতো সেখানকার জমিদারও পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

এবার মীর কাশিম সসারামে বসে দক্ষিণবিহারে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। পুরনো পাপী কামগড় খাঁ সর্বাগ্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে জঙ্গলে ঢুকে

গেলেন। তার পর তাঁর দেখাদেখি আরো অনেকেই এদিক ওদিক সরে পড়লেন। বিহারের একটি কেল্লাও বাদ গেল না, সবকটাই আস্তে আস্তে নবাবের অধিকারে এসে গেল। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো আর ভালো দুর্গ বোটাসগড। ওটা অবশ্য বাদশাহী জাইগিরের মধ্যে পড়ে। বাদশার এজেন্ট হয়ে রাজা সিতার রায় এতদিন তার দেখাশোনা করে এসেছেন। মীর কাশিম সেখানকার কেল্লাদারকে হটিয়ে দুর্গটা খাসদখলে নিয়ে এসে ফেললেন। বিহারে এমন একটা কেল্লাও আর অবশিষ্ট রইল না যেখানে মীর কাশিম নিজের কেল্লাদার আর নবাবী ফৌজ দিয়ে গড়ভর্তি না করে ছাড়লেন।

জমিদারদের নিঃশেষ করে মীর কাশিম প্রথমে তাঁদের বাড়িতে যা-কিছু অস্থাবর সম্পত্তি পেলেন সবই নির্বিচারে নিজের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তুললেন। শেষে এক এক করে তাঁদের সব জমিজমাও খাসে এনে প্রজাদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায়ের জন্যে সরকারী তশিলদার লাগিয়ে দিলেন। বঙ্গদেশে মীর কাশিম জমিদারদের একেবারে উচ্ছেদ করেননি বটে, কিন্তু বিহারের খানিকটা অংশে তিনি তাঁর নতুন পলিসি চালিয়ে দেখবার সুযোগ গোড়া থেকেই নিলেন।

বিহার-প্রদেশ সুশাসনে রাখবার জন্যে মীর কাশিম এখানেও সেই স্পাই-সিস্টেম চালু করলেন। সরকারের উপর যে-কেউ একটু অসন্তোষ প্রকাশ করত স্পাইরা তখনি সেটাকে ফেনিয়ে-ফাপিয়ে সরকারের কানে তুলে দিত। প্রত্যহই চরেদের এই ছিল কাজ। এর ফলে অকারণে, কি নিতান্ত তুচ্ছ কারণে, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ধনমান তো গেলই, অনেকের আবার গর্দানও তাদের ঘাড়ে আস্ত রইল না। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখে গেছেন, এইসব চর লোকদের দোষ প্রমাণের জন্যে জাল চিঠি বের করতেও কসুর করত না। গোলাম হোসেনের নিজের জানা কজন লোকের লেখা বলে স্পাইরা যেসব চিঠি বের করেছিল তার কতক কতক তাঁর চোখে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। তিনি একটুও দ্বিধা না করে নিঃসংকোচেই সবকটাকে জাল বলে বর্ণনা করে গেছেন। মীর কাশিম নিজেও জানতেন যে ওসব চিঠি ভুয়ো, কিন্তু যাদের সরানোর মতলব করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ওসব চিঠি কাজে আসত বলে তিনি আসল কথাটা চেপে যেতেন, তাই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতেন না। কিন্তু এত করেও স্পাইদেরও সুদিন বড় বেশি দিন স্থায়ী হত না। স্পাইদের উপর স্পাই না বসিয়ে মীর কাশিম কোনো কাজেই এগোতেন না।

দেশের অবস্থাটা স্বচক্ষে লক্ষ্য করে গোলাম হোসেন লিখেছেন যে, ব্যাপার

শেষে এমনি সঙীন হয়ে দাঁড়াল যে, নবাবের দরবারে আর এমন একটি লোকও রইলেন না—তা তিনি যত বড়ই মানমর্যাদাওয়ালা লোক হোন না কেন—যিনি ভয়ে একেবারে মুখ বুজে না থাকতেন, পাছে কিছু বেফাঁস কথা মুখ ফসকিয়ে বের হয়ে পড়ে। রাজবিদূষক মীর্জা শামসুদ্দীনের মতো অত বড় মুখফোঁড় লোক—যিনি নবাব মীর জাফরের নাম দিয়েছিলেন, ক্লাইভের মদ্দা গাধা—রকমসকম দেখে তাঁরও মুখে আর রা সরে না। মোট কথা, কি দূরে আর কি কাছে কোথাও এমন একটিও লোক ছিলেন না যিনি রাতে বিছানায় শুয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা দেখে আঁতকে না উঠে আরামে নিদ্রা যেতে পারতেন। তারিখ ই-মুনস্বরীর রচয়িতা ঐ কথাটাই আরো স্পষ্ট করে যা বলে গেছেন সাদা কথায় তার মানে হল এই যে, পলিটিকাল সাস্‌পেক্ট-মাত্রকেই একাধারে খতম করে মীর কাশিম চারদিকে এমনি এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন যে, সকলেরই একেবারে মুখ বন্ধ। তাতেই লোকে ভুল করে মনে করে বসতো যে, মীর কাশিম বুঝি দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

অথচ মীর কাশিমের এমন কতকগুলো গুণ ছিল আর এমন-ধারা তাঁর কর্মশক্তিও ছিল যে, দেশকে সুশাসনে রেখে দেশে শান্তি তিনি সত্যিই এনে ফেলতে পারতেন, তাতে ইংরেজদের সাহায্য নেবার তাঁর কোনোই দরকার হত না। ওদিকে ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া না বাধিয়ে তিনি তাদের দাবিয়েও রাখতে পারতেন। কিন্তু মীর কাশিমের চরিত্রে অসম্ভব এক সন্দেহবাই আর বর্বরের মতো নির্দয়তা তাঁকে সুপথে বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি, যদিও এগোবার জন্যে তিনি উঠেপড়ে চেষ্টা করে গেছেন, হাতপা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকেননি। তাইতেই দেখা যায় মীর কাশিমের ইতিহাস একটা মস্ত বড় ব্যর্থতারই ইতিহাস হয়ে রয়ে গেছে।

॥ উনিশ ॥

যেদিন নবাব মীর কাশিম ভোজপুরিয়াদের উদ্দেশে পাটনা থেকে বেরোলেন তার কদিন পরেই উইলিয়ম এলিস বলে এক একরোখা তেরিয়া-মেজাজের ছোকরা সিভিলিয়ন কোম্পানীর পুরনো কর্মচারী ম্যাগুয়্যার-সাহেবের জায়গায় পাটনা কুঠির প্রধান হয়ে কলকাতা থেকে সেখানে এসে পৌছলেন। এলিসের কথায় কথায় রাগ, ক্ষণে ক্ষণে অভিমান, পদে পদে বাদ-বিসম্বাদ। পান থেকে চুনটুকু খসলেই তাঁর মনে হতে থাকে, ঐ বুঝি লোকে তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করল। যেসব ব্যক্তি সামান্য একটু-কিছুতেই নিজেদের অপমান ঘটল বলে ধরে নেন, তাঁদের স্বভাবই হল খামকা অন্যকে গুচ্ছের অপমান করে বসা। উইলিয়ম এলিস ঐ ব্যক্তিদেরই একজন।

যে-কারণেই হোক, এলিসও মীর জাফরকে তাড়িয়ে সে-জায়গায় মীর কাশিমকে নবাব করে বসানোটা ভালোভাবে নেননি। সুতরাং গোড়া থেকেই নবাবের প্রতি একটা দারুণ বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়েই তিনি যে পাটনায় নামলেন, সে কথা খুলে না বললেও চলবে। এলিসের মনের কথা কিন্তু মনেই চাপা রইল না, সবাইকার সামনেই তিনি ঐ নিয়ে জোরগলাতেই আস্ফালন করে বেড়াতে লাগলেন। সুতরাং কথাটা নবাবের কানে উঠতে একটুও দেরি হল না। নবাব আরো শুনলেন যে, কলকাতায় থাকবার সময় আম্যার কুট, কারন্যাক, পিটর এমিয়ট প্রভৃতির সঙ্গে একজোট হয়ে এলিসও তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছ-পর্যন্ত চিঠি দিয়েছেন। শুনে, নবাবের মন যে আনন্দে পুলকিত হয়ে না উঠে বেদম খিঁচড়িয়েই রইল, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তিনি বারবার এলিসের নামে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের কাছে নালিশ ঠুকতে লাগলেন যাতে কুট-কারন্যাকের মতো তিনি এলিসকেও কলকাতায় সরিয়ে নেন। নবাব তখনো ঠিক ধরে উঠতে পারেননি যে কলকাতা কাউন্সিলে গভর্নর-সাহেবের দশা প্রায় চরমে উঠেছে। অবশ্য তখনকার দিনের এদেশী কোনো লোকেরই এ-কথা বোঝবার সাধ্য ছিল না, কি কারণে যে কেউ গভর্নর হয়েও সর্বেসর্বা নন, কেন যে তাঁকেও তাঁর কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

কলকাতার গভর্নর থাকার সময় কোম্পানীর চাকুরেদের প্রমোশন-ব্যাপারে

ডিরেক্টরদের একচোখোমির ইঙ্গিত করে ক্লাইভ তাঁদের যে-চিঠি লিখেছিলেন মনোক্ষোভবশতঃ সেটাকে তিনি বাস্তবিক বেশ-একটু কড়া করেই ফেলেছিলেন। আঁতে ঘা লাগায় ডিরেক্টররা এইরকম উদ্ধতপনার একটা বিহিত করবার জন্যে যখন উঠেপড়ে লাগলেন তখন ক্লাইভ তাঁদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন। উইলিয়ম ওয়াট্‌সও দেশে ফিরে গেছেন, হলওয়েল মাঝ-দরিয়ায়। কিন্তু তাতে কি? রুই-কাতলা হাত ফসকালে লোকে তো চুনো-পুঁটির উপরেই তার ঝাল ঝাড়তে থাকে। যে তিনজন নিরীহ কর্মচারী প্রেসিডেন্ট ক্লাইভকে খুশি রাখবার জন্যে সেই চিঠিতে তাঁদের নামসইটুকুই করেছিলেন তাঁরা তখনো কোম্পানীর চাকরিতে বহাল ছিলেন, ডিরেক্টরদের কোপ গিয়ে পড়ল সেই গোবেচারীদেরই উপর। ডিরেক্টররা তাঁদেরই ভাতে মারলেন। ম্যাগুয়্যার, প্লেডেল, সাম্‌নার—এই তিনজন কোম্পানীর চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন। এঁরা সবাই কাউন্সিলে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের সহায় ছিলেন, সদাসর্বদাই তাঁর দিকে ভোট দিতেন। এঁরা যেতে ভ্যান্‌সিটার্ট একেবারে একটেরে হয়ে পড়লেন। এক ওয়ারেন হেস্টিংস ছাড়া তাঁর পক্ষে আর কেউই রইল না। যেখানে যুক্তির বদলে কেবল হাত তুলেই বিচারের কাজ চলে, সেখানে তো ভোটের একটা দাম থাকবেই। যেদিক মাথা গুন্‌তিতে ভারী জয় তো সে-দিকের অনিবার্য।

এলিস পাটনায় আসবার আগে যখন কলকাতা কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন তিনি তখনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন, গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের হয়ে এসেছে, তিনি এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। তাতে এলিসের দাপুনি আরো বেড়ে গেল। পাটনায় পা দিয়েই তিনি এমন চালে চলতে লাগলেন যেন কোথাকার এক খাঞ্জা খাঁ বুঝি-বা এলেন। নবাবের কর্মচারীদের এমন হেয়জ্ঞান করতে আরম্ভ করলেন যে, অতি সামান্য কারণে তাদের কাউকে ধরেন, কাউকে মারেন, কাউকে আবার ফাটকে পাঠান। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এলিস মতলব এঁটে রেখেছিলেন, তিনি এমনি খোঁচাখুঁচি লাগাতে থাকবেন যাতে আর সহ্য করতে না পেরে, নবাব তেতে উঠে নিজেই একটা লড়াই বাধিয়ে দেন। তাহলে মনের ঝাল মিটিয়ে নবাবকে দুষমন বলে দুষতে পারা যেতে পারবে, আর সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও হয়ে যাবে কার গায়ে কত জোর। বছরখানেক ধরে শ্যাকরার ঠুকঠাক চালিয়ে ১৭৬২ সালের প্রায় গোড়া থেকেই এলিস এমন কামারের ঘা মারতে লাগলেন যে, তার ফল বড় ভীষণ হয়ে দাঁড়াল।

এর বছর কয়েক আগে ক্লাইভ যখন মীর জাফরের সঙ্গে পাটনায় এসেছিলেন

তখন ঐ ভাঙখোর নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি বিহার-প্রদেশের সমস্ত সোরার কারবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্যে একচেটে করে নিয়েছিলেন। কথা ছিল, নবাব তার থেকে বছর বছর পঁচিশ হাজার মোন সোরা তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যে নিতে পারবেন। কথাটা মুখেমুখেই রয়ে গিয়েছিল, কাগজে-কলমে আর লেখাজোখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাতে এ-পর্যন্ত কাজের কোনো অসুবিধে ঘটেনি। নবাব তাঁর প্রাপ্য অংশ এতদিন ঠিকঠাকই পেয়ে এসেছেন, তাই নিয়ে কেউ কোনোদিন কোনো কথা তোলেনি।

জেনারল গুরগিন খাঁয়ের এক আত্মীয়, নবাব মীর কাশিমেরই এক আরমানী কর্মচারী, খোজা অ্যাণ্টুনী, নবাবের তরফ থেকে বারুদ তৈরির জন্যে পাঁচ মোন সোরা কাছাকাছি কোথাও না পেয়ে কোম্পানীর মুনিয়াদের কাছ থেকে দাম দিয়েই কিনেছিলেন। আর যায় কোথা? এলিস খোজার নামে চোর অপবাদ দিয়ে সেপাই পাঠিয়ে তাকে ধরিয়ে আনিয়ে পাটনার কুঠিবাড়িতে বন্দী করলেন। অ্যাণ্টুনী কোনো কথা গোপন না করে সত্যি যা যা ঘটেছিল তা সবই অকপটে স্বীকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাফ জানিয়ে দিলেন যে, ঐ সোরা মুফতেই পাবার অধিকার সরকারের আছে, তিনি তো তবু ভদ্রতা করে দাম দিয়ে কিনেছেন।

অ্যাণ্টুনীর জবাব শুনে রাগে গর গর করতে করতে এলিস সিন্দুক থেকে মীর জাফরের দেওয়া পরওয়ানার কপি বের করে নিয়ে এসে খোজার নাকের সামনে ধরলেন। তাতে কোথাও নবাব-সরকারের অমনি অমনি সোরা পাবার কথার নামগন্ধও নেই। কিন্তু বরাবর যে-ধারায় কাজ চলে আসছে, সেটা এলিসের জানা থাকলেও তিনি তার কোনো উল্লেখ করলেন না, একেবারেই চেপে গেলেন। ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে, তাই নিয়ে যে এত হট্টগোল হতে পারে, তা পারতপক্ষেও কারো মাথায় আসেনি। কিন্তু আসল জিনিস মোটেই সোরা নয়। গুরগিন খাঁ নবাব মীর কাশিমকে যে-রকম হাত করে ফেলেছেন আর তাঁর দৌলতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁর স্বজাতি আরমানীদের ক্রমশ যেরকম প্রতিপত্তি দাঁড়াচ্ছে, সেটা এলিস কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না, তাতে সর্বদাই তাঁর চোখ টাটাচ্ছিল। তিনি স্রেফ ইংরেজদের প্রতাপ জাহির করবার জন্যেই সেপাই-পল্টনের পাহারায় অ্যাণ্টুনীকে সোজা কলকাতা চালান করে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এলিস গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে চিঠি লিখে দিলেন, লোকটাকে এমনই কঠিন সাজা দেওয়ার দরকার যাতে তাই দেখে নবাবের কর্মচারীদের যেন শিক্ষা হয় যে ইংরেজরা ঐসব বেয়াদবি কিছুতেই সহ্য করবে না। পাছে

সোরা-চুরির মামলাটা প্রমাণ-অভাবে ফেঁসে যায় তাই এলিস অ্যান্টুনীর বিরুদ্ধে আরো-একটা নালিশ ঠুকে রাখলেন। কিছুদিন আগে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছ থেকে এক-জাহাজ তেঁতুল পাঠাবার এক অর্ডার পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশের চেয়ে বিহারে ভালো তেঁতুল পাওয়া যায় বলে সেটা সংগ্রহ করে কলকাতায় পাঠাবার ভার পড়েছিল পাটনা কুঠির উপর। ঘাটে ঘাটে নবাবের কাস্টমস্ অফিসররা যাতে তেঁতুল-বোঝাই বোট সার্চ না করে মাল ছেড়ে দে সেইজন্যে এলিস কোম্পানীর তরফ থেকে তাঁর নিজের সই-করা এক দস্তক ব পাস গাধাবোটগুলোর মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। ঐ মাল খোজ অ্যান্টুনীর এলাকা দিয়ে যাবার সময় তিনি এলিসের দস্তকের সঙ্গে গুরগিন খাঁর সই-করা আর-একখানা দস্তকও জুড়ে দিয়েছিলেন। এই নিয়ে এলিসের নালিশ হল—অ্যান্টুনীর এত বড় আস্পর্ধা যে, সে কিনা ইংরেজদের দস্তককে খাটো করে তাতে গুরগিন খাঁয়ের দস্তক সেঁটে দেয়? এসব শয়তানি ক্রমশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঐ-সংক্রান্তে অ্যান্টুনীর জবাব ছিল—এলিস সবে পাটনা কুঠির সর্দার হয়ে এসেছেন, তাঁর নাম নবাবের প্রিভেন্টিভ অফিসররা তখনো পর্যন্ত কেউ বড়-একটা শোনেনি। কিন্তু গুরগিন খাঁর নাম তারা সবাই জানে। তাই পাছে তারা অজান্তে ইংরেজ কোম্পানীর মাল আটক করে, সেই ভয়েই তো তিনি গুরগিন খাঁয়েরও একটা দস্তক সঙ্গে দিয়েছিলেন কাউকে কোনোরকম খাটো করার বদ মতলব তাঁর মনে কস্মিনকালেও ঠাঁই পায়নি।

খোজা অ্যান্টুনীকে ঐ অবস্থায় কলকাতা পৌঁছতে দেখে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। ঐরকম এক বিদিকিচ্ছি কাণ্ড এলিস যে করতে পারেন তা তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেননি। তিনি তখন কাউন্সিলে প্রস্তাব আনলেন—খোজা অ্যান্টুনীকে এখনই ছেড়ে দিয়ে এই অশোভন ব্যাপারের জন্যে নবাব-বাহাদুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হোক। কিন্তু এক ওয়ারেন হেস্টিংস ছাড়া আর-কেউই গভর্নরের প্রস্তাবে সায় দিলেন না। উলটে বরং কেউ কেউ এমনও বললেন যে, অ্যান্টুনীকে বড়বাজারে নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে আচ্ছা করে তাঁর পিঠে ঘা-কতক চাবুক কসিয়ে দেওয়া হোক, আর তার পর তাঁর একটা কান কেটে নিয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে বার করে দিয়ে শহরের বাইরে রেখে আসা হোক।

তখন হেস্টিংস উঠে সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে, অ্যান্টুনী নবাবের প্রজা, তাঁর গায়ে হাত তোলার অধিকার ইংরেজদের কি আছে? শাস্তি দিতে হয়

তো নবাবই তা দেবেন। তখন সবাই একমত হয়ে স্থির করলেন, অ্যান্টুনীকে নবাবের কাছেই তাহলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু তিনি যেন অ্যান্টুনীকে বেশ-একটু উত্তমমধ্যম দিয়ে দেন। ভ্যান্সিটার্ট কাকুতিমিনতি করে নবাবকে অনুরোধ জানালেন, কাউন্সিলের মেম্বররা যেমন খাপ্পা হয়ে আছেন, তাতে নবাব যেন দয়া করে এ-বিষয়ে একটা এমন-কিছু বিহিত করেন যাতে সবদিক রক্ষা পায়। মীর কাশিম ইংরেজ গভর্নরের মান রাখবার জন্যে অ্যান্টুনীকে সরকারী চাকরি থেকে বিদায় করে দিলেন।

মীর কাশিম এলিসকেও ভদ্রভাবে এক পত্র লিখে জানালেন, তার কর্মচারীদের কেউ কোনো দোষঘাট করলে সেটা প্রথমে তাকেই জানানো উচিত। সাজা দেবার জন্যে বেঁধেসেঁধে তাকে কলকাতা পাঠালে প্রজাদের কাছে নবাব-সরকারকেই খেলো করা হয়। তাতে নবাবের মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় বটে, কিন্তু ইংরেজদেরও তো সত্যিকার কোনো লাভ হয় না। নবাবের মৃদু-বাক্যে কোনো ফলই হল না। এলিস ছিলেন ঠিক সেই জাতেরই লোক যাঁর কাছে ধর্মের কাহিনী শোনাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। এইসব লোক প্রতিপক্ষের নম্রতা-ভদ্রতাকে দুর্বলতার লক্ষণ বলে ভ্রম করে বসে আরো বেশি করে দাপাদাপি করতে লেগে যান।

গণ্ডগোল পাকাবার জন্যে যাঁরা সর্বদাই ঘাড় উঁচিয়েই আছেন তাঁদের যে কখনো ছলের অভাব হয়েছে, এমন কথা কোনো শাস্ত্রেরই কোথাও লেখা নেই। এলিস কোথা থেকে হঠাৎ এক উড়ো খবর পেলেন যে, কোম্পানীর কজন গোরা পল্টন নাকি দল থেকে ভেগে গিয়ে নবাব মীর কাশিমের ফৌজে ভর্তি হয়েছে, তারা নাকি এখন মুঙ্গেরের কেল্লায় গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। নবাব ঠিক সেই সময় মুঙ্গেরের পুরোনো ভাঙা কেল্লাটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে খানিকটা বাড়িয়ে-চাড়িয়ে নতুন ঢঙে ঢেলে সাজাচ্ছিলেন। সর্বদা হাতের কাছে সেনাপতিকে পাবেন বলে মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডুর গায়ে পীরপাহাড়ের উপর জেনারল গুরগিন খাঁয়ের জন্যেও নবাবী ধরনের এক বিরাট বাড়িও উঠছিল।

নতুন কেল্লার ভিতর বসে গুরগিন খাঁ কি-সব করে বেড়াচ্ছেন, সেইটেই আসলে জানবার ইচ্ছা এলিসের চারপোয়া। সুতরাং খবর কানে আসতেই তার সত্যি-মিথ্যের বাছ-বিচার না করেই এলিস পালানো গোরাদের ধরে আনবার অজুহাতে একজন ইংরেজ সার্জেন্টের তাঁবে একদল তেলেঙ্গী সেপাই দিয়ে তাদের মুঙ্গের পাঠিয়ে দিলেন। হন্তদন্ত হয়ে ডেপুটি গভর্নর রাজা রাজবল্লভের বাড়ি চড়াও হয়ে তাঁকে কেল্লাদার সুজনসিং-এর উপর এমন এক

হুকুম পাঠাতে বললেন যাতে করে সার্জেণ্ট-সাহেব মুঙ্গেরে পৌঁছবামাত্র তাঁকে কেল্লা সার্চ করবার জন্যে সেপাইসুদ্ধ ফোর্টের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়।

রাজা রাজবল্লভ তুনিয়ায় অনেক দেখে অনেক ঠেকে অনেক-কিছু শিখেছেন। তার উপর তাঁর বুদ্ধি শান-দেওয়া ক্ষুরের মতোই ধারালো। কূটচালে সে-বুদ্ধি আরো খোলে। ভাগ্যলক্ষ্মী যে ইংরেজদের উপর কতটা প্রসন্ন, তা তিনি মুর্শিদাবাদে সিরাজউদ্দৌলার হাতে বন্দী থাকার সময়েই টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তার পর থেকে তিনি কৌশলে দু-নৌকোয় পা রেখে চলার চেষ্টাই করতেন। তাই এলিসের কথা শুনে ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখবার জন্যে সব ঠিক করে দিচ্ছেন বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি মাবমুখো এলিসকে তখনকার মতো ঠাণ্ডা করলেন, আবার নবাবের সঙ্গে অকৌশলের ভয়ে কিছু না করেই ঘরের ছেলের মতো চুপচাপ ঘরেই বসে রইলেন।

এলিস রাজবল্লভের দ্ব্যর্থক কথার মানে করে নিলেন যে, কেল্লা সার্চের অর্ডার বুঝি চলে গেল। কিন্তু সেপাই নিয়ে সার্জেণ্ট-সাহেব মুঙ্গের কেল্লার গড়খাইয়ের কাছুয়ান হতেই কেল্লাদার সুজন সিং হাঁকলেন—সব তফাত যাও, সব তফাত যাও। আর এক-পা এগোলে সবাইকে গুলি খেয়ে মরতে হবে বলে ভয়ও দেখালেন। কেল্লার পাঁচিলের উপর সারবন্দী করে তোপ সাজানো আছে দেখে সার্জেণ্ট-সাহেব আর অগ্রসর হলেন না, সেপাইদের নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়েই তাঁবু গাড়লেন। সেখানে বসে সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে এলিসকে এক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন।

রিপোর্ট পড়ে রগচটা এলিস রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। সার্জেণ্টকে কড়া হুকুম দিয়ে পাঠালেন, যতদিন না তাঁকে কেল্লায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে ততদিন তিনি যেন কোথাও একপা না নড়েন; যেমন আছেন ঠিক তেমনি আঁটিগেড়ে যেন সেখানে বসে থাকেন। ইতিমধ্যে এলিস কলকাতার কাউন্সিলে ইয়া লম্বা এক নালিশ ঠুকে বসলেন। এক হেস্টিংস ছাড়া আর সব মেম্বর তারস্বরে হুমকি দিয়ে উঠলেন—নবাবের কেল্লাদার? তার এত বিক্রম যে, সে কিনা ইংরেজদের সেপাইদের উপর গুলি চালাবে বলে ভয় দেখায়, কেল্লা সার্চে বাধা দেয়? এর একটা বিহিত এখনি না করলেই নয়। ভ্যান্সিটার্ট তাঁদের যতই বোঝাতে যান তাঁরা ততই গরম হয়ে রুখে ওঠেন। তিন তিনমাস ধরে এই নিয়ে প্রত্যহ কাউন্সিলে বাদ-বিতণ্ডা চলল। শেষে নিরুপায় হয়ে ভ্যান্সিটার্ট আবার মীর কাশিমের শরণাপন্ন হলেন। সকাতরে মিনতি করলেন, একটা সার্চের ব্যবস্থা নবাব-বাহাদুর যেন কৃপা করে করে দেন।

বন্ধু ভ্যান্‌সিটার্টের অবস্থাটা মীর কাশিম সহজেই ধরে ফেললেন। চিঠিতে জানালেন, চাইলেই যেখানে ছু-চারশো গোরা পল্টন তিনি তু করেই আনিয়ে নিতে পারেন সেখানে ছু-চারজন লোককে তিনি গোপনে কেন তার কেল্লায় স্থান দিতে যাবেন? সেটা কি একটা কথার কথা হল? আর তাঁব কেল্লা সার্চ করার জন্যে সেপাই পাঠাবার এলিসের কি অধিকার আছে? রাজা রাজবল্লভকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, কেউ তাঁর কাছে কেল্লা সার্চের কথা তোলেনি আর তিনিও কাউকে ঐ-বিষয়ে কোনো কথাও দেননি। তাছাড়া স্বয়ং নবাব যখন কাছেপিঠেই আছেন তখন ঐরকম সব গুরুতর ব্যাপার তাঁর কানে না তুলে মীমাংসা করে ফেলবার ভার বাজা রাজবল্লভেব উপব তো দেওয়া নেই।

যাই হোক, মীর কাশিম শেষ পযন্ত ভ্যান্‌সিটার্টকে আর অপদস্থ হতে না দিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের তরফ থেকে মেম্বরদের পছন্দমতো কাউকে মুঙ্গেরের কেল্লা সার্চ করবার জন্যে পাঠাতে বলে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করে এও জানিয়ে দিলেন যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা যদি কথায় কথায় ঐরকম সব বে-আক্কেলে হুকুমজারি করতে থাকেন, তাহলে নবাব-সরকার তা কিছুতেই হজম করে যেতে পারবেন না। আব, কলকাতা কাউন্সিলও যদি ঐসব উদ্ধত অশিষ্ট কর্মচারীকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন তাহলে নবাব সত্যিই বুঝে নেবেন যে, ইংরেজদের সঙ্গে মিলেমিশে সহমানে চলাটা তাঁর কপালে লেখা নেই।

মীর কাশিমের স্পষ্ট কথায় কাউন্সিলের মেম্বরদের একটু চৈতন্য হল। তাঁরা এক ভদ্রগোছের মিলিটারী অফিসর লেফ্‌টন্যাণ্ট গিলবার্ট আয়রন-সাইডকে মনোনীত করে মুঙ্গের পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন কাউন্সিলর ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস লেখাপড়া-জানা মাথা-ঠাণ্ডা বিচক্ষণ ব্যক্তি। পলাশীর যুদ্ধের আগের থেকেই এদেশে আছেন, এদেশের হালচাল সম্বন্ধে কোনো কথাই তাঁর অজ্ঞাত নয়। তার উপর আরো-এক সুবিধা যে, ওয়ারেন হেস্টিংস ফার্সী বলতে-কইতে লিখতে-পড়তে জানেন প্রায় দেশী লোকদেরই মতো। বার্ক শেরিডন মেকলে—এঁরা হেস্টিংসকে যে যতই দুর্জন বলে বর্ণনা করে যান না কেন, হেস্টিংসের চরিত্র সে-সময়কার অনেকেরই চেয়ে ঢের বেশি উন্নত ছিল। কাউন্সিলের সবাইকার ভরসা ছিল, হেস্টিংস নবাব আর এলিস ছুজনকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সব জিনিসটা এমনভাবে মিটমাট করে দিয়ে আসতে পারবেন, যাতে সাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না।

লেফ্‌টন্যাণ্ট আয়রনসাইড মুঙ্গেরে পৌঁছে এলিসের পাঠানো সার্জেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে তন্ন তন্ন করে কেল্লা সার্চ করে একটিও ইংরেজ পল্টনকে সেখান থেকে খুঁজে বের করতে পারলেন না। একটা স্থলো খোঁড়া ফরাসী পল্টনের সাক্ষাৎ পেলেন বটে, কিন্তু সে-ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই নবাবের ফৌজে বহাল আছে। কাজের বার হয়ে যাওয়ায় এখন মুঙ্গেরের কেল্লায় চুপচাপ বসে দিন গুনছে, কবে নবাবের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবে। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জেরা করে, এমন-কি নানারকমের লোভ দেখিয়েও, আয়রন-সাইড বারবার সেই একই কথা শুনতে পেলেন—সে-ব্যক্তি আজ ছ-মাস ধরে একনাগাড়ে ঐ কেল্লায় আছে, কিন্তু তার মধ্যে কেল্লার ভিতরে কেন কেল্লার ধারেকাছেও সে একটিও ইংরেজ পল্টন দেখেনি। লেফ্‌টন্যাণ্ট আয়রনসাইডের রিপোর্ট পেতে এলিস অগত্যা তাঁর সেপাইদের পাটনায় ফেরত আনিয়ে নিতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু সেটা একটুও প্রসন্নচিত্তে নয়। অপ্রস্তুত বনে গিয়ে এলিস মনে মনে আরো বেশি গজরাতে লাগলেন।

মুঙ্গের-পর্ব শেষ করে হেষ্টিংস সসারামে গিয়ে নবাব মীর কাশিমকে ধরলেন। তিনি তখনো সেইখানেই ক্যাম্প পেতে বসে আছেন। তার আগে পাটনায় পৌঁছিয়ে হেস্টিংস এলিসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কুঠিবাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলেন যাতে এলিসের কি সুবিধা-অসুবিধা সেকথা তাঁরই মুখ থেকে শুনে নিতে পারেন, কিন্তু এলিস দেখা দিলেন না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন। সসারাম পৌঁছতে মীর কাশিম হেস্টিংসকে সমাদরে গ্রহণ করে সমস্ত কথা খুলেই বলে ফেললেন। ইংরেজদের সঙ্গে সব কাটান-ছেঁড়ান করে ফেলাটা আদবেই তাঁর মনোগত ইচ্ছা নয়, তবে যদি ইংরেজ কাউন্সিলররা তাঁকে নবাবী মসনদে চড়িয়েও তাকে সুবাদার বলে মানতে না চান, তাহলে সে-কথা তিনি তাঁদের মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষাতেই শুনতে চান। দিনরাত ওরকম বেফায়দা খিটিমিটিতে কি লাভ?

হেস্টিংস মাথা নীচু করে নবাবের নালিশ শুনে গেলেন। সাফ বলতে পারলেন না যে, গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট আর তিনি ছাড়া কাউন্সিলের অন্য সবাই মনে করেন যে, তাঁকে নবাব বানিয়েছে যখন ইংরেজরাই, তখন মীর জাফরের মতো তাঁকেও ইংরেজদের কথামতো উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে হবে। অবশ্য খুলে না বললেও বুদ্ধিমান নবাবের সেটা বুঝে নিতে বাকি রইল না। তবে হেস্টিংস এও দেখলেন যে, এলিসের মতো গোঁয়ারগোবিন্দ ছোকরা পাটনা কুঠির সর্দার হয়ে বেশি দিন সেখানে থাকলে একদিন-না-একদিন একটা

লঙ্কাকাণ্ড শিগ্‌গিরই বেধে যাবে। তিনি নবাবের বক্তব্যটা এলিসকে চিঠিতে জানিয়ে বিবাদ মেটাবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু এলিস হেস্টিংসের চিঠির কোনো জবাব দিলেন না, তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। ভ্যান্‌সিটার্টও এলিসকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে-চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এলিস গভর্নরকে সোজা লিখে দিলেন—নবাবের সঙ্গে তাব সদ্ভাব হলে ভালোই হত, কিন্তু তিনি দেখছেন, সেটা আর হবার নয়।

মীর কাশিমেরও আর ঢাকঢাক গুড়গুড় ভালো লাগছিল না। ইংরেজদের সঙ্গে বাইরের মুখমিষ্টিটুকুনও রক্ষা করে চলতে আর তাঁর মন সরছিল না। তাঁর বেশ মালুম হয়ে গেছে, কলকাতা কাউন্সিলের একদল মীর জাফরের মতো তাঁকেও বাংলার গদি থেকে নামানোর চেষ্টা করছে, আর সেই দল গভর্নরের দলের চেয়ে ঢের বেশি ভারী হয়ে উঠেছে। অবশেষে নবাবের মুখ থেকে ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ে গেল, তিনি সেটাকে টান মেরে সাত হাত দূরে ফেলে দিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ ভ্যান্‌সিটার্টই কেবল হতাশ হয়ে তাঁর বইয়ে আক্ষেপ করে গেছেন—এ যে বড় সঙীন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল দেখছি। নবাব যা-ই বলুন আর যা-ই করুন না কেন, তা সবই ইংরেজদের উপর বিদ্বেষ-বশত—এই ধারণাই কাউন্সিলের সবাইকার মনে। আবার আমাদের সব কথা সব কাজ নবাবের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যেই বলা আর করা—এ-ধারণা নবাবেরও মনে বদ্ধমূল হতে চলল।

॥ কুড়ি ॥

১৭৬২ সালের মাঝামাঝি সময় নবাব মীর কাশিম বিহারের ঝুনো-ঝুনো জমিদারদের টিট করে, খাজনা আদায়ের একটা সুবন্দোবস্ত করে, সীমান্তের গড়গুলোর রক্ষার ব্যবস্থা করে পাটনায় ফিরে এলেন। ফিরে এসে নবাবের প্রথম কাজ হল রাজা রাজবল্লভকে বিহারের ডেপুটি গভর্নরি থেকে সরানো। তার পর তাঁকে সর্বস্বান্ত করে হাজতে পোরা। রাজবল্লভের পলিটিক্সের লীলাখেলা এইখানেই সাঙ্গ হল। দেওয়ান নহবত রায়ের ভাগ্য তখন উঠতির মুখে। রাজা রাজবল্লভের জায়গায় তিনিই হলেন বিহারের নায়েব নাজিম।

নবাব পাটনায় ফিরেছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পাবার জন্যে এলিস তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। মান-অভিমান করে সুযোগ একবার হেলায় হারালে সহজে তো তা আর ফিরে আসে না? মীর কাশিম এলিসের লোককে কাছেও ঘেঁষতে দিলেন না। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নবাব হেস্টিংসকে এক চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি অকপটেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এলিসের দুর্ব্যবহারে তাঁর প্রতি নবাবের মন এমনি বিরক্ত হয়ে আছে যে, এলিসকে হাতের কাছে পেলে তিনি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে হয়তো এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতেন, যে তাকে ভদ্ররীতি বলে কেউই প্রশংসা করতে লেগে যেত না।

ঐ সময় এলিস একটা এটিকেটের কথা তুলে আবার এক বিষম হট্টগোল লাগিয়ে দিলেন। ডেপুটি গভর্নরের নতুন পদ পেয়ে নহবত রায় কেন প্রথমে ইংরেজ কুঠির সর্দারকে সেলামবাজি করতে কুঠিবাড়িতে হাজির হননি? রাজা রাজবল্লভ পর্যন্তও যখন তা করে গেছেন তখন নহবত রায়ই-বা তা করবেন না কেন? আসলে নবাবই ওটা করতে দেননি। পরে তিনি ঐ বিষয়ে কলকাতার কাউন্সিলকে খুলে লিখে দিয়েছিলেন—এলিসের ঐ আবদার অতি অসঙ্গত। ওরকম বায়নাক্কা নবাব কিছুতেই শুনতে রাজী নন। নহবত রায় নবাবেরই প্রতিনিধি, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নাজিমেরই নায়েব। এলিস নিজেকে নবাবেরও চেয়ে বড় মনে করেন নাকি যে, বিহারের নায়েব নাজিম তাঁকে আগেভাগে সেলাম ঠুকতে যাবেন? তিনি কি সত্যি সত্যিই তা

প্রত্যাশা করেন? কথাটা কলকাতার কাউন্সিল যথার্থ বলে মেনে নিলেও এলিস তাঁর নিজের গোঁ ছাড়লেন না।

বিহারের সব বন্দোবস্ত সেরে মীর কাশিম সোজা মুঙ্গেরে গিয়ে উঠলেন। রামনারায়ণ রাজবল্লভ প্রভৃতি যাঁদের তখনো পর্যন্ত প্রাণে মারা হয়নি, জিইয়ে রাখা হয়েছিল, বন্দী অবস্থায় তাঁদের পাটনা থেকে মুঙ্গেরের কেল্লায় এনে ফেলা হল। কলকাতা কাউন্সিলের মেম্বররা গোড়ায় বুঝে উঠতে পারেননি নবাব কেন রাজধানী মুর্শিদাবাদ ফিরে না গিয়ে মুঙ্গেরে রয়ে গেলেন। গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট অনুমান করলেন, মুঙ্গের বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা—তাই বোধ হয় নবাব বর্ষাকালটা সেইখানেই কাটানো মনস্থ করেছেন। কিন্তু যখন বর্ষা গেল, শরৎ গেল, শীতকালও যায় যায়, নবাব মুঙ্গের থেকে নড়বার আর নামটি করেন না, তখন কারো আর বুঝতে বাকি রইল না যে, নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়ে মুঙ্গেরেই সেটার পত্তন করেছেন।

আসল কথা ইংরেজদের হাতে পদে পদে অপমানিত হয়ে নবাব মীর কাশিম বেশ বুঝে নিয়েছিলেন যে, তাঁর বন্ধু হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁকে আর ঐ অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। সুতরাং নিজের মান নিজের হাতে, এই বিবেচনা করে, তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে সরে থাকাই ভালো বলে স্থির করলেন। মুঙ্গেরে আর যাই হোক, মুর্শিদাবাদ ঢাকা আর পাটনার মতো ঘাড়ের ওপর তো কোনো ইংরেজ কুঠি নেই, আর নবাবের কার্যকলাপের উপরে দৃষ্টি রেখে কলকাতার কাউন্সিলে সত্যিমিথ্যে নানা খবর চালান করবার লোকও কাছেপিঠে কেউ উপস্থিত ছিল না। নবাব তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই মুঙ্গেরে বাস করতে লাগলেন।

মুঙ্গেরের কেল্লাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মধ্যিখানে নবাবের নতুন বাড়ি। তাতে দিল্লির লালকেল্লার অনুকরণে দেওয়ান-ই-আম দেওয়ান-ই-খাস রংমহল গোসলখানা ইত্যাদি সবই আছে। সবচেয়ে জরুরী মহল হল মিলিটারী ব্যারাক যেখানে জেনারল গুরগিন খাঁর তদারকে পনেরো হাজার ঘোড়সওয়ার আর পঁচিশ হাজার পয়দল ফৌজ বিলিতী কেতায় ডিসিপ্লিন্‌ড হয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছে। নবাব কেল্লায় বসবাস করতে থাকায় কেল্লার বাইরে মুঙ্গের শহরও ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল।

মীর কাশিমের চরিত্র একটু অদ্ভুত ধরনের। অনেকগুলো বিপরীত গুণ একসঙ্গে তাঁর চরিত্রে স্থান পেয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন ঘোর নিষ্ঠুর, অন্যদিকে আবার গরিব প্রজাদের উপর তাঁর তেমনি অশেষ দয়া। একদিকে

তিনি যেমনি কৃপণ, অন্যদিকে সাধুসন্ত পণ্ডিতব্যক্তি কবি গুণীদের বেলায় তেমনি দানসাগর। একদিকে যেমনি অনাচার, অন্যদিকে তেমনি সুবিচার। যেখানে সন্দেহ হওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয় সেখানে অযথা সন্দেহ, আবার যেখানে সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে সেখানে বেমক্কা বিশ্বাস। ভিতরে ভিতরে মীর কাশিম যেমনি ভীতু, বাইরে তেমনি প্রচণ্ড তাঁর গোঁয়ারতুমির সাহস। সব নিয়ে এক বিচিত্র ব্যাপার।

হপ্তায় দুদিন করে মীর কাশিম নিয়ম বেঁধে দেওয়ান-ই-আম-এ বিচার করতে বসতেন। বাদী প্রতিবাদী দুজনকেই কাছে ডেকে নিয়ে এসে তাদের বক্তব্য বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনতেন। এমন জবর জেরা করতেন যে, সত্যি যা, তা শেষ পর্যন্ত বিলকুল ফাঁস হয়ে বেরিয়ে আসত। নবাবের এমনি কড়া শাসন ছিল যে, এইসব মামলা-মকদ্দমা-সংক্রান্তে কোনো আমলাই একটা আধলাটুকুন পর্যন্ত ঘুষ নিতে সাহস পেত না। ধরা পড়লে শাস্তি বড় ভয়ংকর—একটি কোনো কথা আর নয়, সঙ্গে সঙ্গেই নাক-কান দুই-ই কাটা পড়ে যেত। যে গরিব প্রজার জমিজমা বড়-বড় জমিদার তালুকদার জোতদারেরা রাজা দুর্লভরাম আর রাজা রামনারায়ণের কল্যাণে নিজেরা আত্মসাৎ করে বসেছিলেন, দলিল দেখাতে পারলে, কিম্বা গ্রামের মোড়ল কি কাজির কাছ থেকে স্বপক্ষে এক হকিকতনামা জোগাড় করে আনতে পারলে, সে-জমি উদ্ধার করে তখনি সেই প্রজাকে ফেরত দেওয়া হত। মীর কাশিম জমিদারদের উপরে হাড়ে-চটা ছিলেন। গরিব প্রজাদের উপর তাঁরা জুলুম করছেন জানতে পারলেই নবাব আর তাঁদের আস্ত রাখতেন না।

হিসেবের ব্যাপারে মীর কাশিম এমনই চৌকস যে, দুদিনেই তিনি তাঁর ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টকে ঘষেমেজে তকতকে করে তুললেন। সরকারী আয়ব্যয়ের অন্ধি-সন্ধি সব জানা থাকায় তাঁর আমলে সরকারী টাকার চুরি তছরূপ অপব্যয় সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেটা এদেশে বহুকাল ধরে ঘটেনি, মীর কাশিমের আমলে তাই ঘটতে দেখে লোকে অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। সেকালে সেপাইদের মাইনে তিন-চার বছর ধরে বাকি পড়ে থাকত, তাই লড়াইয়ের সময় যুদ্ধ না করে লুঠপাট করে তারা সেটার উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করত। যদি কোনো বিদ্রোহী জমিদার কিম্বা পররাজ্যলোভী কোনো আগন্তুক নগদ-বিদায়ের লোভ দেখাতেন তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তাঁর দলে গিয়ে জুটে পড়ত। মীর কাশিমের ব্যবস্থায় সৈন্যদের মাইনে মাস মাস হিসেব করে কড়ায়গণ্ডায় চুকিয়ে দেওয়া হত। রাজকর্মচারীদের বেলাও

তাই। তাঁরা ঘুষ নিয়ে হোক আর নিরীহ প্রজার উপর অত্যাচার করেই হোক মাইনের বাকি-বকেয়া উসুল করে ছাড়তেন। সেসব বন্ধ হয়ে গেল। তাঁরা বরাদ্দমতো মাইনে মাসের-পর-মাস হাতে হাতে বুঝে পেতে লাগলেন। যে-সব ব্যক্তি সরকারী বৃত্তি পেতেন তাঁদের দশাও যে পূর্বে কিছু ভালো ছিল, তা বলতে পারা যায় না। কাগজে-কলমে অবশ্য তাঁদের নামধাম বৃত্তির পরিমাণ সব ঠিকঠাক লেখা থাকত বটে, কিন্তু সে-বৃত্তি বৃত্তিভোগীর গৃহমাগতম্ হত ন-মাস ছ-মাসে, অনেক সাধ্যসাধনার পর। মীর কাশিমের কল্যাণে তারা নিয়মিত মাসোহারা পেতে থেকে দু-হাত তুলে তাঁর জয়গান করতে লাগলেন। পুরনো আমলের যে-সব নির্গুণ নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক সরকারী পেনশন পেত তাদের কিন্তু মীর কাশিম একটি পাই-পয়সাও আর দিলেন না। তবে ভালোমন্দ অনেক জ্যোতিষী-দৈবজ্ঞকে মীর কাশিম খুবই খাতির করে পুষতেন। অনেক ঋজু বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও ভবিষ্যৎকে বর্তমানেই জেনে ফেলবার উৎকট আগ্রহে দুস্তর মোহে পড়ে হাবুডুবু খেতে দেখতে পাওয়া যায়। মোট কথা এই যে, মীর কাশিম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গুছিয়ে রাজকার্য চালাবার শক্তির যতটা পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে করে মনে হয় যে, আরো কয়েক বছর যদি তিনি বাংলার মসনদে বসে থাকতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই সুবে বাংলার হাল ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। একটু লম্বা সময় পেলে তিনি গোড়ায় যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন, যে দারুণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাদেরও প্রকোপ অনেকটা কমে গিয়ে দেশে সুশাসন আর শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারত। অবশ্য হতে পারত অনেক-কিছু, কিন্তু সময় না পাওয়ায় হয়নি কিছুই। মীর কাশিমের দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীরা গণনা করে অনেক-কিছুই বলে দিয়েছিলেন, শুধু বলতে পারেননি যে. সব গ্রহেরই উপর ভাগ্যবিধাতা বলে যে এক পরমগ্রহ আছেন তার বিধান ছিল অন্যরকমের। তাঁরা অতশত গণনা করেও এটা ধরতে পারেননি যে বিধাতার বিধানে তখন ইতিহাসের স্রোত বইছে যেদিকে, নবাব মীর কাশিম সাঁতরে চলেছেন ঠিক তার উল্টো দিকে। সেই প্রতিকূল স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মীর কাশিম কিছুতেই আর কূল পেলেন না। তাই ইতিহাসের পাতায় তাঁর দোষগুলোই মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে আছে, গুণগুলো কোথায় ভেসে চলে গেছে।

প্রথম ধাক্কা লাগল কোম্পানীর চাকুরেদের পর্বতপ্রমাণ স্বার্থের গায়ে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝাতে গেলে এর ইতিহাস একটু খুলে বলতে হয়। আজকালকার মতো সেকালেও স্টেটের একটা বড় আয় ছিল বেচা-কেনার

জিনিসের উপব একটা মাসুল বসিয়ে। কিন্তু তখনকার কালের ঐ মাসুল আদায়ের পদ্ধতিটা এখনকার কালেব লোকেব চোখে একটু যেন কিবকম কিবকম ঠেকবে। তখনকাব দিনে এক জায়গা থেকে আব এক জায়গায় মাল পাঠাবার বড বাস্তা ছিল নদীপথ। বাস্তাঘাট তখন তেমন-কিছু ছিল না, যা ছিল তাও খুব নিবাপদ নয়। বড-বড ব্যাপাবীবা তাই জলপথই বেশি পছন্দ করত। আব নৌকোভাডাও ছিল গাডিঘোডা-ভাডাব চেয়ে ঢেব সস্তা, তাই নদীতেই মাল আনাগোনা কবত দিনবাত।

নবাব-সবকাব থেকে জলপথেব জায়গায় জায়গায় চৌকি অর্থাৎ পাহাবা বসিয়ে দেওয়া হত যাতে কবে কেউ ন্যায্য মাসুল ফাঁকি দিয়ে পালাতে না পাবে। মাসুল দেওয়া হলে তাব চিহ্নস্বরূপ একটা দস্তক বা সবকাবী পাস দেওয়া হত। এই দস্তক চৌকিতে চৌকিতে না দেখাতে পাবলে মাল আটক পডত, নৌকো আর এক-পাও এগোতে পেত না। চৌকিদাববা যে সবসময় এক-একটি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিব হতেন, সেটা বললে কেউই সেকথা বিশ্বাস কববেন না। ন্যায্য মাসুল দিলেও প্রত্যেক চৌকিতেই মাল আটকা পডত, অল্পস্বল্প প্রণামী দিয়ে তা ছাডাতে হত। তবে দক্ষিণাটা আজকালকাব তুলনায় খুব কমই বলতে হয়। টাকাটা সিকেটাও পর্যন্ত তখন ওঠেনি—আধলাটা, পয়সাটা, কি ডবল পয়সাতেই কার্যোদ্ধাব হয়ে যেত। তখন আধলাটাবও একটা দাম ছিল আব জিনিসপত্র সস্তা থাকাব দরুন লোকেও অল্পে সন্তুষ্ট থাকত।

দেশী লোকদেব এসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাবা ঐ নিয়ে কোনো দিন কোনো কথা ওঠায়নি। কিন্তু ইংবেজবা এক আচ্ছা মজাব জাত। দেশী বেওয়াজ মেনে নিয়ে সব জায়গায় জল খেতে কিছু-বিছু কবে দিয়ে গেলেই হয়, তা না, উলটে কাস্টমস্ অফিসবাদেব সঙ্গে ঐ নিয়ে তাবা তুমুল তকরার লাগিয়ে দেয়। ফলে অবশ্য হয়বানিব একশেষ, আব কিছু নয়। ইংবেজরা ফৌজদাবেব কাছে নালিশ জানায়, সুবাদাবেব কাছেও দরবাব কবে, কিন্তু তাতে সুবাহা কিছুই হয় না। কিন্তু ইংরেজবা তো আমাদেব মতো শান্ত-শিষ্ট-গোবেচাবা নয় যে তাবা সব জুলুমবাজি চুপ কবে সহ্য কবে যাবে, তাবা এসবেব একটা বিহিত কবাব চেষ্টা কববেই করবে। দিল্লিব বাদশা তখন ফররুখশিয়র। ইংবেজবা চেষ্টাচবিত্র কবে তাঁব দববাবে দূত পাঠিয়ে কার্যোদ্ধাব করে ফেলল। ইংবেজদেব উপব খুশি হয়ে বাদশা একদিন তাদেব এক ফবমান লিখে দিয়ে বসলেন—থোকথাক তিন হাজাব টাকাব মাসুলের বদলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশেব সবত্র স্বচ্ছন্দে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে, মালপিছু

আর আলাদা আলাদা করে মাসুল দিতে হবে না। এটা ১৭১৫ সালের ঘটনা।

কিন্তু এই ফরমান নিয়েও বাদবিতণ্ডা কম চলতে থাকল না। সমস্তটাই কিন্তু ইংরেজদের দোষে। তখন কোম্পানীর কর্মচারীরা এত কম মাইনে পেত যে, তাতে করে তারা এদেশে যে হালে থাকত আর যে চালে চলত, তার খরচ কুলিয়ে উঠতে পারত না। তাই প্রেসিডেন্ট থেকে সামান্য কেরানী পর্যন্ত সবাই নিজের নিজের খাতে স্ব-স্ব ব্যবসা চালিয়ে যেত। তাদের কারবার আবার দেশী জিনিসেরও বেচাকেনা নিয়ে। কোম্পানীর কর্মচারীদের ধারণা ছিল, বাদশা ফরুকশিয়রের ফরমানের বলে ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের মনিবদের জন্যে যে-সব সুখসুবিধা পাওয়া গেছে, তাতে তাদের নিজেদেরও ঠিক সমান অধিকার আছে। সুতরাং বাদশাহী ফরমানের তারা মানে করে নিল যে, কোম্পানীর কর্মচারীরাও একপয়সা মাসুল না দিয়ে নির্বিবাদে দেশের মধ্যে দেশী জিনিসেরও কারবার চালিয়ে যেতে পারবে—মাসুল দেবে কেবল নেটিভ ব্যাপারীরা।

আসলে ফরমান দেবার সময়ে দিল্লি দরবারের কারো মাথায় ঘুনাক্ষরে এটা ঢোকেনি যে, কোনো বিদেশী কোম্পানী এদেশের ভিতরের কোনো দেশী কারবারে হাত চালাবে। সবাই ধরে নিয়েছিল, ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা হচ্ছে জাহাজ করে বাইরের থেকে মাল আনানো আর বাইরেই মাল পাঠানো। তখন সুবে বাংলার সুবাদার আর কেউ নন, মুর্শিদ কুলি খাঁ। ছলনা করে তাঁর হাত থেকে পার পাবার জো একজন কারো ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারীদের বাদশাহী ফরমানের ঐ উলটো রকমের এক মনগড়া টীকাভাষ্য করতে দেখে তিনি তেড়ে উঠে তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওসব চালাকি একেবারেই চলবে না। ইংরেজরা যদি ভালো চায় তো ঐসব নষ্টামি যেন একেবারে ছেড়ে দেয়, নইলে তাদের সামনেই বিশাল সমুদ্র পড়ে আছে, নবাব সেই দণ্ডেই তাদের সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। নবাবের হুমকির চোটে ইংরেজরা সেই যে চুপ করে গিয়েছিল মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে তারা আর টুঁ-শব্দটি করতে সাহস করেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার যে কে সেই। তবে সেটা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে, একেবারে বেপরওয়া হয়ে জোর কারবার চালিয়ে যেতে পারেনি, কারণ মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত সব নবাবই এ-সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সতর্ক ছিলেন, চোখবুজে ইংরেজদের দৌরাত্ম্য কেউই সহ্য করে যাননি।

ভয়ডর সব চলে গেল নবাব মীর জাফরের আমলে। নবাব হবার লোভে মীর জাফর ইংরেজদের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন তাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসার কথার কোনো উল্লেখ ছিল না, কিন্তু কোম্পানীর ব্যবসায় নবাব-সরকার থেকে একটুও বাধা দেওয়া হবে না, এইরকম একটা শর্ত লেখা ছিল। তারই সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর ফ্ল্যাগ উড়িয়ে কোম্পানীরই দস্তক দেখিয়ে নিজেদের প্রাইভেট ব্যবসা দিব্যি মজা করে চালিয়ে যেতে লাগল। কেউই বাদ গেলেন না—গভর্নর, কাউন্সিলর, কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ, কুঠির সদার, মিলিটারী অফিসর, গোরা পল্টন, কেরানী, এমন কি পাদ্রী-সাহেব, স্কুলমাস্টার পর্যন্ত—সবাই চুটিয়ে দেশী মালের কারবার করেন, সরকারকে একপয়সাও মাসুল দেবার কেউ নামও করেন না। শুধু তাই নয়—আজকালকার দিনে যেমন পারমিট, কোটা, লাইসেন্স ইত্যাদি বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতে পারা যায়, সেকালে তেমনি দেশী মহাজনদের কাছে বিলিতী দস্তক বেচে কোম্পানীর ছোকরা কর্মচারীরা বিস্তর মুনাফা খেত। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানেই লাভ সেখানেই লোভ, তারপর আরো লাভের চেষ্টায় জালজচ্চুরি। জাল দস্তকের কারবারও বাঁইবাঁই করে বেড়ে চলতে লাগল।

কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা অবশ্য নিজেরা হাতেনাতে এসব কাজ করত না, তারা এক-একটা করে দেশী গোমস্তা রেখে তাদেরই মারফতে কারবার চালিয়ে যেত। কথাই আছে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। শয়তানিতে ঐসব গোমস্তা তাদের মনিবদের সাতকাঠি উপরে যেত। সমাজের নিতান্ত নীচু স্তর থেকেই ঐসব লোকের আমদানি। তারা কোম্পানীর তকমা এঁটে কেউ-কেটা হয়ে মফস্বলে গিয়ে নিরীহ স্বদেশবাসীদের উপর তম্বিতম্বা করে বেড়াত। জুলুমবাজির চূড়ান্ত। চালানি মালের উপর মাসুল দেওয়া তো ওদের জ্বালায় একেবারে উঠেই গেল, উপরন্তু ওরা গ্রামের হাটবাজার গোলাগঞ্জ আড়ত থেকে সিকি দামে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে সেই মাল বাজারদরের চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রি করত। প্রজারা কেউ একটু প্রতিবাদ করলেই গোমস্তারা নিজেদের পেয়াদাদের কোম্পানীর সেপাই সাজিয়ে তাদের দিয়ে প্রজাদের ধরে আনিয়ে মারপিট লাগিয়ে দিত। মফস্বলে গোমস্তারা এক-একটা ক্ষুদে নবাব হয়ে বসে মনের সুখে অত্যাচার চালিয়ে যায়, তাদের বলবার কেউ নেই। তাদের ইংরেজ মনিবরাও পিছন থেকে হাততালি মেরে এ-বিষয়ে তাদের উৎসাহ দিতে থাকে। নবাব-সরকারের একটা মস্ত বড় আয় এই

ছিড়িকে একদম গোল্লায় চলে গেল। আর ওদিকে শুধু কোম্পানী নয়, কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা আর তাদের দেশী গোমস্তারা দিন দিন ফুলে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

অবস্থা শেষে এমনি বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল যে, শেষঃপর্যন্ত মীর জাফরকেও— যিনি সবসময় ইংরেজের জুতোর তলায় পড়ে আছেন, তাঁকেও—এই নিয়ে ক্লাইভের কাছে নালিশ জানাতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু অমন ঢ্ঁদে লোক হয়েও ক্লাইভ এতে একটুও সামাল দিতে পারেননি। মীর জাফরকে হটিয়ে নবাব হবার সময় মীর কাশিম স্বীকার গিয়েছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে মীর জাফরের যেসব কড়ার হয়েছিল তার সবই শর্ত তিনি ঠিকঠাক মেনে চলবেন। তখন অবশ্য কথা না বাড়িয়ে স্বীকাব না গিয়ে উপায় ছিল না। তখন তর্ক তুলতে গেলে মীর কাশিমকে আর নবাবী পদ পেতে হত না। ইংরেজ কর্মচারীরা তাইতেই ধরে নিয়েছিল, তাদের ঐ বেআইনী ব্যবসাটা ঠিক পূর্বের মতনই বলবৎ রয়ে গেল।

কিন্তু নবাব হয়ে মীর কাশিম অন্য মূর্তি ধারণ করলেন। সরকারের এতবড় একটা ক্ষতি তিনি বেওজর হজম করে যেতে মোটেই রাজী হলেন না। ইংরেজদের স্বভাবই হচ্ছে ছুঁচ হয়ে ঢুকে একটু একটু করে ফাল হয়ে বেরোনো। ইংরেজ কর্মচারীরা প্রথম প্রথম সামান্য দু-চারটে জিনিস নিয়ে কাববার কবতে করতে ক্রমশ ব্যবসা এমনই জাঁকিয়ে তুলল যে, প্রজাদের রোজকার দরকারী জিনিসও তারা অবশেষে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে এনে ফেলল। চাল ডাল আটা ময়দা নুন তেল ঘি চিনি আদা হলুদ আফিম তামাক খড় বাঁশ, এমন কি মাছ পর্যন্ত, কিছুই বাদ যায় না—সবই তাবা বিনা মাস্থলে দিব্বি কেনাবেচা করে যাচ্ছে, কোনো দ্বিধাসঙ্কোচ নেই, কোনোরকম লজ্জা-শরম নেই। মফস্বল থেকে গোমস্তাদের দারুণ অত্যাচারের খবর রোজই নবাবের কানে এসে পৌছতে লাগল। মীর কাশিমও তাই নিয়ে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টকে প্রত্যহ চিঠি লিখে লিখে তাঁকে অস্থির করে তুললেন।

ভ্যান্‌সিটার্ট আর হেস্টিংস দুজনেই মীর কাশিমের যুক্তি ঠিক বলে মেনে নিলেন। বরাবরই তাঁদের ধারণা ছিল, বাদশাহী ফরমান, কি মীর জাফরের সুলেনামা, কিম্বা মীর কাশিমেরও চুক্তিনামা একটা কিছুও কোম্পানীকে ছেড়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের কোনো মালই বিনা মাস্থলে কেনাবেচা করে কারবার চালাবার অধিকার দেয়নি। কিন্তু তখন গত কবছর ধরেই কোম্পানীর কর্ম-চারীরা বিনা মাস্থলে দেশী মালের কারবার চালিয়ে আসছে, তাই ঐ ব্যবসা

একেবারে উঠিয়ে দেবার কথাতেও তাঁরা পুরো সায় দিতে পারলেন না। তবে খানিকটা যাক খানিকটা থাক—এইরকমই তাঁদের মনোভাব। তাঁদের নিজেদেরও তো ঐ প্রাইভেট ব্যবসা আছে। কিন্তু অন্য কাউন্সিলরদের বক্তব্য হল—ছলনা করেই হোক আর জোরজবরদস্তি করেই হোক একবার যে অধিকার হস্তগত হয়েছে, তার তিলমাত্রও ছেড়ে দিতে তাঁরা সম্মত নন। এত বড় একটা লাভের ব্যাপার নবাবের এককথায় বুঝি ছেড়ে দিলেই হল? কাউন্সিলে কথা কাটাকাটি শেষে হাতাহাতিতে দাঁড়াবার জোগাড়।

ওদিকে নবাবও আর তর্কাতর্কি না চালিয়ে নিজের দুই বন্ধুদের, অর্থাৎ ভ্যান্‌সিটার্ট আর হেস্টিংসের, ছাড়া অন্যসব ইংরেজ কর্মচারীর মাল আটক করার ঢালা হুকুম দিয়ে বসলেন, দস্তক থাক আর নাই থাক। তাদের গোমস্তাদের ধরে সদরে চালান করে দেবার অর্ডারও সেই সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

॥ একুশ ॥

অবস্থা এমনি ঘোরালো হয়ে উঠল যে, তাড়াতাড়ি একটা-কিছু বিহিত না করলেই আর নয়। ব্যবসা নিয়ে নবাবের সঙ্গে যে মনান্তর ঘটেছে সেটাকে আর বাড়তে দিলে শেষে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে—এই মনে করে, কাউন্সিল নবাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করে একটা মীমাংসায় আসবার জন্যে স্বয়ং গভর্নরকেই শান্তিদূত করে মুঙ্গেরে পাঠালেন। কিছুদিন আগে নবাব মীর কাশিম নিজেই ভ্যান্‌সিটার্টকে একবার মুঙ্গেরে বেড়িয়ে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন, সুতরাং সেখানে যাবার জন্যে কোনো ছুতোর দরকার হল না। বরং এ একরকম ভালোই হল—এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে। ভ্যান্‌সিটার্ট সম্প্রতি খুব অসুখে ভুগে উঠেছেন, সুতরাং এতে কাজকে কাজও হবে, আবার সরকারী খরচে চেঞ্জকে চেঞ্জও হবে। মুঙ্গেরের জল-হাওয়ার সবাই সুখ্যাতি করে, তার উপর বোটে গঙ্গার হাওয়া তো আছেই। ভ্যান্‌সিটার্ট নবাবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখে দিলেন।

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি ভ্যান্‌সিটার্ট ওয়ারেন হেস্টিংসকে সঙ্গে করে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা মুঙ্গেরের কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই মীর কাশিম শহর থেকে খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে গভর্নর আর তাঁর লোকদের প্রচুর আদরযত্ন করে মুঙ্গেরের কেল্লায় নিয়ে গিয়ে তুললেন। পীর-পাহাড়ের উপর জেনারল গুরগিন খাঁর বাড়িতেই তাঁদের থাকবার স্থান করা হয়েছে। আদর-আপ্যায়নের পর তাঁদের সেইখানেই তুলে দিয়ে আসা হল। গুরগিন খাঁ তাঁদের তদারকে রইলেন।

আমাদের দেশে প্রথম সাক্ষাতেই কোনোরকম ভনিতা না করে আসল কথা পেড়ে চটপট কাজ সেরে নেওয়াটা রেওয়াজ নয়, তাতে সহবতে বাধে। তাই কদিন ধরেই হরদম খানাপিনা নাচগান বাজনাবাদ্যি বাজিপোড়ানো চলতে লাগল। নবাব গভর্নরকে দামী দামী তত্ত্ব পাঠান, গভর্নরও ফিরে তত্ত্বতাবাস করেন। ভ্যান্‌সিটার্টকে চমকে দেবার জন্যে গুরগিন খাঁ একদিন তাঁর সমস্ত সেপাইশান্ত্রী একজাই করে বিলিতী কেতায় কুচকাওয়াজ লাগিয়ে দিলেন।

দেখতে খুবই খোলতাই হল। নবাবের পারিষদরা হাততালি দিয়ে বাহবা বাহবা করে উঠল।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন ঠিক সেই সময় ভ্যান্‌সিটার্টের পিছনেই দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলেন। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট-সাহেব গুরগিন খাঁয়ের রকমসকম দেখে একটু মৃদু হাসি হেসে খাটো গলায় নবাবকে বলেছিলেন—নবাব-বাহাদুর ঐসব সেপাই-পল্টন যে-কোনো দেশী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাঠিয়ে দিলে তারা নিশ্চয়ই যুদ্ধ জিতে ঘরে ফিরে আসবে, কিন্তু তিনি যদি ওদের ইংরেজ সেপাই-পল্টনদের জুড়িদার বলে মনে করে থাকেন তাহলে ঠকবেন। ওরা বিপদের সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুক পেতে লড়ে যাবে না, নবাবকে ফেলে কোথায় যে পালাবে তার ঠিকানাও তিনি আর পাবেন না। কথাটা আসলে গোলাম হোসেনের নিজের না ভ্যান্‌সিটার্টের, সেটা ঠিক করে বুঝে ওঠা শক্ত। তবে এটা সত্যি যে, কেবল বাইরেব খোলস বদলালে কি হবে, নবাবী ফৌজের ভিতরটা তখনো সেই দেশীকে দেশী-মার্কাই হয়ে আছে।

দিন চার-পাঁচ যাবার পর নবাব নিজেই কাজের কথাটা পাড়লেন। তাঁর একটু তাড়া ছিল, নইলে আমোদ-আহ্লাদ আরো কতদিন যে গড়াত তা কে জানে? নবাব শিগ্‌গিরই নেপাল-বিজয়ে বেরবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন, তাই তাঁর আর তর সইছিল না। গুর্খাদের হারিয়ে দিয়ে তাদের দেশের বেশ-খানিকটা অংশ কেড়ে নিয়ে নিজের রাজত্বের সঙ্গে জুড়ে দেবাব আকাঙ্খা নবাবের একটু উগ্র-রকমেরই হয়েছে। তাই তিনি আর-বেশি কথা না বাড়িয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসাটা একেবারে তুলে দেবারই প্রস্তাব করে বসলেন। কিন্তু গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের সঙ্গে ঐ নিয়ে একটু আলাপ করতেই বুদ্ধিমান মীর কাশিম টের পেয়ে গেলেন, সেটা আর হবার নয়। ন্যায়ভাবে হোক আর অন্যায়ভাবে হোক, এই পাঁচ বছরে ইংরেজ কর্মচারীদের গুজরত খোদ ব্যবসাটা সমস্ত দেশময় এমন ঠাস হয়ে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, তাকে এখন উপড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে গেলে সারা ইংরেজ মহলে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে।

শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর এই রফা হল যে, ইংরেজ কর্মচারীরা যেসব দেশী মালের কারবার করছে, সেসব মালের পাইকিরি দরের উপর তারা নবাব-সরকারে শতকরা ন-টাকা হারে মাসুল দেবে। ঐ সংক্রান্তে ভ্যান্‌সিটার্টের নিজের লেখা বর্ণনা পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নবাবকে ঐ শর্ত মেনে নেওয়াতে

পেবে তিনি মনে মনে বেশ-খানিকটা গর্ববোধই করে গেছেন। তাঁব সমস্ত লেখাটাই একটা আত্মতৃপ্তির মৌজে ভরপুর। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা ভালোমানুষ অথচ ঠিক কাজের মানুষ নন, তাঁরা একটা ভারী বিপদকে কাছে আসতে দেখলে, সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে যে-কোনোপ্রকারে হোক তাকে ধামাচাপা দিতে পারলেই মনে মনে বেশ আরাম বোধ করতে থাকেন। কিন্তু সে-আত্মপ্রসাদ আত্মবঞ্চনামাত্র। ঐরকম জোড়াতালি দেওয়ার ফল যে কখনো ভালো হয়েছে বলে তো কোথাও দেখা যায় না। ভ্যান্‌সিটার্ট লিখছেন, ইংরেজ কর্মচারীদের মোটেই কোনো ব্যবসা করার অধিকাব আছে কি না, সেইটেই যখন ঘোর সন্দেহস্থল, তখন দেশী মহাজনরা তাদের মালেব উপর যে মাসুল দেয় তার চেয়ে খানিক কম মাসুল দিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের কাববার চালাবার অধিকাব নবাবের কাছ থেকে পাকা করিয়ে নিতে পারায় তিনি তাদের প্রভূত উপকার সাধনই করলেন। তাব জন্যে তিনি যদি একটু সুখ্যাতির প্রত্যাশা করেন, তাহলে সেটা তেমন কোনো দোষের হয় না। ওদিকে কিন্তু নবাব মীব কাশিম ভালোমানুষ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেইরকম কিছু না হওয়ায় তিনি এক আঁচেই ধরতে পেরেছিলেন, রফা যদিও নামে একটা হল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই চুকেবুকে শেষ হয়ে গেল না, তার জের মিটতে ঢের দেরি।

দস্তক দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধে এই স্থির হল যে, কোম্পানীর দস্তক কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব ব্যবসাযে আর ব্যবহার করবে না। শহর কলকাতার কর্মচারীরা নির্দিষ্ট মাসুল দিলে স্বয়ং গভর্নর-সাহেব তাঁর নিজের নামসইকরা দস্তক তাদের দেবেন আর মফস্বলের কর্মচারীদের ঐ একই নিয়মে সেখানকার ইংরেজ কুঠির সর্দারই দস্তক জোগাবেন। আনুষঙ্গিক আরো কটা ব্যাপারেরও মিটমাট হল। ইংরেজদের গোমস্তারা অনাচার-অত্যাচার করলে নবাবের ফৌজদাররা তাদেব ধবে সাজা দিতে পারবেন। ইংরেজরা দেশী জমিদার-মহাজনদের কাছে ধারকর্জ কিছু করতে পারবে না, জমিজমার বন্দোবস্তও নিতে পারবে না। নবাবের এলাকার মধ্যে যত্রতত্র তাদের আব হাটগঞ্জ বসানোও চলবে না।

সব কথা সাঙ্গ হতে ১৭৬২ সাল কাবার হয়ে গেল। নবাবের সঙ্গে যেসব কড়ার হল সেগুলো একটা কাগজে লিখে ফেলে ভ্যান্‌সিটার্ট সাহেব তাতে সই করে নবাবের হাতে দিলেন। এখন সাহেবকে কলকাতা রওনা করে দিতে পারলেই নবাব বাঁচেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারছেন না,

নেপালের চাঙ-চাঙ সোনার আর সিন্দুকভরা ধনরত্নের স্বপ্ন তাঁকে মাতিয়ে তুলেছে। নবাব ভাবছেন, অমন দুরন্ত ভোজপুরিয়াদের যখন তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আসতে পেরেছেন তখন ঐ জংলী গুর্খাদের ফুঁ দিয়ে হটিয়ে দিয়ে আসতে তিনি কেনই-বা না পারবেন? কে তাঁকে ঠেকায়?

অবশেষে ভ্যান্‌সিটার্ট বিদায় নিলেন। তাঁর শরীরও ফিরেছে, মেজাজও খুশ। গভর্নর-সাহেব যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব-বাহাদুর সেই সইকরা চুক্তির এক একটা নকল জেলায় জেলায় ফৌজদারদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমলা-ফয়লা সবাইকে হুকুম করে দিলেন, ইংরেজদের গোমস্তারা যদি কাগজেলেখা নিয়ম-মতো চলে তো ভালোই—কিছু বলবার দরকার নেই—যদি না চলে, তাহলে আর কথাটি না কয়ে তাদের ধরে সোজাসুজি যেন গারদে পুরে দেওয়া হয়।

ঐসব শেষ করে ১৭৬৩ সালের গোড়াতেই মীর কাশিম নেপাল যাত্রা করবার উদ্দেশে সসৈন্যে মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু নিজে নেপাল পর্যন্ত গেলেন না, জেনারল গুরগিন খাঁকে সেদিকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বেতিয়ায় গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন।

গুরগিন খাঁ গোড়ায় গুর্খাদের একটু হটিয়ে দিয়ে, সেপাই নিয়ে পাহাড়ের উপর খানিকটা চড়ে বসতে পেরেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ীযুদ্ধের কলকৌশল, কায়দাকানুন, রকমসকম, সবই একটু আলাদাধরণের। অনেক দিন ধরে সেসব কসরত না করলে পাহাড়ীদের কাবু করা তো যায়ই না, উল্টে নিজেদেরই নাজেহাল হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। একদিন গুরগিন খাঁর সেপাইরা সারাদিন জোর লড়ে গুর্খাদের পগার পার করে দিয়ে এসে রাত্রে নেতিয়ে পড়ে বেঘোরে ঘুমচ্ছে। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। ঐসময় গুর্খারা যে তাদের কোট ছেড়ে নবাবী ফৌজকে তেড়ে আসতে পারে, সেকথা কারো মাথায় আসেনি। তাই সবাই যখন নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, সেই সময় পাহাড়ের উপর থেকে বড়-বড় পাথরের থান, মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি, শক্ত শক্ত কাদার চাঙ ধুপধাপ করে তাদের ঘাড়ে এসে পড়তে লাগল আর সঙ্গে-সঙ্গেই অগুন্তি তীরের ফলা আর বন্দুকের ছর্‌রা এসে গায়ে বিঁধতে লাগল। ঘুম তো মাথায় চড়ে গেল। গুরগিন খাঁর সেপাইরা জেগে উঠে দেখে, গুর্খারা তাদের কাছেই এসে পড়েছে। কিন্তু তখন আর চাঙ্গা হয়ে উঠে লড়বার ক্ষমতা তাদের নেই। নাকালের একশেষ হয়ে তারা পাহাড়ের নীচে নামতে শুরু করে দিল। তবুও গুর্খারা ছাড়ে না। পিছন পিছন ধাওয়া করে আসে

আর পাথর গুলি তীর যা পায়, তাই ছুঁড়তে থাকে। নবাবী সেপাইরা তার চোটে আর দাঁড়াতে পারল না। রসদপত্র কামানবন্দুক সাজসরঞ্জাম সব যেখানকার জিনিস সেইখানেই ফেলে রেখে যে যেদিকে পারল সেইদিকে ছুট মারল। তাতে লোক মরলও বিস্তর জখমও হল প্রচুর।

হেরে ঢোল হয়ে গিয়ে লজ্জায় দুঃখে জেনারল গুরগিন খাঁ নবাবের সামনে হাজির হয়ে আর মুখ দেখাতেই চান না। শেষে নবাবের প্রিয়বন্ধু আলী ইব্রাহিম খাঁ এসে গুরগিন খাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে তাঁকে সঙ্গে করে নবাবের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু চীনেমাটির ভাঙা বাসনে হাজার জোড়া লাগালেও তাতে যেমন চিড়ের দাগ একটু লেগেই থাকে সেইরকম গুরগিন খাঁয়ের সঙ্গে মীর কাশিমের আবার মিল হলেও নবাবের মনের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানির রেশ একটু রয়েই গেল। তবে বুদ্ধিমানের মতো এর পর মীর কাশিম আর-কখনো নেপাল জয়ের চেষ্টা করেননি।

ইতিমধ্যে মুঙ্গের থেকে পাটনা, পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে, ভ্যান্‌সিটার্ট-সাহেব কলকাতায় ফিরে এলেন। সেখানে পৌঁছিয়েই দেখেন সারা শহর তোলপাড়করা এক তুমুল হৈ-চৈ ব্যাপার। কাউন্সিলের মেম্বররা তো গভর্নরকে ধরে এই মারে তো সেই মারে। কেন তিনি তাঁদের না জানিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের বিনা মাসুলে ব্যবসা করবার অধিকার গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন? এ-বিষয়ে কাউন্সিলের মত ছাড়া নবাবকে পাকাকথা দেবার কি রাইট্ আছে তাঁর? ঐ-চুক্তি কাউন্সিল কিছুতেই মানতে রাজী নন।

ভ্যান্‌সিটার্ট ধরে নিয়েছিলেন, তিনি অনেক ভেবেচিন্তে শ্যামও রাখা আবার কুলও রাখা-গোছের যে নিয়মগুলো তৈরি করে, নবাবকেও তা যখন মানতে রাজী করিয়ে আসতে পেরেছেন, তখন কাউন্সিলের মেম্বররা তো সেগুলো লুফে নিয়ে খুশি মনে মেনে নেবেন। সে-জায়গায় তাঁদের ঐরকম মারমূর্তি ধারণ করতে দেখে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, মফস্বলের সবখান থেকে নালিশ আসতে লাগল, ইংরেজদের অমন একচেটে লাভের ব্যবসাটা একেবারে মাটি হয়ে যাবার জো হয়েছে। নবাবের লোকেরা মাসুল আদায় না করে কোনো মালই ছাড়ছে না, গোমস্তাদেরও ধরে-বেঁধে ফাটকে চালান করে দিচ্ছে। গোলমাল সবচেয়ে বেশি পাটনায় আর ঢাকায়। সেখানকার বাদবিতণ্ডা একটা প্রায় ছোটখাটো দাঙ্গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দু-পক্ষকেই নিজের নিজের সেপাই ডাকতে হয়েছে।

ঐ অবস্থায় কি কর্তব্য তা ঠিক করার জন্যে কাউন্সিলের এক জরুরী মিটিং

ডাকা হল। ভ্যান্‌সিটার্ট স্বপ্নেও ভাবেননি, মীর কাশিম সাত-তাড়াতাড়ি নিয়মগুলো চারিদিকে চাউর করে দেবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতায় ফিরে গিয়ে নবাবে ও তাঁতে একসঙ্গে মিলে রয়ে-সয়ে-বসে এক এক করে মফস্বলের ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে ইস্তাহার ছাড়বেন। এখন ব্যাপারটা যে একেবারে কাউন্সিলে উঠল, সেখানে তো ভোটাভুটির ব্যাপার। সব মেম্বর যাতে কলকাতায় হাজির হয়ে তাঁদের ভোট দিয়ে যেতে পারেন সেইজন্যে অপোজিসনিস্টদেব চাই, পিটর এমিয়ট, কৌশলে দু-মাস ধরে ক্ষণে ক্ষণে মিটিং চালাতে লাগলেন। তুমুল তর্কাতর্কির পর অবশেষে একদিন ভোট নেবাব সময় এল। গুণতিতে দেখা গেল, একদিকে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট আর ওয়ারেন হেস্টিংস, অন্যদিকে বাকি আর সবাই। নবাবের সঙ্গে ভ্যান্‌সিটার্টের সব কড়ারই বাতিল করে দিয়ে কাউন্সিল মেজরিটি ভোটে পাস করলেন—বাদশা ফররুখশিয়র যে ফরমান দিয়েছেন তার জোরে কোম্পানীর মতো কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিনা মাস্থলে নিজেদের ব্যবসা যথেচ্ছা চালিয়ে যাবার অধিকার পেয়েছে। তবে নিতান্ত নবাবের খাতিরে দয়া করে কেবল নুনের কারবারে মালের দামের উপর শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে মাস্থল দিতে পাবলেও পারা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভোটে আরো পাস হল যে, কোম্পানীর নামের দস্তক কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরাও স্বচ্ছন্দে ব্যবহাব করতে পারবে। আর তাদের গোমস্তাদের কোনো সাজা দেওয়া তো দূরে থাক, নবাব তাদের ধরতে-ছুঁতেও পারবেন না। মেজরিটির একটি কথাও ন্যায্য নয়। তবে তাঁরা পাক্কা জানতেন, বাহুবল এখন তাঁদেরই, সুতরাং তাঁরা যা-ই বলবেন সেইটেই হল ন্যায়, সেইটেই হক্‌, সেইটেই হল ধর্ম। তার বিরুদ্ধে যারা, তারা হল দুশমন, তারা হল শয়তান। স্বার্থের গরজ বড় বিষম বালাই, তার কাছে ন্যায় পুণ্য ধর্ম ইত্যাদি কিছুই টিঁকতে চায় না, সবই কোথায় ভেসে চলে যায়। তবে মজার কথা হল এই যে, কোম্পানীর ডিরেক্টররা কাউন্সিলের ঐসব কনসলটেশনের মিনিট্‌সের নকল পেয়ে একেবারে আকাশ থেকে পড়ে মূর্ছা যাবার জোগাড়। কলকাতার কাউন্সিলকে পরিষ্কার জানালেন—তাদের কর্মচারীদের এমনি দুঃসাহস যে, তারা কিনা নিজেদের একেবারে মনিবদের সমকক্ষ বলে মনে করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আর তাঁদের সমান সমান অধিকার দাবি করে বসেছে? তারা যে ডিরেক্টরদের না জানিয়ে গোপনে গোপনে এত বড় এক বাণিজ্য ফেঁদে টাকার আণ্ডিল করে বসেছে, সেকথা কি ঘুনাক্ষরেও তাঁদের জানিয়েছে? না, যাঁদের নুন খাচ্ছে অতবড় লাভের একটুও ভাগ তাঁদের

দেবার একবার নামও করেছে? কিন্তু ডিরেক্টরদের ঐ চিঠি যখন কলকাতায় এসে পৌঁছল তখন সব কর্মই ফতে।

ওদিকে নেপাল বিজয়ে বিফলমনোরথ হয়ে নবাব মীর কাশিম শূন্য হাতেই পাটনায় ফিরলেন। তাঁর মেজাজ তাই তখন বেশ খিঁচড়িয়েই ছিল। পাটনায় পা দিয়েই তিনি শুনলেন, 'এলিস নবাবের জনকতক কর্মচারীকে ধরে কলকাতা চালান করে দিয়েছে—তারা ইংরেজদের মাসুল না দেওয়া মাল পাঠানোতে বাধা দিতে গিয়েছিল। শুনে, নবাবও ইংরেজদের গোমস্তা-পেয়াদাদের ধরে মুঙ্গেরের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু-এক জায়গা থেকে খবর এল, নবাবী সেপাইদের সঙ্গে ইংরেজদের সেপাইদের বেশ-খানিক দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে গেছে।

হাঙ্গামাটা একটু বড় আকার ধারণ করল গয়ার কাছে এক জায়গায় একটা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। ইংরেজ সেপাইদের এক জমাদার এলিস আর ডেপুটি গভর্নর নহবত রায়ের অনুমতি নিয়েই গয়াধামে পিতৃকৃত্য করতে যাচ্ছিলেন। নবাবের লোকেরা তাঁকে স্পাই বলে সন্দেহ করে পথের মধ্যেই তাকে আটক করে ফেলল। খবর পেতে জমাদারকে নবাবের লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এলিস তখনি গোটা-পঞ্চাশেক সেপাই পাটনা থেকে গয়া রওনা করে দিলেন। ওদিকে গয়ার কাছে টিকারিতে তখন নবাবেরও অনেক সেপাই-শান্ত্রী মজুত ছিল। লড়াইয়ের আভাস পাওয়ামাত্রই তারা সেখান থেকে দলবেঁধে ইংরেজ সেপাইদের রুখে গেল। সব নিয়ে একটা বড়গোছের মারামারি হয়ে দাঁড়াল। তাতে ইংরেজদের দিকের একটা হাবিলদার মারা পড়ল আর জনকতক সেপাই একটু বেশি রকম জখম হল। বাকিরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পাটনায় পালিয়ে বাঁচল। ব্যাপার শুনে এলিস রাগে ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন।

তার পর আরো-একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যেটা এলিসের রাগ পড়বার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। পাটনা শহরের পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যে একটা ছোট গেট বসানো ছিল, সেটা ইংরেজ-কুঠির একেবারে গায়েই। শর্টকাট হয় বলে শহরে যাবার দরকার পড়লে কুঠির লোকেরা ঐ উইকেট গেট দিয়েই যাতায়াত করত। কিন্তু অল্পস্বল্প সেপাই-পল্টন দল ছেড়ে ঐদিক দিয়েই অন্যত্র পালিয়ে যেত বলে এলিসেরই অনুরোধে নবাব ঐ দরজাটা বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। এলিস বড়-এক আশ্চর্য প্রকৃতির লোক। গেট বন্ধ করতে হয় তিনিই সেটা করবেন, নবাব কেন তাতে হাত দেবেন? নবাব বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন বলেই

এলিসের সেই গেট জোর করে খোলাবার জেদ চড়ে উঠল। কিন্তু কাউন্সিলকে ঐ-বিষয়ে সুপারিশ করে কোনো ফল পাওয়া গেল না। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট যখন মুঙ্গের হয়ে পাটনায় এলেন তখন এলিস তাঁর কাছে আবার নালিশ জানালেন, শহরে যেতে হলে তাঁদের অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে, তাই ঐ ছোট গেটটা খোলানো চাই। কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট-সাহেব তাতে কান দিলেন না। এলিস রাগে দ্বিগুণ গজগজ করতে লাগলেন।

তাব পর নবাব বেতিয়া থেকে পাটনায় ফিরে এসেই শুনলেন, এলিস নাকি গায়ের জোবে ঐ দবজা ভেঙে ফেলবার তক্কে ফিরছেন। তিনি তখনি দেওয়াল ঘিবে এক খাত খুঁড়িয়ে সেটা জলভর্তি করিয়ে দিলেন। খাত ডিঙোতে না পারলে আর ঐ গেটের কেউ নাগাল পাবে না। ঐ কথা লিখে তার সঙ্গে এলিস কলকাতায় লিখে পাঠালেন, নবাব ইংরেজদের সঙ্গে লডাইয়েব জন্যে তৈরি হচ্ছেন। এখন থেকেই ইংরেজদের সাবধান হতে হবে, নচেৎ শেষে সোজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাদের মরতে হবে। কাউন্সিলে এলিসের পক্ষে অনেকেই। তাঁরা এলিসকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে লিখে পাঠালেন।

শান্তশিষ্ট ধীর-প্রকৃতি নহবত রায় এলিসের মতো দুর্দান্ত লোককে তেমন সামলিয়ে উঠতে পারছেন না দেখে, মীর কাশিম তাঁকে বিহারের ডেপুটি গভর্নরেব পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে, মীর মেহদী খাঁ বলে এক জবরদস্ত ব্যক্তিকে সেই জায়গায় বসিয়ে দিলেন। নহবত রায়কে নবাব নিজের সঙ্গে করে মুঙ্গেরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। নহবত রায় নবাবের পেয়ারের লোক, চাকরি তাঁর গেল না, মুঙ্গেবে তিনি এক উচ্চপদেই বসে রইলেন।

মুঙ্গেরে ফিরে গিয়েই মীর কাশিম স্টেট ব্যাঙ্কারস্ জগৎশেঠদের হৌসেব মহাতপচাঁদ আর স্বরূপচাঁদকে সেখানে আনিয়ে নিলেন। তাঁরা অবশ্য মোটেই আসতে চাননি, কিন্তু জোরজবরদস্তিতে নবাবের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? আসতেই হল: ইদানীন্তন তাঁরা ফাইন্যান্সের থেকে পলিটিক্সেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন ঢের বেশি। মীর কাশিমের একটুও অজানা ছিল না, সিরাজ-উদ্দৌলার আমলে ঐ শেঠেরা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কি এক সাংঘাতিক কাণ্ডটাই না ঘটিয়ে তুলেছিলেন।

মুঙ্গেবে বসেই নবাব শুনলেন, গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাঁর সঙ্গে যে কড়ার করে গেছেন সেটা তাঁর কাউন্সিলের মেম্বররা পত্রপাঠ নাকচ করে দিয়েছেন। এক নুন ছাড়া আর-কোনো মালের উপর তাঁরা এক-আধলাও মাসুল দেবেন না বলে পণ করেছেন। ইংরেজদের উপদ্রবের বিরুদ্ধে নালিশ-ফরিয়াদ করতে

করতে নবাব তো একেবারে থকে গেছেন। তাতে প্রাতকার তো কিছুই হয় না, বরং উৎপাতই ডবল বেগে বেড়ে যায়। ভালো কথায় কাজ হবার নয় দেখে, মীর কাশিম ইংরেজদের ঐ ত্যাঁদড়ামি ঠাণ্ডা করার জন্যে ঠাউরে ঠাউরে বেশ-একটা মজার উপায় বের করে ফেললেন। তিনি এককথায় সারা বাংলা-বিহার মুল্লুকে দু-বছরের মেয়াদে সমস্ত কারবারী জিনিসের উপর থেকে মাসুল উঠিয়ে দিলেন। ঢ্যাড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন— এখন থেকে দু-বছর পর্যন্ত বিনা মাসুলে সকলেই আনন্দে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পাববে।

ঐ সংক্রান্তে গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে মীর কাশিম যে-চিঠি দিয়েছিলেন তার মর্মার্থ হল এই—নবাব আদবেই বুঝতে পারেননি যে, স্বয়ং গভর্নর-সাহেব তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যে-চুক্তি করে গেলেন, সে-চুক্তি তাঁর কাউন্সিলের লোকরা রদবদল করে দিতে পারেন। আর, বিলিতী নিয়মে কাউন্সিলের কথা যে গভর্নরের কথার চেয়ে অত বড হতে পাবে, সেটাও তাঁর মাথায় কখনো ঢোকেনি। যাক, ঐ নিয়ে অনেক-কিছুই হয়ে গেল, আর না। ইংরেজদের দৌরাত্ম্যে তিনি কোথাও থেকে আর একপয়সা মাসুল আদায় করতে পারছেন না। লাখ লাখ টাকার ক্ষতি তাঁকে মুখবুজে সহ্য করে যেতে হচ্ছে। মাসুল চাইলে সবাই কোম্পানীর চোরা-দস্তক বের করে দেখায়। তাঁকে শুধু শুধু চৌকি দেবারই মোটা খরচ জুগিয়ে যেতে হচ্ছে, আদায়ের ঘরের অঙ্ক তো একেবারেই শূন্য। মাসুল নিয়েই যখন অত হাঙ্গাম-হুজ্জত, বিবাদ-বিসম্বাদ, মন-কষাকষি, তখন তিনি নিজের প্রচুর লোকসান স্বীকার করেও দু-বছরের জন্যে দেশ থেকে সমস্ত মাসুলই মকুফ করে দিলেন। দেশী বিদেশী সবাই তাঁর রাজত্বে মনের সুখে কারবার করুক—এই তাঁর ইচ্ছা।

নবাবের এক বোড়ের চালেই ইংরেজদের ঐ ফলানো কারবার রাতারাতিই কুপোকাত। ইংরেজ মহলে হায় হায় পড়ে গেল। তাঁরা জিগরতে লাগলেন— নিজের রাজত্বেও মাসুল রেয়াত করার অধিকার নবাব-সুবাদারের নেই—যদি তাতে ইংরেজদের ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয়। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের স্বপক্ষে দুকথা বলার চেষ্টা করতে গেলেন বটে, কিন্তু অপোজিসনিস্টদের গলাবাজিতে তাঁর প্রতিবাদ কোথায় ডুবে গেল।

॥ বাইশ ॥

এবার অপোজিসনিস্টদেব সবাই মিলে স্থির করলেন, নবাবের কাছে তাঁদের এক ডেপুটেশন পাঠানো যাক, তাতে হয়তো ভ্যান্‌সিটার্টের ডেপুটেশনেব চেয়ে ফল খানিকটা ভালো পাওয়া যেতে পারে। কাউন্সিল পিটর এমিয়ট আর উইলিয়ম হে বলে দুজন মাতব্বরকে নবাবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে মুঙ্গেরে পাঠানো সিদ্ধান্ত করলেন। এমিয়ট অনেকদিন ধরেই এদেশে আছেন। এদেশের হালচাল দেখেশুনে তিনি বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন। কাউন্সিলরদের খুবই ভরসা, তিনি নবাবকে কায়দায় এনে ফেলে শিগ্‌গিরই বখেড়া মিটিয়ে আসতে পারবেন। নবাবের কাছে চিঠি চলে গেল, তিনি যেন ইংরেজদের এই ডেপুটেশন পাঠানোতে মত করেন।

কিন্তু মীর কাশিম গোড়াতে মত দিলেন না। তিনি লিখলেন, এখন আর ঝগড়ার কি আছে? বিবাদ-বিসম্বাদ যাতে আর না থাকে সেই কারণেই তো তিনি ঐ নতুন-রকমের ব্যবস্থা করেছেন। ইংরেজেরা তো স্বচ্ছন্দে সর্বত্র ব্যবসা করে যেতে পারবে, কোথাও তো তাদের কোনো মাসুল দিতে হবে না, কেউই তাদের কারবারে কোনো বাধা দেবে না। সুতরাং আলোচনার আর কি দরকার? নবাবের চিঠি পড়ে মেম্বররা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেও বাইরে উষ্মা প্রকাশ না করে ভদ্রভাবেই লিখলেন, এমিয়ট আর হে রওনা হয়ে গেছেন, নবাব-বাহাদুর যেন অনুগ্রহ করে তাঁদের ফিরিয়ে না দেন। চিঠিটা বিনয়ভরা হলেও তাতে বেশ-একটু জোরেরও আভাস ছিল।

জবাব এল। নবাব রাজী হয়েছেন বটে, কিন্তু চিঠি পড়ে বেশ বোঝা যায় যে, সে যেন নিতান্ত দায়ে পড়ে। তিনি লিখেছেন, সুবে বাংলার নবাবেব তো এখন কেবল একখণ্ড জমিই ভরসা। তারই আয়ে তাঁর রাজত্ব চলে। সে-সম্বন্ধেও যদি ইংরেজদের কোনো নালিশ থাকে, তাহলে সাহেবরা এসে তা খুলেই বলুন। কিন্তু তাঁরা যেন দয়া করে একগাদা সেপাইশাস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে না আসেন। ভ্যান্‌সিটার্ট-সাহেব যেমনভাবে এসেছিলেন, এমিয়ট-হে-সাহেব যদি ঠিক তেমনিভাবেই আসেন, তাহলে নবাব তাঁদের সাদরেই গ্রহণ করবেন। এমিয়ট আর হে তভক্ষণে কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠিবাড়িতে পৌঁছে

গেছেন। সেখানে তাঁদের খবর পাঠানো হল। দুদিনেই তাঁরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে মুঙ্গের রওনা হয়ে গেলেন।

মীর কাশিমের মন সবসময়ই সন্দেহে ভরা। তাঁর মনে হল, এমিয়ট নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলবে মুঙ্গেরে আসছেন। মাসুল নিয়ে আলাপ-আলোচনার কথাটা একটা ছলমাত্র। তার আসল মনোভাবটা যে কি, তা জেনে নেবার জন্যে নবাব ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন আর মীর আবদুল্লা বলে তাঁর এক পারিষদকে ইংরেজদের এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে তাঁর এজেন্ট করে পাঠালেন। তাঁদের সঙ্গে গোটাকুড়িক লোক দিলেন, যাদের দেখে মনে হবে যেন তারা চাকরবাকর, এজেন্ট দুজনের পরিচর্যারই জন্যে হাজির আছে, কিন্তু আসলে তারা হল স্পাই। তাদের উপর হুকুম ছিল, দুপক্ষেরই প্রতিদিনের কথাবার্তা গতিবিধি এমন কি আকার-ইঙ্গিতেরও এক হুবহু রিপোর্ট তারা যেন প্রত্যহ নবাবের কাছে লিখে পাঠায়।

গোলাম হোসেন পিটর এমিয়টের পুরনো বন্ধু। পাটনায় থাকার সময় দুজনের মধ্যে খুবই মাখামাখি হয়েছিল। দুই বন্ধুতে আবার দেখা হতেই দুজন দুজনাকে জড়িয়ে ধরে দেশী প্রথায় কোলাকুলি করলেন। ঐ সুযোগে গোলাম হোসেন কৌশলে এমিয়টের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, চারদিকে যারা ঘুরছে তারা সবাই স্পাই। এমিয়ট খুব চালাক লোক, তখনই সাবধান হয়ে গেলেন। ওদিকে স্পাইদের রিপোর্টে তেমন-কিছু না পেয়ে মীর কাশিমের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। এমিয়টের নৌকো ভাগলপুরে পৌঁছতেই নবাবের হুকুম এল, গোলাম হোসেন আর মীর আবদুল্লা দুজনেই যেন ছিপে চড়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সোজা মুঙ্গেরে চলে আসেন। তারা ফিরে গেলে দুজনকেই নবাব কষে জেরার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁদের টলাতে পারলেন না।

১৫ই মে (১৭৬৩) এমিয়টের দল মুঙ্গেরের ঘাটে নৌকো ভিড়ালেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্যে নবাবের ভাইপো, আবু আলী খাঁ, আর পুরনো রাজকর্মচারী, নহবত রায়, দুজনে এগিয়ে গেলেন। তার পর আবার সেই অভিনয়, সেই আদব-আপ্যায়ন, সেই উপহার দেওয়া-নেওয়া, সেই খানাপিনা নাচগান বাজনাবাদ্যি আতসবাজি—সেই সব হাবভাব ছলাকলা ভদ্রতার ছদ্মবেশ। অভ্যর্থনাপর্ব শেষ হলে নবাব জানতে চাইলেন, কি মনে করে এমিয়ট-সাহেবের কষ্ট করে অতদূর আসা। এমিয়ট তখন পকেট থেকে ইংরেজদের দাবির এক বিরাট দশ দফা ফর্দ বের করলেন। আসলে বড় দুটো

দাবি হচ্ছে, ভ্যান্‌সিটার্টের সঙ্গে চুক্তিটা নাকচ করে সকলকে সেটা জানিয়ে দেওয়া, আর দু-বছরের জন্যে সব মাসুল মকুফ করে নবাব যে-সনদ দিয়েছেন, সেটা রদ করে ফিরিয়ে নেওয়া। তার পর বাকি কথা।

ইংরেজেরা নবাবের কতখানি ক্ষতি করেছেন, তাঁকে সকলের সামনে কিরকমভাবে অপদস্থ করেছেন, তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে এক কাঠের পুতুল বানিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন এইসব গুচ্ছের নালিশ তুলে নবাব একচোট খুব কাঁদুনি গেয়ে নিলেন। কিন্তু এমিয়ট সেসব কথা কানেও তুললেন না, তার ধার দিয়েও গেলেন না। আসলে একটা আপস করার মনোভাবই এমিয়টের ছিল না, তাঁর চেষ্টা শুধু ছলেই হোক কি বলেই হোক নবাবকে ইংরেজদের কথায় লওয়ানো। তাই তাঁর মুখে ভদ্রলোকের মতো কেবলই এক কথা নবাব তাঁদের প্রধান দুই দাবিদাওয়া মানবেন কি না, ঠিক করে বলুন। নবাব তখন গরম হয়ে উঠে বললেন, বছরে দু তিনবার করে চুক্তি করতে আর চুক্তি ভাঙতে, আবার নতুন করে চুক্তি গড়তে, তিনি পারবেন না। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন, সে-চুক্তির একটা শর্তও তিনি এ-পর্যন্ত ভাঙেননি। যা যা টাকা যেমন যেমন দেবেন বলেছিলেন তা সবই কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁর কিছু করবার নেই, নতুন কোনো চুক্তি-কড়ারেরও দরকার নেই।

এমিয়টও তাঁর গোঁ ধরে বসে রইলেন। সর্বত্রই দেখা যায় যে, মনিবের মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর অধীনস্থ লোকদেরও হাবভাবের অদলবদল ঘটতে থাকে। কি করে তারা তখনি তখনি টের পেয়ে যায় যে হাওয়া বদলেছে– সে একটা আশ্চর্য রহস্য। নবাবের সেপাইশাস্ত্রী কর্মচারী চাকরবাকরেরা ইংরেজদের আর ঠিক তেমনি খাতির খাতির করে না। মুখে স্পষ্ট কিছু না বলেও আকারে ইঙ্গিতে কতখানি যে অবজ্ঞা দেখানো যেতে পারে, তা সব চাকুরের মতো তাদেরও বেশ রপ্ত ছিল। তাই সব নিয়ে হাওয়াটা যে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনার পক্ষে খুব সুবিধার হয়ে উঠল না, সেটা বলাই বাহুল্য। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা একটা কিছুই হল না। হবার কথাও নয়। দু-পক্ষের কোনো পক্ষই নিজের খুঁটি ছেড়ে এক-পাও নড়বেন না—ঐ অবস্থায় কি আর একটা-কিছু রফা-নিষ্পত্তি হতে পারে?

হাল আমলের দেশী বিদেশী সব লেখকই ঐ অচল অবস্থার জন্য মীর কাশিমকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ওতে ইংরেজদের অন্যায়টা একটুও কম ছিল না। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যখন তাঁদের

সহায় তখন তো তাঁদের সমস্ত দোষই গুণ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেই। আসল কথা ইংরেজরা কোনো নবাবকেই আর নবাবী করতে দেবে না। ক্লাইভ ঠিকই ধরেছিলেন, ইংরেজদের দিক থেকে দেখতে গেলে মীর জাফরের মতো লোকই হচ্ছেন বাংলার উপযুক্ত নবাব। ভ্যান্‌সিটার্ট মীর কাশিমকে তাই ভেবে নিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন, কারণ তিনি আর যাই হোন না কেন, কারো ধামাধরা হয়ে থাকবার মতো ব্যক্তি একেবারেই ছিলেন না।

দিন-দশেক কথা চালিয়ে এমিয়ট দেখলেন আর-কিছু করবার নেই। মীর কাশিমকে নওয়ানো তাঁর সাধ্যে কুলিয়ে উঠল না। তিনি কলকাতা ফেরবার উদ্যোগ করতে লাগলেন, কিন্তু ঠিক ঐ সময় হঠাৎ এমন-একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, তার জন্যে তখনি আর ফেরা সম্ভব হল না। ২৫শে মে ইংরেজদের ছ-খানা মাল-বোঝাই নৌকা এসে মুঙ্গেরের ঘাটে লাগল, সেখান হয়ে তারা পাটনা যাবে। খোঁজ নিতে দেখা গেল, ছ-ছখানা নৌকোই বন্দুক আর কার্তুজে ভরা। নবাবের বুঝতে বাকি রইল না যে এলিস পাটনায় কি-একটা গোলমেলে কাণ্ড বাধাবার তালে আছেন, ঐ বন্দুক-কার্তুজগুলো তারই উপকরণ। এমিয়ট অনেক আবেদন-নিবেদন করলেন, কিন্তু নবাব নৌকো ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী হলেন না। বরং উলটে জেদ করতে লাগলেন, পাটনায় ইংরেজদের যেসব সেপাই-শান্ত্রী মজুত আছে, তাদের বেশির ভাগকে যেন হয় কলকাতায় আর নয় মুঙ্গেরে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমিয়টের দল আধা-বন্দী অবস্থায় মুঙ্গেরে পড়ে রইলেন।

ইংরেজদের কত দৌড় সেটা পরখ করে দেখবার জন্যে নবাব গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টকে লিখে পাঠালেন, তিনি নৌকা-বোঝাই সমস্ত বন্দুকই ন্যায্য দাম দিয়ে কিনে নিতে প্রস্তুত আছেন। আর এলিসের জায়গায় ম্যাগুয়ার কি হেস্টিংস এমন কি এমিয়টকেও যদি পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয় তাহলে পাটনা থেকে সেপাই-পল্টন সরাবার কথা তিনি আর তুলবেন না। কিন্তু এলিসের মতো লোকের হাতে অত সেপাই-পল্টন মজুত থাকলে পাটনায় রোজই একটা-না একটা হাঙ্গাম-হুজ্জত লেগেই থাকবে। ইংরেজরা অন্য সময় নিজেদের মধ্যে যতই খেয়োখেয়ি করুক না কেন স্বার্থে ঘা লাগলে তারা একজোট হতে একটুও দেরী করে না। ভ্যান্‌সিটার্ট আর হেস্টিংস—এরা দুজনেও শেষে নবাবের বিরুদ্ধে গেলেন। কাউন্সিলের সবাই মিলে নবাবের প্রস্তাবে নামঞ্জুর করে দিয়ে এমিয়টকে লিখে দিলেন, পত্রপাঠ তিনি যেন

১৩

নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা ফেরার জন্যে নৌকো চড়ে বসেন, মুঙ্গেরে আর থাকবার দরকার নেই।

কথাটা শুনে নবাব ভ্যান্‌সিটার্টকে লিখলেন—আপনারা তো বড়ো মজার বন্ধু দেখছি। আপনাদের যিশু খৃস্টের দোহাই পেড়ে আপনারা কসম খেয়েছিলেন, আপনাদের সেপাই-পল্টন সব আমারই সাহায্যার্থে আমারই আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবে; তার জন্যে তাদের মাইনেও আমিই জোগাচ্ছি। তিন-তিনটে বড়-বড় জেলার খাজনা ঐ বাবদ আপনারা আমার কাছ থেকে নিজেদের নামে লিখিয়ে নিলেন। এখন আমারই পয়সায় আমাকেই বধের জন্যে আপনারা পাটনায় সৈন্য মোতায়েন করছেন, তাদেরই কাজে লাগানোর জন্যে কলকাতা থেকে সেখানে হাতিয়ারও পাঠাচ্ছেন—আপনারা আমার হিতাকাঙ্ক্ষীই বটেন। আর এই হল কিনা আপনাদের ন্যায়ধর্ম?—মীর কাশিম কেন-যে ভুলে গেলেন, অবস্থা-বিশেষে ন্যায়ধর্মের দোহাই কোনো কাজেই লাগে না। আর তার জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত তো তিনি নিজেই একজন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিন্তু নবাব তাঁর বন্ধুর পরামর্শে ইংরেজদের বন্দুকের নৌকো ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। আলী ইব্রাহিম যুক্তি দেখালেন যে, ইংরেজরা যখন হাজার দু-হাজার বন্দুকই পাটনায় জড়ো করেছে তখন আর দু-চারশো বেশি-কমেতে কি এসে যায়? ও তো বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র, ওকে যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন বলেই মেনে নেওয়া ভালো। মীর কাশিম নৌকো ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কষাকষিতে দড়ি ছিঁড়ে গেছে, সন্ধির কথা কেউই আর তুললেন না।

বন্দুকের নৌকোগুলো মুঙ্গেরের ঘাট ছেড়ে খানিক দূর এগিয়েছে, এমন সময় পাটনার ডেপুটি গভর্নর মীরজা মেহদীর কাছ থেকে খবর এল যে, এলিস আরো সেপাই জোগাড়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। লড়াই না থাকলেও, মাইনের উপরে যুদ্ধের সময়কার বাট্টা দেবার লোভ দেখিয়ে, তিনি নবাবের সেপাইদের ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের দলে ভর্তি করছেন। ঐ খবর পেতেই মীর কাশিম বন্দুকের নৌকোগুলো আবার আটক করতে হুকুম পাঠিয়ে দিলেন। মাঝপথ থেকে সেগুলো আবার মুঙ্গেরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। এমিয়টের দলকে আরো কড়া নজরবন্দী করে নবাব ক্যাপ্টেন মারকারকে একদল সেপাই নিয়ে তখনই পাটনা রওনা হতে অর্ডার দিলেন।

মীর কাশিম কিন্তু কি বুঝে হঠাৎ একদিন এমিয়টকে কলকাতায় ফিরে যেতে অনুমতি দিয়ে বসলেন। তবে হে-সাহেবকে মুঙ্গেরে ধরে রাখলেন।

নবাবের অনেক কর্মচারী ইংরেজদের হাতে বাঁধা পড়েছে, হে-সাহেবকে তাদের ভালোমন্দের জামিনদার হয়ে সেখানে রয়ে যেতে হল। তার সঙ্গে তাঁর দু-চারজন সঙ্গীও সেখানে থেকে গেলেন। এমিয়টের খাতিরে নবাব সেই রাত্রে মস্ত এক নাচ-পার্টি লাগিয়ে আসর সরগরম করে তুললেন। পরদিন ভোরে বেশ প্রফুল্ল মনেই নবাবের দেওয়া পাসপোর্ট পকেটে পুরে এমিয়ট নৌকোয় চড়ে কলকাতা চললেন।

ওদিকে ২৩শে জুন পাটনার ইংরেজ-কুঠিতে সারারাত ধরে খুব ধুমধাম। পিপে পিপে মদ উড়ছে। পলাশীর যুদ্ধজয়ের স্মরণোৎসব। পরদিন এলিসের ইঙ্গিতে পাটনা শহরে যেখানে যত ইংরেজ ছিল সবাই এসে কুঠিবাড়িতে জমা হল। সেই রাত্রেই খবর এসে গেল, নবাবের সঙ্গে মিটমাট আর হল না, পিটর এমিয়ট মুঙ্গের ছেড়ে চলে গেছেন। তখনো ভোর হয়নি, অন্ধকার আছে। বলা নেই কওয়া নেই ইংরেজরা হঠাৎ পাটনা শহরের উপর হামলা লাগিয়ে দিল। এলিস আগের থেকেই মই ঠিক করে রেখেছিলেন, এখন সেই মই বেয়ে ইংরেজ সেপাই-পল্টনরা শহরের পাঁচিল টপকে শহরের ভিতরে টপাটপ লাফিয়ে পড়তে লাগল। শান্ত্রীরা কেউ পাঁচিলের ছাদের উপর শুয়ে ঘুমচ্ছে, কেউ-বা রাতে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ি চলে গিয়ে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে।

শহর নিঝুম নিশ্চুপ। সবাই শেষরাতের ঘুমের ঘোরে বেহুঁশ। হঠাৎ গোলাগুলির ভীষণ আওয়াজে লোকেরা সজাগ হয়ে উঠে দেখে যে, ইংরেজদের সেপাই-পল্টন শহরে ঢুকে পড়েছে, বড়রাস্তা দিয়ে দলবেঁধে তারা বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে মার্চ করে চলেছে। দু-চারটে ছোট-ছোট তোপও তারা ভিতরে এনে ফেলেছে। ওদিকে বাইরের থেকে বড়-বড় গোলা এসে শহরের পাঁচিলের উপর ধপাধপ পড়তে লাগল। হট্টগোলে চাঙ্গা হয়ে উঠে ডেপুটি গভর্নর মীরজা মেহদী দেখলেন সমূহ বিপদ উপস্থিত। ইংরেজদের গোলাগুলির চোট দেখে তিনি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। আর একটুও সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে মুঙ্গেরের সোজা রাস্তা ধরলেন। বেলা নটার মধ্যেই সারা পাটনা শহর ইংরেজদের হাতে এসে গেল। তবে লালসিং বলে নবাবের এক ক্যাপ্টেন পাটনার কেল্লাটা ইংরেজদের নিতে দিলেন না, প্রাণপণ লড়ে আঁকড়ে ধরে রইলেন। আর-এক ক্যাপ্টেন, মহম্মদ আমীন, চেহেলস্তুনে অর্থাৎ চল্লিশথামওয়ালা দরবারবাড়িতে আস্তানা গেড়ে সেটাকেও ইংরেজদের দখল নিতে দিলেন না।

ইংরেজকুঠিতে মহা উল্লাস। পাটনার সকলেই মনে করল, ইংরেজরাই তবে বুঝি রাজা হলেন। প্রতি মুহূর্তেই এলিসের কাছে নজরআনা ভেট আসতে লাগল। সিভিল মিলিটারী সব অফিসরদের মধ্যে ঘন ঘন মদ আর বিস্কুট বিতরণ করা চলল। মাতামাতি খানিক ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পাটনার কমাণ্ডিং অফিসর, ক্যাপ্টেন পিটর কারসটেয়ার্স, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এলিসের সঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসে গেলেন। ঐ অবসরে ইংরেজদের সেপাই-পল্টন যা সহজে করে না, তাই করে বসল—অর্থাৎ যুদ্ধের কোনো নামগন্ধ নেই দেখে তারা মনের সুখে শহর লুঠপাট করতে লেগে গেল। ওদিকে মীর কাশিমের আরমানী ক্যাপ্টেন মারকার-সাহেব সারাদিন মার্চ করতে করতে এগিয়ে এসে বেলা বারোটা নাগাদ পাটনার কাছে ফতোয়া গ্রামে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে পৌছে দেখেন, ডেপুটি গভর্নর মীরজা মেহদী পাটনা থেকে পালিয়ে সেখানে হাজির হয়ে গেছেন, সেখান থেকে মুঙ্গের পালানোর উদ্যোগ করছেন।

মীরজা মেহদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মারকার-সাহেব জানতে পারলেন পাটনার কেল্লা তখনো যায়নি। তিনি আর কথাটি না কয়ে মীরজা-সাহেবকে বগলদাবা করে নিয়ে কুইক মার্চ করতে করতে দুঘণ্টার মধ্যে পাটনা শহরের পুব-দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইংরেজদের সেপাই-পল্টন তখন লুটতরাজে মত্ত, কে আর তাঁকে বাধা দেয়? মারকার শহরে ঢুকেই প্রচণ্ড এক তোপ দাগলেন। তাঁর ইওরোপীয়ন যুদ্ধকৌশল বেশ ভালোই জানা, হল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি হাতেকলমে রীতিমতো শিক্ষালাভ করেছিলেন। ইংরেজ সেপাই-পল্টনের তখনো লুঠের ঘোর একেবারে কাটেনি, তারা বেশিক্ষণ মারকারের তোপের সামনে দাঁড়াতে পারল না। নিজেদের কামানগুলোর মুখ বুজিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সেইখানেই ফেলে রেখে তারা শহর ছেড়ে সুড়সুড় করে কুঠিবাড়িতে গিয়ে ঢুকল। যেমন সহজে ইংরেজরা শহর দখল করে নিয়েছিল ঠিক তেমনি সহজেই ক্যাপ্টেন মারকার তার পুনরুদ্ধার করলেন। বেলা তিনটের মধ্যেই সব সাফ।

মারাকার কিন্তু ঐখানেই থেমে গেলেন না। তিনি বড়-বড় কামানগুলো শহরের পশ্চিম পাচিলের মাথার উপর তুলে ইংরেজদের কুঠিবাড়ি তাক করে গোলা ছুঁড়তে লাগলেন। সেখান থেকে কেউ আর বেরোতে পারেনা, কেউ সেখানে ঢুকতেও পায় না। এলিস তাঁর লোকজন নিয়ে রাতের বেলায় বাঁকিপুর পালানোর একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মারকার খুব হুঁশিয়ার থাকায় কুঠির গেট থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হল।

চারদিন জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে করতে ইংরেজরা দেখলে একটা উপায় বের করতে না পারলে তো সকলকে সেখানে একেবারে শুকিয়ে মরতে হবে। খাবার-দাবার যা-কিছু ভাঁড়ারে ছিল সবই তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মরিয়া হয়ে মাঝরাত্রে তারা কুঠিবাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পড়ল। অদৃষ্ট ভালো থাকায় মারকারের চোখ এড়িয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কটা নৌকো পেয়ে যাওয়ায় তাতে চেপে বসে সে-যাত্রা তারা রক্ষা পেযে গেল। এখন নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে আপাতত পালিয়ে গিয়ে সেইখানে একটু আশ্রয় পেলে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে নিতে পারা যাবে। তারপর দেখা যাবে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

গঙ্গা পার হযে ইংরেজরা মার্চ করতে করতে অতি কষ্টে ছাপরার গিয়ে পৌছল। তখন ঘোর বর্ষা নেমেছে। রাস্তাঘাট জলকাদায় থকথক করছে। ভারী বুট পরে তাই ঠেলে পথ চলা যে কি কঠিন কাজ তা অনুমান করে নিতে বেশি বেগ পেতে হয় না। তার উপব কদিন আধপেটা থেকে এবার পুরো উপবাস চলছে। রাতারাতি চাকা ঘুরে গেছে। এখন পয়সা ফেলেও এক টুকরো পোড়া রুটি কোথাও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাব উপর ইংরেজদের পালানোর খবর পেয়েই মারকার সসৈন্যে তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করে আসছেন। ধুঁকতে ধুঁকতে ইংরেজরা আর একটু এগিয়ে মাঞ্জী বলে এক জায়গায় এসে শুনল—খবর পেয়ে নবাবের আব-এক সেনাপতি, ক্যাপ্টেন সমরু, বক্সার থেকে গঙ্গা পেরিয়ে তাদের ধরবার জন্যে সেদিকে এগিয়ে আসছেন। সামনে তো আর এগোনো যায় না, ঐখানেই যুদ্ধ দিতে হয়।

ক্যাপ্টেন কারস্টেয়ারস একটা একটু উঁচু জায়গা দেখে সেখানেই তাঁর আধমরা সেপাই-পল্টনদের সাজিয়ে ফেললেন। মারকার আর সমরুর ফৌজ এসে তাদের চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রথম দিকটায় ইংরেজ পল্টনগুলো খুব এক চোট জোর তেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ তারা যুঝতে পারল না, একেবারে নেতিয়ে পড়ল। গোরারা আর চার্জ করছে না দেখে সেপাইরাও হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নবাবী ফৌজের গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন কারস্টেয়ারস সাঙ্ঘাতিক জখম হলেন, তাঁর সাত আটজন অফিসর, পঞ্চাশ-ষাট গোরা আর শ-খানেক সেপাই যুদ্ধক্ষেত্রেই ধরাশায়ী হল। উপায় কিছু আর না পেয়ে বাকি ইংরেজ সেপাই-পল্টনরা কামানবন্দুক গোলাগুলি সাজ-সরঞ্জামসুদ্ধ ক্যাপ্টেন মারকারের হাতে ধরা দিল। এলিস আর অন্য অন্য সিভিলিয়নরাও পিস্তল তলোয়ার খুলে পায়ের কাছে রেখে আত্মসমর্পণ করলেন। ১লা জুলাই ১৭৬৩।

মাত্র একটি লোকের গোঁয়ারতুমিতে অত বড় একটা ফৌজ নিঃশেষে ছারখার হয়ে গেল। এই ক-মাস ধরে এলিস বড় কম লোক জোগাড় করেননি। পাটনার ইংরেজ ফৌজে সাতাশ জন অফিসর, সাতান্ন জন গোলন্দাজ, দুশো-কুড়ি জন গোরা পল্টন আর ইংরেজ অফিসরদেরই হাতে তৈরি দু-হাজার-দুশো দেশী সেপাই পাটনায় মজুত ছিল। মাঞ্জীর লড়াই খতম হতে সেপাইদের যারা বেঁচে রইল তারা গিয়ে নবাবী ফৌজে ভর্তি হয়ে গেল। ইংরেজদের প্রায় সবাইকে পাটনার কেল্লায় বন্দী করে রেখে কেবল এলিস আর তাঁর গোটাকয়েক সঙ্গীকে মুঙ্গের চালান দেওয়া হল। নবাব রহস্য করে ভ্যান্‌সিটার্টকে লিখলেন—আমি মনে করেছিলুম এলিস বুঝি আমার শত্রু, কিন্তু এখন দেখছি তিনি আমার পরম মিত্র। আপনি দু-চারশো বন্দুক দাম নিয়ে আমায় বিক্রি করতে নারাজ হলেন, আর সেই জায়গায় এলিস কিনা শত-শত অস্ত্রশস্ত্র আমায় অমনি অমনি দান করে দিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে বর্ষার ভরা গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকোয় চড়ে দু-ধারের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে পিটর এমিয়ট কলকাতা চলেছেন। পাটনার গোলমালের খবর পেতেই নবাব তাঁর বিশ্বাসী ক্যাপ্টেন মহম্মদ তকী খাঁকে লিখে পাঠালেন, এমিয়টকে কলকাতা যেতে না দিয়ে তাঁকে যেন নবাবের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। বীরভূমের ফৌজদার তকী খাঁ তখন কি-একটা কাজে মুর্শিদাবাদ আর কাশিমবাজারের ঠিক মধ্যিখানের একটা চরে ক্যাম্প ফেলে আছেন। এমিয়টের নৌকো যেই মুর্শিদাবাদের ঘাটে এসে লাগল অমনি তকী খাঁ তাঁকে এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তকী খাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কোনোরকম টুঁ-শব্দটি না করে কৌশলে এমিয়টকে মুঙ্গেরে ফেরত পাঠানো, কিন্তু এমিয়ট ব্যাপারটা যে কি, তা আঁচ করে নিয়ে, তকী খাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না, মাঝ-দরিয়ায় নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে দাঁড়িমাঝিদের হুকুম করে দিলেন।

তখন মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ খাঁ নিজের লোক মারফত বলে পাঠালেন, সাহেবের জন্যেই বিশেষ করে এত সব আয়োজন করা হয়েছে, এখন তিনি না এলে সে সবই পণ্ড হয়ে যাবে। সেটা যে বড়ই আফসোসের কথা হবে। এমিয়ট আবার অত্যন্ত বিনয় করে মাফ চেয়ে নিমন্ত্রণ এড়িয়ে গেলেন। বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দূত তকী খাঁকে সব খবর জানালেন। তখন তকী খাঁ ইংরেজদের নৌকোর মাঝিমাল্লাদের নৌকো থামাতে আদেশ দিলেন। প্রত্যুত্তরে এমিয়টের বডিগার্ডরা ঘাটে জড়ো-হওয়া নবাবী সেপাই-

শান্ত্রীদের উপর গুলি চালিয়ে বসল। তখন নবাবের লোকেরাও চুপচাপ আর দাঁড়িয়ে তামাশা না দেখে, ঝপাঝপ করে ইংরেজদের নৌকোয় লাফিয়ে পড়ল। তারপর হাতাহাতি মারামারি কাটাকাটি। নবাবের সেপাইরা ইংরেজদের প্রায় সবাইকে একে একে কচুকাটা করে তবে ছাড়ল। সামান্য কয়েক জন মাত্র সাঁতরে পালিয়ে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে আশ্রয় নিতে পেরেছিল। এমিয়টের মুণ্ডুটাকে ধড়ের থেকে আলাদা করে কেটে নিয়ে নবাব মীর কাশিম আলী খাঁয়ের কাছে দেখতে পাঠানো হল। তারপর সারাদিন ধরে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির উপর জোর হানাদারি চলল। সেখানকার সব ইংরেজদের ধরে বন্দী করে সোজা মুঙ্গের পাঠিয়ে দেওয়া হল।

॥ তেইশ ॥

ঘটনা যে অত দূর গড়াবে, সেটা নবাব মীর কাশিম কল্পনাও করে উঠতে পারেননি। কিন্তু মন যখন বিদ্বেষে ভরপুর হয়ে থাকে তখন কিসের থেকে যে কি করে কি ঘটে যায় তার হদিস কেউ কখনো দিতে পারে না। সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গের থেকেই তো প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি হয়। গণৎকাররা গনৎগাথা করে নবাবকে যতই আশ্বাস দিন না কেন, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বলপরীক্ষার উপযুক্ত সময় তখনো হয়নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে তার আগেই মীর কাশিমকে সে পরীক্ষা দিতে হল, যদিও ইংরেজদের সঙ্গে লড়ায়ে নামতে তখন তাঁর একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিধাতার বিধান কে কবে খণ্ডাতে পেরেছে?

এমিয়টের হত্যাকাণ্ডের খবর কলকাতায় পৌছতে ভ্যান্‌সিটার্টের মতো অমন ঠাণ্ডা লোকও তেতে আগুন হয়ে উঠলেন। তার মনে তখনো পযন্ত খুবই আশা ছিল, নবাবের সঙ্গে লড়াই করতে হবে না, এমিয়টের চেষ্টায় আপস মীমাংসাতেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। সে-আশা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এখন সবাইকারই মুখে সাজসাজ রব।

যেখানে শুধু স্বার্থ নিয়েই টানাহেঁচড়া সেখানে তো যুক্তি দিয়ে কোনো কিছুর মীমাংসা হতে বড়-একটা দেখা যায় না, শেষ পযন্ত গায়ের জোরেই তার একটা হেস্তনেস্ত হয়। সেক্ষেত্রে যুক্তি যতই ধারালো হয়ে ওঠে, তত বেশি করেই তাকে এক উদ্ধত স্পর্ধার আত্মপ্রকাশ বলেই মনে হতে থাকে। তাই ইংরেজদেরও নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে লড়াইয়ের জন্যে লেগে পড়তে হল, শুধু কথায় আর চিঁড়ে ভিজতে চাইল না।

তবে ইংরেজরা এটিকেট-মানা, লেফাফাদোরস্ত জাত। মীর কাশিমকে নবাবী গদিতে বসিয়ে রেখে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে কি করে? একজন কাউকে নবাব বানিয়ে শিখণ্ডী করে সামনে দাঁড় করিয়ে না রাখলে তারা লড়েই বা কার হয়ে, কার নামে? কথাটা কাউন্সিলে উঠতে হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে মেম্বরদের সকলে মিলে স্থির করলেন, তাহলে বাংলার গদি আবার সেই মীর জাফরকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ক্লাইভের সাগরেদ জন্ কারন্যাক তেড়েফুঁড়ে উঠে সভায় বক্তৃতা ঝাড়লেন, মীর জাফরকে

মসনদ থেকে নামিয়ে ইংরেজরা যে-পাপ করেছে, তাঁকে আবার সেখানে বসালে তবে সে-পাপের তবু খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। কথাটা শুনতে আদবেই মন্দ লাগল না, শুনে সবাই বাহবা দিয়ে উঠলেন।

মীর জাফর সেই থেকে কলকাতাতেই আছেন। কাউন্সিলের তরফ থেকে কজন মাতব্বর ব্যক্তি তাঁর চিৎপুরের বাড়িতে ডেপুটেশনে গেলেন। গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট সেখানে আর কোন মুখেই বা যান? তিনিই তো হাত ধরে মীর কাশিমকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। গভর্নরের পরই পদগৌরবে কমাণ্ডার-ইন-চিফ, সুতরাং তাঁরই মীর জাফরের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মেজর কারন্যাকই ডেপুটেশনের মাথা হলেন। যদিও কারন্যাক আর তখন ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার-ইন-চিফ নন—কর্নেল আয়ার কুটের বদলে মেজর টমাস অ্যাডামস এখন সে-পদে বসেছেন—তবুও কারন্যাককেই ঐ ডেপুটেশনের অগ্রণী হতে সবাই অনুরোধ করলেন, কারণ অ্যাডামস তখন সবেমাত্র দক্ষিণ দেশ থেকে বাংলার মাটিতে পা দিয়েছেন, তখনো এখানকার হালচাল তাঁর রপ্ত হয়ে ওঠেনি।

মেজর কারন্যাক কাউন্সিলের ইচ্ছাটা মীর জাফরকে নিবেদন করে জানালেন, মীর কাশিমের কাছ থেকে নবাবী কেড়ে নিয়ে মীর জাফরকেই আবার সেই নবাবী ফেরত দেবার প্রস্তাব নিয়ে তিনি এসেছেন। মীর জাফরের তখন তিন কাল গিয়ে এককাল এসে ঠেকেছে, বয়স হয়েছে বাহাত্তর বছর। শরীর জরাজীর্ণ, তার উপর এক দুরারোগ্য* ব্যাধিতে তাঁকে ধরেছে, তবু আকাঙ্খা তখনো মেটেনি। আবার নবাব হতে যাচ্ছেন শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিনি ইংরেজদের প্রস্তাবে পুরো রাজি আছেন বলে তখনি সম্মতি জানিয়ে দিলেন। তখন কাউন্সিলে পাস করা এক একরারনামার খসড়া পকেট থেকে বের করে কারন্যাক সেটা মীর জাফরের মুখের সামনে ধরলেন।

সেই ১৭৫৭ সালে নবাবী পাবার লোভে তিনি চুক্তিনাম দিয়ে এক দাসখতে সই করে সেটা তো উইলিয়ম ওয়াট্‌সের হাতে তুলে দিয়েছিলেন—আজ আবার আর এক চুক্তি? এবার আর ফস করে তাতে সই না মেরে ভেবে দেখবার জন্যে মীর জাফর একদিন সময় চেয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে একরারনামার একটা ফার্সী তর্জমাও তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু তৃতীয় রিপুটি মীর জাফরের মনের মধ্যে এমন জোর ঘা মারতে লাগল যে, তার তাড়নায় তিনি গুছিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করে উঠতেই পারলেন না, একটুও দ্বিধাসংকোচ না করে স্বদেশবাসী প্রজাদের অতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে পরদিনই তিনি

ইংরেজদের প্রধান দুটি শর্তে মত দিয়ে ফেললেন। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা বিনা মাসুলেই সবরকম দেশী জিনিসের কারবার মনের আনন্দে চালিয়ে যেতে পারবে, কেউ তাতে বাধা দেবে না—কিন্তু দেশী ব্যাপারীরা পূর্বে যেমন মাসুল দিচ্ছিলেন এখনো ঠিক তাই দিয়ে যাবেন—মীর কাশিম দুবছরের জন্যে যে সবাইকে সবরকম মাসুল দেওয়ার হাত থেকে রেহাই দিয়েছিলেন, সেটা মীর জাফর নবাব হয়ে বাংলার মসনদে বসামাত্রই বাতিল করে দেবেন।

কি করে জানিনে ইংরেজরা মীর জাফরকে বোঝাতে সক্ষম হল যে, মীর কাশিমের বিরুদ্ধে তারা যে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে সেটা আসলে কিন্তু মীর জাফরেরই হিতার্থে, নিজেদের জন্যে একেবারেই নয়। সুতরাং লড়া যখন তাঁরই জন্যে তখন লড়াইয়ের খরচটাও তাঁরই দেওয়া উচিত। মীর জাফর যুক্তিটা যথার্থ বলে মেনে নিয়ে ঐ বাবদ তিরিশ লাখ টাকা ইংরেজদের দিতে স্বীকার হয়ে গিয়ে সেটা কাগজকলমে লিখে দিলেন। মীর কাশিম যে ইংরেজদের সেপাই-পল্টনের খরচের দরুন তিনটে বড-বড জেলার—বর্ধমান মেদিনীপুব আর চাটগাঁর—রাজস্ব ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেটা চাপা রইল, তাই নিয়ে কোনোই কথা উঠল না, ঐ তিরিশ লাখ হল তার উপর। চুক্তিনামার প্রথম কড়ারই হল যে, মীর কাশিমের সঙ্গে ১৭৬০ সালে ইংরেজদের যে সুলেনামা হয় সেটার প্রত্যেকটি দফাই মীর জাফর কায়েম রাখবেন।

দেশের থেকে মাসুল উঠিয়ে দেওয়ায় মীর কাশিম ইংরেজদের যে-পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন তার পূরণের দরুন কাউন্সিলররা মীর জাফরের কাছ থেকে দশ লাখ টাকার বায়না ধরে বসলেন। মীব জাফর কিন্তু ওটা দিতে চাইলেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই বললেন, ক্ষতি যে সত্যি হয়েছে, তারই বা কি ঠিক আছে? তা যখন নেই তখন আর পূবণের কথা ওঠেই বা কি করে? ঐ যুক্তি মীর জাফরের নিজের, কি তাঁর মন্ত্রণাদাতা নন্দকুমারের মাথার থেকে বেরিয়েছিল, তা এখন অবশ্য ঠিক করে বলা যায় না, তবে প্রধান শর্তগুলোয় মীর জাফর যখন বিনা ওজরেই রাজী হয়ে গেলেন তখন ঐ একটা দাবিদাওয়া নিয়ে কাউন্সিলররা আর টানাটানি করলেন না, ভবিষ্যতের জন্যে শিকেয় তুলে রাখলেন। আর, তখন তর্কাতর্কি করে নষ্ট করবার মতো অপর্যাপ্ত সময়ও তাঁদের হাতে ছিল না, অবস্থা এমনই সঙিন যে, লড়াইয়ের জন্যে তখনই তৈরি হয়ে না নিলেই নয়। ১০ই জুলাই দু-পক্ষের মধ্যে চুক্তিনামা সই হয়ে গেল।

সব নিষ্পত্তি করে ফেলার আগেই মীর জাফর বলে রেখেছিলেন নন্দকুমারকে তাঁর দেওয়ান হয়ে মুর্শিদাবাদ যেতে দিতে ইংরেজরা যেন বাধা না দেয়। ইতিপূর্বেই ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায় নন্দকুমার কলকাতায় ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। কাউন্সিলে এই নিয়ে আলোচনা উঠতে মেম্বররা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন, নন্দকুমারের মতো অমন ধড়িবাজ ষড়যন্ত্রী বাংলা-মুল্লুকে আর দুটি নেই, তিনি নবাবের দেওয়ান হয়ে বসলে একেএকে অনেক-কিছু অঘটন ঘটিয়ে তুলতে থাকবেন। মীর জাফর যদি কোনো পাকা দেওয়ানই চান তাহলে মহারাজা দুর্লভরামই তো চোখের সামনে আছেন। কারন্যাক তখন সবাইকে বুঝিয়ে বললেন যে, মীর জাফরের নিজের যখন নন্দকুমারকেই পছন্দ, তাঁকেই যখন তিনি বার বার করে সঙ্গে নিতে চাইছেন, তখন ইংরেজদের তাতে ফোড়ন কাটবার কি আছে? কথাটা অবশেষে কাউন্সিলকে ঠিক বলেই মেনে নিতে হল।

হাযুজখানা থেকে ছাড়া পেয়ে নন্দকুমার এসে মীর জাফরকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। ইংরেজদের খুশি রাখবার জন্যে মীর জাফর তাঁদের দুই পেটোয়াকেও—দুর্লভরাম আর মুন্সী নবকৃষ্ণ দেবকেও—সঙ্গে নিলেন। প্রক্লামেশন বেরিয়ে গেল—নবাব মীর কাশিমকে পদচ্যুত করে সে-জায়গায় মীর মহম্মদ জাফর আলী খাঁ মহবতজঙ্গ বাহাদুর আবার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যে সব গুণের অভাবে কাউন্সিলররা এক সময় মীর জাফরকে বাংলার মসনদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, আড়াই বছর পরে ঠিক সেই সব গুণই তাঁরা বুড়ো মীর জাফরের মধ্যে হাজির দেখতে পেলেন, আর সেই সঙ্গে মীর কাশিম হলেন কিনা অতি দুরাত্মা পামর পিশাচ—কোনো গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন। সুতরাং আর একটুও দোমনা না করে ইংরেজরা স্বচ্ছন্দে মীর জাফরের নাম করে মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল।

মেজর টমাস অ্যাডামস আর মেজর জন্ কারন্যাক দুজনেই এর আগে সেপাই-পল্টন নিয়ে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রওনা হয়ে পড়েছেন। সেই আদ্যিকালের পুরনো পথ, যে-পথ দিয়ে মহাত্মা ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধ জয় করতে গিয়েছিলেন। মিলিটারী সিন্দুক খুলে অ্যাডামস নগদ দশ হাজার টাকা মাত্র পেয়েছিলেন, বাকি টাকার জন্যে মীর জাফরের উপর ভরসা রেখে তিনি ঐ নিয়েই যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তবে মফস্বলের যেখানে-যেখানে ইংরেজদের ঘাঁটি ছিল সর্বত্রই লিখে দেওয়া হল, সেপাই-পল্টন রসদপত্রের সঙ্গে টাকাকড়িও যত

জোগাড় করতে পারা যায় ততই ভালো, সেসব সত্বরই যেন মেজর অ্যাডামসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেজর অ্যাডামস আর মেজর কারন্যাকের প্রথম গন্তব্যস্থল হল মুর্শিদাবাদ। সেখানে গিয়ে মীর জাফরকে তো আবার বাংলার মসনদে বসাতে হবে? পথে কোনো বাধা না পেয়ে চলতে চলতে শেষে গঙ্গা পেরিয়ে তাঁরা অগ্রদ্বীপে গিয়ে উঠলেন। ঠিক দুদিন পরে মীর জাফর কলকাতা থেকে এসে সেইখানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর সঙ্গে আছেন মহারাজা নন্দকুমার রায়, আর রয়েছেন খোজা পিদ্রুস। মীর জাফরের শ্রীবৃদ্ধি হতে দেখে, খোজা-সাহেব ভোল বদলিয়ে আবার তাঁর দিকে ঢলে পড়েছেন।

এর পর যুদ্ধ। লড়াই একবার শুরু হয়ে গেলে তাকে আর সহজে থামানো দায়। সে আপন বেগেই অনেক দিন ধরে অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকে। তাই এর পর থেকে একটার-পর-একটা কেবলই যুদ্ধ।

ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে শুনে মহম্মদ তকী খাঁ তাদের বাধা দিতে গেলেন। কাটোয়ায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর একটা বড়রকম যুদ্ধ হয়ে গেল। মীর কাশিমের অধীনে যত জন মুসলমান সেনাপতি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের সেনাধ্যক্ষ হলেন এই তকী খাঁ। তিনি সত্যিকার বীরপুরুষ, আর এক মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি। মীর কাশিম তাঁর জেনারেলদের মধ্যে তকী খাঁকেই যা-একটু বিশ্বাস করতেন। আর ঠিক ঐ কারণেই অন্যসব জেনারেল আর রাজকর্মচারীর তাঁর উপর বিষম বিষ-হিংসে। তাই তকী খাঁ যখন মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদের কাছ থেকে যানবাহন গুলিবারুদ রসদপত্র খানিকটা চাইলেন তখন তিনি চুপ করেই বসে রইলেন, সে-সবের কোনোই ব্যবস্থা করলেন না। উলটে তকী খাঁর তিনজন সেনাধ্যক্ষকে ডেকে চুপি চুপি তাঁদের বলে দিলেন তাঁরাও যেন তকী খাঁকে কোনোরকম সাহায্য না করেন।

আর দেরি না করে নিজের যা সেপাই ছিল, আর মুঙ্গের থেকে গুরগিন খাঁর হাতে তৈরি কতক সেপাই যা মীর কাশিম পাঠিয়েছিলেন, তাই সঙ্গে নিয়ে তকী খাঁ ইংরেজদের সম্মুখীন হলেন। সেই তিনজন সেনাধ্যক্ষ যদিও তকী খাঁর ফৌজেরই অঙ্গ, তবু তাঁরা দলছাড়া হয়ে নিজেদের লোকজন নিয়ে একটু তফাতে তফাতেই রইলেন। তকী খাঁ তাতে ভয় পাবার লোক নন, তাঁর সঙ্গে আফগান পারসিয়ান রোহিলা সেপাই মিলিয়ে বেশ ভালো-গোছেরই একটা ফৌজ ছিল। কামানবন্দুক গোলাগুলিরও তেমন কিছু—অভাব ছিল না।

কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম লড়াইতেই প্রমাণ হয়ে গেল—মীর কাশিমের সেপাইরা এই আড়াই বছরেও একটুও তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন অপদার্থ ছিল ঠিক তেমনিই আছে, একটুও ডিসিপ্লিণ্ড হয়নি। দেশের লোকেরাও যে অধঃপাতে গেছে, তার থেকে তারা একটুও উপরে উঠতে পারেনি।

তবু তকী খাঁ বীরপুরুষের মতোই শেষ পর্যন্ত সমানে লড়ে গেলেন, লড়াই ছেড়ে প্রাণ নিয়ে সটকে পড়লেন না। নিজস্ব সেপাই দিয়ে লাইন সাজিয়ে নিয়ে তিনি ছোট-বড় প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের হাতে হাত রেখে সবাইকে মিষ্টি কথায় আপ্যায়ন করে উৎসাহ দিতে লাগলেন। সকলে একসঙ্গে আকাশ-ফাটানো এক চিৎকার করে তিন-তিনবার তকী খাঁর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। তার পর মার্চ করতে করতে তারা ইংরেজদের লাইনের দিকে এগিয়ে চলল। কেবল সেই তিনজন বেইমান সেনাধ্যক্ষ আর-একটুও এগোলেন না, নিজেদের দল নিয়ে আলাদা হয়ে পিছনেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ইংরেজদের দিকে যদিও চেঁচামেচি একটুও নেই, সবাই স্থির ধীর শান্ত, তবু প্রত্যেকেরই মুখের উপর দৃঢ়সংকল্পের এক জোরালো ছাপ, সকলেই একমন একপ্রাণ, চলাফেরা সবাইকার একতালে। ইংরেজ সেপাই পল্টনরাও একটু একটু করে সামনে এগোতে লাগল।

দুদিক থেকেই অফুরন্ত গোলাগুলি ছুটে দু-পক্ষকেই বেশ ঘায়েল করে তুলল, কিন্তু তবুও কোনো পক্ষই ক্ষান্ত দেয় না। এবার মোগল ঘোড়সওয়াররা তেড়ে চার্জ করে গেল। ইংরেজ ঘোড়সওয়াররা ছিল নামেমাত্র. তারা কোনো কাজেই এল না। কিন্তু গোরা পল্টনদের বেয়নেটচার্জ এক ভয়ানক ব্যাপার। বেয়নেটের খোঁচায় আর গুলির চোটে তাদের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য? ঘোড়াগুলো পটপট করে মরতে লাগল আর সওয়ারীরা গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে দূরে ছিটকে পড়তে লাগল। স্বয়ং তকী খাঁর ঘোড়াটাও গুলি খেয়ে মরল, সেই সঙ্গে একটা গুলি এসে তাঁর পায়ের তলাটা ছেঁদা করে দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। মনের জোরে অসহ্য যন্ত্রণা চেপে রেখে তকী খাঁ একটা খালি ঘোড়ার উপর লাফিয়ে চড়ে হাত নেড়ে নেড়ে তাঁর সেপাইদের আশ্বাস দিতে লাগলেন, তিনি ঠিক আছেন।

ইংরেজদের এখন-তখন, একেবারে যায়-যায় অবস্থা। তকী খাঁ লক্ষ করলেন, ইংরেজ সেপাই-পল্টনরা কি করবে স্থির করে উঠতে না পেরে একটু যেন অস্থির হয়ে পড়ছে। সুযোগ উপস্থিত মনে করে তকী খাঁ তাঁর

বাছাবাছা কতক সেপাই নিয়ে দ্বিগুণ বেগে ইংরেজদের চার্জ করে গেলেন। ঘোর লড়াই চলেছে—তারই মাঝে হঠাৎ একটা গুলি এসে তকী খাঁর কাঁধে বিঁধতে কাঁধ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে পরনের জোব্বাটার তলা ছিঁড়ে নিয়ে তকী খাঁ সেটাকে এমনভাবে কাঁধে জড়িয়ে ফেললেন যাতে কেউ-না ক্ষতটা দেখতে পায়। তাঁর এক লেফটন্যান্ট তাঁর পাশেই ছিলেন, তিনি সকাতরে তাঁকে তখনি ক্যাম্পে ফিরে যেতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। তকী খাঁ বীরদর্পে বলে উঠলেন—ফিরে যাব? লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাব? তাহলে মীর কাশিমের সামনে আর মাথা তুলে দাঁড়াব কোন মুখে?

তকী খাঁ দেখতে পেলেন, ইংরেজদের ডান দিক থেকে লোক সরে গেছে, সেদিকের রাস্তা খালি। তিনি সেই দিকে তেড়ে হানা দিলেন। কিন্তু সত্যি সেদিক খালি ছিল না, ইংরেজরা পাশের ঝোপে নিঃসাড়ে লুকিয়ে ছিল, তাই দূর থেকে সেদিকটা খালি খালি মনে হচ্ছিল। যাঁহাতক সেপাই নিয়ে তকী খাঁর ধাওয়া করা, তাঁহাতক ঝোপঝাড় সব ঢেউয়ের মতো নড়ে উঠল, আর তার ভিতর থেকে ইংরেজ সেপাই-পল্টনরা বেরিয়ে পড়ে শত্রুপক্ষের উপর হরদম গুলি চালিয়ে যেতে লাগল। ভাগ্যই বিরূপ, তার আর উপায় কি? বেয়নেটের ব্যূহ ভেদ করে তকী খাঁ তাঁর সেপাইদের নিয়ে ইংরেজদের ছোঁবেন ছোঁবেন, এমন সময় আর-একটা গুলি তকী খাঁর ঠিক মাথায় গিয়ে বিঁধল। তিনি ঘোড়া থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

দারুণ যন্ত্রণায় তিনি দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ তিনটে বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষকে মর্মান্তিক অভিশাপ দিতে লাগলেন, কিন্তু কথা শেষ করবার আগেই মৃত্যু এসে তাঁর মুখ চেপে ধরে তাঁর কথা বন্ধ করে দিল। তার পর এদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে বরাবর যা ঘটে এসেছে সেবারও তাই ঘটল। সেনাপতিকে পড়তে দেখে আর-কেউ সেখানে একদণ্ডও দাঁড়াল না, সবাই মিলে মুর্শিদাবাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দৌড়তে লাগল। ইংরেজরাও হারতে হারতে শেষ পর্যন্ত জিতেই গেল—এমনি অদৃষ্টের ফের।

মৃতদের সংকারাদি আর অন্য সব বিলিব্যবস্থা করার জন্যে ইংরেজদের তিনদিন কাটোয়ায় পড়ে থাকতে হল। তারপর চল্ জোয়ান মুর্শিদাবাদ। গঙ্গা পেরিয়ে ইংরেজরা পলাশীর সেই আমবাগানে এসে উপস্থিত, যেখানে একদিন গভীর রাত্রে গঙ্গা পার হয়ে ক্লাইভের সেপাই-পল্টনরা বাকি রাতটুকুর জন্যে তাদের মাথাগোঁজার স্থান করে নিয়েছিল। সামনে সেই পলাশীর মাঠ,

যেখানে সিরাজের সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই নয়, এক বড়গোছের হাত-কাড়াকাড়ি হয়ে গিয়েছিল। পাশেই গঙ্গার উপর সেই শিকারবাড়ি, যেখানে ক্লাইভ আর তাঁর অফিসররা এক রাত বিশ্রামের জন্যে উঠেছিলেন। ভোরে দূরে যুদ্ধের নাকাড়া বাজতে শুনে ক্লাইভ ঐ বাড়িরই ছাতের উপর উঠে দূরবীন কষে সিরাজউদ্দৌলার বিশাল বাহিনী দেখে মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠেছিলেন। আর ঐ মাঠেরই ডান দিকে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ হয়ে লড়বার ভান করে চুপচাপ তামাশা দেখছিলেন।

মীর জাফর ইংরেজ সেপাই-পল্টনের পিছন পিছনই আসছিলেন। পলাশীর মাঠ পার হতে গিয়ে পুরনো সেই দিনের সেসব কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি নিমিষের তরেও কি একবার স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন? ঠিক জানি না। তবে এটা জানি যে, সেদিনকার পলাশীর যুদ্ধজয়ের কথা স্মরণ করে ইংরেজ সেনাপতি মেজর টমাস অ্যাডামস হুকুম দিয়েছিলেন, সে-রাতের পাস-ওয়ার্ড হবে ক্লাইভ আর প্ল্যাশী।

২৪শে জুলাই (১৭৬৩) নবাব মীর জাফরকে সঙ্গে নিয়ে মেজর অ্যাডামস মুর্শিদাবাদে ঢুকলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ ইংরেজরা আসছেন শুনেই যেখানকার যা তা সব সেখানেই ফেলে রেখে, পৈতৃক প্রাণ নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। মীর কাশিমের ক্যাপ্টেনরা মতিঝিলের কাছে ক্যাম্প পেতেছিলেন। ভেবে রেখেছিলেন, সেখানেই ইংরেজদের একহাত দেখে নেবেন, কিন্তু দেখতে আর হল না। ইংরেজদের সঙ্গে নামমাত্র আঁচড়া-আঁচড়ি করেই তাঁরা মানে মানে সরে পড়লেন। মীর জাফর তাঁর নিজের বাড়িকে অপয়া মনে করে এবার আর সেখানকার কাছ দিয়েও গেলেন না, নবাব আলীবর্দী খাঁর পুরনো বাড়িতে গিয়েই উঠলেন।

॥ চব্বিশ ॥

ম্যাজিস্ট্রেটকে পালাতে দেখে শহরের গুণ্ডারা লুঠতরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মেজর অ্যাডামস যখন ক্লাইভেরই মতো মীর জাফরের হাত ধরে আবার তাঁকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন তখন আস্তে আস্তে সব ঠাণ্ডা হয়ে এল। মেজর-সাহেব শহরের সর্বত্র ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, কাশিম আলী খাঁ আর বাংলার নবাব নন, এখন নবাব নাজিম হচ্ছেন মীর মহম্মদ জাফর আলী খাঁ মহবতজঙ্গ বাহাদুর। শহরের যে-সব ধনী মহাজন মীর কাশিমের ভয়ে এতদিন আত্মগোপন করে ছিলেন তাঁরা এইবার কাঠের সিন্দুক খুলে পুরনো দরবারী পোষাক-আশাক বের করে, তাই পরে, হাতে করে নজরানা নিয়ে মীর জাফরের সংবর্ধনা করতে ছুটলেন। অর্থী-প্রত্যর্থীও বহুত জুটে গেল। শহরে মীর কাশিমের আশ্রিতদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না, কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন যে, মীর জাফরের খুঁটির জোর খুবই বেড়েছে তখন তাঁরাও দল বদলাতে এক মুহূর্তও সবুর করলেন না।

মীর জাফর গদিতে বসামাত্রই বাংলা-মুল্লুকের যেখানে যত রাজামহারাজা জাইগিরদার জমিদার তালুকদার ছিলেন সবাইকে পরওয়ানা পাঠিয়ে দিলেন, তাঁরা যেন কেউই আর মীর কাশিমকে একপয়সাও খাজনা না দেন, বাকি খাজনা সবই যেন তাঁরই তোষাখানায় জমা করে দেন। ফলে, মরসুম উপস্থিত মনে করে তাঁরা দিনকতক কাউকেই খাজনা দিলেন না। কিন্তু নতুন দেওয়ান নন্দকুমার রায় এ-সব বিষয়ে বড়ই পাকাপোক্ত। দুঁদে-দুঁদে তশিলদার লাগিয়ে তিনি দুদিনে গায় কড়াক্রান্তিতে সব আদায় করে ছাড়লেন। পুর্বদেশের ঢাকা শহরে অরাজক অবস্থা উপস্থিত হয়েছে জানতে পেরে মীর জাফর সেখানে একদল ঘাগী সেপাই পাঠিয়ে দিলেন। তাইতেই সেখানেও সব শান্ত হতে বেশি সময় লাগল না। মীর জাফর ডেপুটি গভর্নর মহম্মদ রেজা খাঁকে তাঁর পদে বাহাল রাখলেন, সুতরাং সেখানে সবই আগের মতো ঠাণ্ডাভাবে চলতে লাগল। মীর জাফর নবাব হয়ে বসতে খাস বাংলাদেশ থেকে মীর কাশিমের প্রতিপত্তি একেবারেই চলে গেল। তাতে ইংরেজদের হল মস্ত সুবিধা,

মীর জাফরের হাতে ধড়াধড় টাকা এসে পড়তে থাকায় যুদ্ধের খরচের জন্যে তাদের আর কোনো ভয়-ভাবনা রইল না।

ওদিকে তকীর খাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেতে মীর কাশিম শোকে এমনি কাতর হয়ে পডলেন যে, তিনদিন তিনি জলস্পর্শও করলেন না। তার পর যখন খবর এল যে, মুর্শিদাবাদেও তার সেনারা একেবারেই কিছু করে উঠতে পারেনি, সবাই নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, তখন তিনি ইংরেজদের অগ্রগতি থামাবার চেষ্টায় উঠেপড়ে মন লাগালেন। চার দিকে অর্ডার চলে গেল, সকলে মিলে যেন সুতীতে জড়ো হয়, সেখানেই বড়গোছের এক লড়াই হবে। সুতী মুর্শিদাবাদের কুড়ি মাইল উত্তরে গিরিয়ার মাঠেরই একটা অংশ। মীর কাশিম নতুন করে তাঁর কজন বাছা-বাছা ক্যাপ্টেনকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়সওয়ার পয়দল গোলন্দাজ সব মিলে পঁচিশ হাজারের প্রকাণ্ড এক ফৌজ। সুতীতে উপস্থিত হয়ে তারা সেখানে সুড়ঙ্গ কেটে গড়খাই বানিয়ে তারই মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে বসে রইল।

মীর কাশিমের হাতে মালমশলা প্রচুর ছিল। টাকাকড়ি গোলাগুলি কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ—কিছুরই অভাব ছিল না। ছিল না যেটা সেটা হচ্ছে মানুষের মতো মানুষ, আর ছিল না মীর কাশিমের কারো উপর এক তিলও বিশ্বাস। বিশ্বাস না করলে তো আর বিশ্বাসী লোক মেলে না। তাই নবাব মীর কাশিম কাউকে বড়-একটা আপনার লোক করে তুলতে পারেননি। অবিশ্বাস জিনিসটাই হচ্ছে ছোঁয়াচে। তারই ফলে তাঁর ক্যাপ্টেনদেরও মধ্যে পরস্পরের উপর পরস্পরের ঘোর অবিশ্বাস। কে যে কখন কাকে ল্যাং মেরে নবাবদরবারে প্রতিষ্ঠালাভ করে বসে, সেই ভাবনাতেই তাদের সারা দিন কেটে যায়, লড়াইয়ে মন দেবার সময় কোথায় পাবে? এরকম অবস্থা যে টিম-ওয়ার্কের পক্ষে আদবেই সুবিধার জিনিষ নয়—সে-কথা বোধ করি খুলে বলে না দিলেও চলবে।

মীর কাশিম নিজে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সৈন্যচালনা করেননি। একদল লেখক এটাকে তাঁর কাপুরুষতারই একটা প্রমাণ বলে ধরে নিয়েছেন। আবার কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, মীর কাশিম কোনো কালে যুদ্ধবিদ্যা শিখে সেটাকে আয়ত্ত করতে পারেননি বলেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকতেন, পাছে কাছে গিয়ে ভুল চাল দিয়ে যুদ্ধচালনার কোনো ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলেন, সেই ভয়েই। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ নিজে চালনা করেননি সেকথা সত্যি। তার সত্যিকার কারণ যাই হোক না

কেন, ফল যে তার ভালো হয়নি, সে-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। সকলেই একবাক্যে বলে গেছেন যে, মীর কাশিমের ফৌজে সবাই যাঁকে মানবে এমন-এক সর্বাধ্যক্ষ স্বয়ং লড়াইয়ে নেবে সৈন্যচালনা কিম্বা সেনাধ্যক্ষদের একের সঙ্গে অপরকে সংহত করেননি বলেই মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে একটা-কোনো যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারেননি।

আরো-একটা কথা। মীর কাশিম তাঁর ফৌজে যে-সব আরমানী ইওরোপীয়ন ফিরিঙ্গি অফিসর পল্টন ভর্তি করেছিলেন, নবাবের দেশী অফিসররা যে তাদের ভ্রাতৃভাবে দেখতেন, সেটা বললে সত্যি কথা বলা হবে না। বরং তাদের আস্তে আস্তে নবাবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে দেখে দেশী লোকদের সর্বশরীর হিংসেয় রি-রি করতে থাকত, সেইটেই হল হক কথা। ঐরকম হওয়াটা অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু ঐ রেষারেষিটা যদি বাইরে বাইরেই থেকে যেত, দয়া করে সেটাকে তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে না যেত, তাহলেই সবদিক রক্ষা পেত, এক সাধুবাবাজীদের ছাড়া আর কারো তাতে বলারও কিছু থাকত না। কিন্তু লড়াইয়ের সময় ফৌজের একপক্ষ যদি ঈর্ষাবশত অপরপক্ষের সঙ্গে অনবরত নন-কোঅপরেশন করতে থাকে, তাহলে তার ফল যে কি বিষম হয়ে দাঁড়ায়, তার দৃষ্টান্ত ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের প্রত্যেকটা লড়াইয়েতে পদে পদে মিলবে। অন্য দিকে ঐ আরমানী ইওরোপীয়ন আর ফিরিঙ্গিরা নবাবের পয়সা খেয়েও যে মনে-প্রাণে ষোল-আনা তাঁর দিকে ছিল, তাও তো নয়। একটু সুযোগ পেলেই তারাও বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিন্দুমাত্র পেছপাও হত না।

১৭৬৩ সালের ১লা অগস্ট মেজর অ্যাডামস তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাঁশুলি বলে ছোট্ট এক নদী পেরিয়ে গিরিয়ার ফাঁকা মাঠে গিয়ে উঠলেন। ইংরেজ ফৌজের পিছন পিছন তল্পিদারের মতো চলেছেন, নবাব মীর জাফর খাঁ বাহাদুর। তাঁর সঙ্গে নবাবী সেপাই-শান্ত্রী সংখ্যায় যে কত ছিল তা কেউ স্পষ্ট করে লিখে যাননি। মেজর অ্যাডামসের ফৌজে এক হাজার গোরা পল্টন আর চার হাজার দেশী সেপাই। তবে ফার্স্ট ক্লাস অফিসর অনেকগুলো। তাঁরা সবাই এক-একটি সত্যিকার বীরপুরুষ।

ইংরেজ কমাণ্ডার মেজর টমাস অ্যাডামসের এদেশী যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা হয় ক্লাইভের মতোই দক্ষিণ দেশে। অ্যাডামসের চরিত্রে এমন কতকগুলো গুণ ছিল যার দরুন তাঁর অধীনস্থ সেনা আর অফিসররা তাঁকে সহজেই নিজেদের অধিনায়ক বলে মেনে নিতে পারত—তাঁর নীচে কাজ করতে গিয়ে

কারো মন একটুকুও খারাপ হত না, সবাই তাঁর অর্ডার হাসিমুখেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। ক্লাইভের মতো অ্যাডামসেরও এমন-এক অদ্ভুত-রকমের বুকের পাটা ছিল যে, একরত্তি এক খুদে ফৌজ নিয়ে তিনি তার চতুর্গুণ বড় এক বিপক্ষবাহিনীর সামনাসামনি হতে একটুও ভয় পেতেন না। একবারও ভাবতেন না, কি হবে না হবে। বুকের পাটা অতটা বেশি থাকার দরুনই ঐরকম ধারা লোকদের অধিকাংশ সময়েই শেষরক্ষা করে যুদ্ধ জিতে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

২রা অগস্ট ১৭৬৩ সাল। ভোরবেলা থেকেই গিরিয়ার মাঠে যুদ্ধ লেগে গেল। যুদ্ধের সবিশেষ বর্ণনা দেবার দরকার নেই, মোটকথা এইটুকু জেনে রাখলেই চলবে যে, পাঁচগুণ বেশি সৈন্যের ফৌজ নিয়েও মীর কাশিমের দল গিরিয়ার যুদ্ধ জিততে পারল না। কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না—কারণ সেই ডিসিপ্লিনের অভাব আর আত্মকলহের প্রভাব—যার ফলে ঐ দল শেষ পর্যন্ত কখনো স্থির হয়ে লড়ে যেতে পারেনি। একটু বেকায়দায় পড়লে তারা দাঁড়ায় না, যে যেদিকে পারে সোজা সেদিকে টেনে দৌড় মারে। মীর কাশিমের দল মনে করলে, লড়াইয়ের পক্ষে ফাঁকা মাঠই বুঝি ভালো। ঐ ভুল করেই তারা সুতীর গড়খাই থেকে বেরিয়ে এসে গিরিয়ার মাঠে গিয়ে পড়ল। যাই হোক, বিপক্ষের ঐ মারাত্মক ভুল ছাড়াও ইংরেজদের জিত হবার আরো একটা কারণ ছিল। সেটা কিন্তু ইংরেজরা কোথাও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেনি, গোপন করে যাবারই চেষ্টা করেছে। মীর জাফর যে কলকাতা থেকে খোজা পিত্রুসকে সঙ্গে করে অতদূর বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা একেবারেই বৃথা যায়নি। পিত্রুস গোপনে গোপনে মীর কাশিমের যত আরমানী ইওরোপীয়ন আর ফিরিঙ্গি অফিসর ছিলেন তাঁদের সবাইকে চিঠি লিখে ভজাতে লাগলেন যাতে যুদ্ধকালে তাঁরা পুরোপুরি ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ না করেন। খোজা পিত্রুসের এই কুটিল চক্রান্তের ফল ইংরেজদের পক্ষে যে ভালোই হয়েছিল তার প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু তাঁর ছোটভাই গুরগিন খাঁর পক্ষে সেটা বড়ই ভীষণ হয়েছিল। সংসারযাত্রায় নিয়তই দেখা যায় যে, একজনের দোষে অন্য আর-একজন সাজা পাচ্ছে। দোষ করলেন বড়ভাই পিত্রুস, আর মারা গেলেন ছোটভাই গ্রেগরী। কি করে যে, সেটা একটু পরেই বলা হচ্ছে।

যুদ্ধশেষে মাথা গুনতিতে দেখা গেল, মীর কাশিমের দিকে লোক মরেছে অসংখ্য। ইংরেজদের দিকেও বড় কম যায়নি। দু-দিন ধরে ইংরেজরা নিজেদের আর শত্রুপক্ষের মৃতদের সৎকার করল। শত্রুদের যারা জখম হয়েও

জ্যান্ত ছিল তাদের চিকিৎসা আর শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। তারা সেরে উঠতে তাদের আর বন্দী করে রাখা হল না, ছেড়েই দেওয়া হল। তাদের অনেকেই নবাব মীর জাফরের ফৌজে গিয়ে ভর্তি হয়ে গেল।

যুদ্ধের প্রচুর মাল-মশলা কামান-বন্দুক গোলাগুলি রসদপত্র আর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম বোঝাই দেড়শো নৌকো ইংরেজদের হাতে গিয়ে পড়ল। গিরিয়ার মাঠের গায়ে সুতীর সেই জোরালো গড়বন্দী জায়গা, ইংরেজরা সেটা হেসেখেলেই কেড়ে নিল। খাস বাংলা-মুল্লুকে এমন একটা জায়গা রইল না, যেখানে মীর কাশিম মাথা গুঁজতে পারেন—এমন একটা লোকও রইলেন না, যিনি দু-দিনের জন্যে তাঁকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন। বাংলাদেশে ফিরে মাথা গলাবার কোনো রাস্তাই আর মীর কাশিমের খোলা রইল না। রইল কেবল এক বিহার-প্রদেশ। ইংরেজরা সেখানেও গিয়ে মীর কাশিমের সঙ্গে লড়ে যাওয়া স্থির করে ফেলল।

গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁর চরম হার হয়েছে, ইংরেজরা সুতীর মতো অমন এক আটঘাট-বাঁধা জোরালো জায়গা অনায়াসেই দখল করে নিয়েছে শুনে, মীর কাশিমের দুঃখ রাখার আর ঠাঁই রইল না। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, ইংরেজদের ঐ ছটাকে এক খুদে ফৌজ তাঁর অমন জাঁদরেল বাহিনীকে কোনোক্রমে একপাও হঠাতে পারবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে, তিনি স্থির করে ফেললেন ইংরেজদের সঙ্গে তিনি শেষ লড়াই লড়বেন উধুয়ানালায়। দেখে নেবেন তাতে কে হারে আর কে জেতে। এবার হয় এস্পার নয় ওস্পার। মনে-মনে ঐ সংকল্প এঁটে মীর কাশিম মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বেরোবার আগে কিন্তু একটা অতি জঘন্য কাণ্ড করে বসলেন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গভীর দুঃখ মানুষকে যেমন পুড়িয়ে শুদ্ধ করে দেয় তেমনি অনেক জায়গায় আবার তার নীচ প্রবৃত্তিগুলোকেও চাড়া দিয়ে চাগিয়ে তোলে। মীর কাশিমের হিংস্রপ্রকৃতি এক বিকট মূর্তিতে সবাইকার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

মুঙ্গেরের কেল্লায় যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা সকলেই মীর কাশিমের হাতে একে একে খুন হয়ে গেলেন। রাজা রাম-নারায়ণের গলায় বালির বস্তা বেঁধে তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হল। রাজা রাজবল্লভকে আর তাঁর কজন ছেলেকে একটা নৌকোয় চড়িয়ে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নৌকোর তলা ফুটো করে দেওয়া হল। জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে তাঁরা একে একে দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন। জনশ্রুতি, সেই সময়েই

জগৎশেঠ হৌসের মহাতপচাঁদ আর স্বরূপচাঁদের পায়ে পাথর এঁটে তাঁদের নাকি কেল্লার পাঁচিল থেকে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। আবার কেউ-কেউ এও বলেন যে, পাটনার কাছে বাঢ়-অঞ্চলে তাঁদের নাকি গুলি করে মারা হয়েছিল, তাঁদের শব শকুনি-গৃধিনীর খাদ্য হয়েছিল। সপুত্র রায়রায়ান উমিদরায়, রাজা ফতেসিং, রাজা বুনিয়াদসিং প্রভৃতি আরো-অনেকে মীর কাশিমের হাতে পড়ে ঐ সময় ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। মীর কাশিম কেবল ইংরেজ বন্দীদের তখনো প্রাণে মারলেন না, জিইয়ে রেখে দিলেন।

তাব পর খানিকটা হালকা হয়ে নিয়ে মীর কাশিম নিজের কাজে মন দিলেন। পরিবারবর্গকে আর মুঙ্গেরে রাখা উচিত মনে করলেন না। পাটবেগম ফতমা-বিবি আর অন্যসব নিকট-আত্মীয়ার সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন নগদ টাকা সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে দিয়ে, নহবত রায়ের হেফাজতে তাঁদেরকে রোটাসগড়ে পাঠিয়ে দিলেন। আজেবাজে দাসদাসী আশ্রিতজন আর অন্তঃপুরিকাদের মুঙ্গের থেকে বিদায় করে দেওয়া হল যাতে দরকার পড়লে তিনি নিজে ঝাড়া হাত-পা হয়ে সহজেই সেখান থেকে পাটনায় পালিয়ে যেতে পারেন। তার পর যুদ্ধের আয়োজন সব ঠিক আছে কি না তারই তদারকে মুঙ্গের ছেড়ে ভাগলপুরের কাছে চম্পানগরে গিয়ে উঠলেন। ঐখানে তাঁর অনেক সেনা জড়ো করা ছিল, সেনাপতিরাও সবাই সেখানে এসে জুটলেন। স্থতী থেকে পালিয়ে মারকার সমরু প্রভৃতি বিদেশী সেনাধ্যক্ষরাও সোজা উধুয়ানালায় গিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিলেন।

এইবার কথা উঠল, ঐ ফৌজের সর্বাধ্যক্ষ কে হবেন। মীর কাশিমের পরম বিশ্বাসী আলী ইব্রাহিম খাঁ এর আগেই তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কামগড় খাঁর সঙ্গে তাঁর একটা মিটমাট করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন কামগড় খাঁকে অধিনায়ক হয়ে উধুয়ানালায় যেতে বলায় তিনি প্রস্তাবটা এড়াবার জন্যে বললেন—উধুয়ানালায় এত লোক জড়ো হয়েছে যে, সেখানে তাঁর আর স্থান কোথায়? সেখানকার সব জায়গাই তো ভর্তি হয়ে গেছে, খালি জায়গা তো একটুও দেখা যাচ্ছে না।—ঐ জবাব শুনে আলী ইব্রাহিম অপ্রস্তুত বনে গিয়ে খানিক আমতা-আমতা করে প্রস্তাব করলেন, তবে কামগড় খাঁকে বর্ধমানে পাঠানো হোক। তিনি বীরভূমের জঙ্গল পেরিয়ে সেখানে গিয়ে ইংরেজদের রসদপত্রের সরবরাহ বন্ধ করবার চেষ্টা দেখুন, আর পিছন দিক থেকে হানা দিতে দিতে তাদের উৎখাত করতে থাকুন। কামগড় খাঁ গড়িমসি করে সেদিকে যাত্রা করবার আগেই উধুয়ানালার লড়াই খতম হয়ে গেল। গুরগিন খাঁকেও একবার

উধুয়ানালায় যাবার জন্যে ধরা হয়েছিল। তিনি জানালেন, ঐ অসময়ে তাঁর উচিত কাজ হচ্ছে সর্বদাই তাঁর মনিবের কাছাকাছি থেকে তাঁকে রক্ষা করা, তিনি সেই চেষ্টাই প্রাণপণ করবেন।

ফলে হল কি, বিভিন্ন সেনাপতিদের এক করে চালাবার মতো কমাণ্ডার-ইন-চিফ করে কাউকেই লড়াইয়ে পাঠানো গেল না। সকলের মাথার উপর একজন কেউ না থাকায় অত বড় সেনাবাহিনী হল যেন এক কন্ধকাটা কবন্ধের দল। মীর কাশিম নিজেই সর্বাধ্যক্ষ হয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সে-সুযোগ তিনি নিলেন না। সকলকে বঞ্চনা করে দিয়ে তিনি অবশেষে মুঙ্গেরেই ফিরে গেলেন। তার বাকি সেনারা গুরগিন খাঁর কর্তৃত্বে শহরের বাইরে ক্যাম্প পেতে পড়ে রইল।

মুঙ্গেরে ফেরার একটু আগে থেকেই গুরগিন খাঁয়ের উপর মীর কাশিমের মন বিগড়িয়ে গিয়েছিল। একেই তার মন সর্বদাই সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছে, তার উপর বার বার হারতে হারতে বাই মাথায় চড়ে গিয়ে পাগলামিতে দাঁড়াবার জোগাড়। খোজা পিত্রুসের কাণ্ডকারখানা তাঁর কাছ থেকে চেপে রাখা যায়নি। উপরন্তু ইংরেজ কমাণ্ডার অ্যাডামসও গুরগিন খাঁকে যে পত্র লিখেছেন তাতে মীর কাশিমকে ধরে বেঁধে ইংরেজদের হাতে সঁপে দিলে গুরগিন খাঁ অনেক টাকা বকশিশ পাবেন, এমন ইঙ্গিত ছিল। কানাঘুসোয় মীর কাশিমের কানে সেটাও এসে পৌঁছিয়েছিল। যেটা পৌঁছয়নি সেটা হচ্ছে এই যে, গুরগিন খাঁ ইংরেজদের ঐ নীচ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গুরগিন খাঁ অন্নদাতা মীর কাশিমের সঙ্গে স্বপ্নেও কোনো দিন বিশ্বাসঘতা করার কথা মনে ভাবেননি। কিন্তু মন যখন সাফ থাকে না তখন সত্য একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেও তাকে চিনে নিতে পারা যায় না। আর বিশ্বাস করবই বলে কোমর বেঁধে লেগে পড়লে অসম্ভব এমন-কিছুই নেই যাতে প্রত্যয় না হতে থাকবে।

ঠিক ঐ সময়ে গুরগিন খাঁ অসাবধানে এমন-একটা অবিবেচনার কাজ করে বসলেন যে, তাতেই তাঁর কাল হল। গুরগিন খাঁ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মীর কাশিমের ফৌজ তখনো এমন কাজের হয়নি যে, তাই নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে তিনি কোথাও জয়ী হতে পারবেন। কারণ, মীর কাশিম অনেক কিছু অসাধ্যসাধন করলেও দেশের লোকের চরিত্র একটুও সংশোধন করতে পারেননি। গুরগিন খাঁ তাই তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন শ্বশুর মীর জাফরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা মিটমাট করে নেন। নিজেদের মধ্যে

একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলে দুজনেই একটু শান্তিতে থাকতে পারবেন। কথাটা মীর কাশিমের সত্যিকার হিতার্থেই বলা, কিন্তু হিতবাক্য মনোহারী না হলে তেমন কাজের হয় না বলেই দেখা যায়। তাতেই তো শাস্ত্রে সাবধান করে দেওয়া আছে, কখনো অপ্রিয় সত্য বলবে না। অনেক মুনিঋষিও সে-সত্য সহ্য করে উঠতে পারেননি, মীর কাশিম তো কোন ছার। তিনি ঠারেঠুরে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, গুরগিন খাঁকে কেউ ইহলোক থেকে সোজা পর-লোকে পাঠাতে পারলে তিনি তার উপর খুশি বই বেখুশ হবেন না।

সে-রাত্রে পচা গরম। কোথাও এক চলকাও হাওয়া নেই। পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। গুরগিন খাঁ নিজের তাঁবুতে তিষ্ঠতে না পেরে একটা বড় তাঁবুর সন্ধানে গেলেন। সেখানেও যে গুমটকে সেই গুমট দেখে তিনি আবার ফিরে চললেন। নিজের তাঁবুর প্রায় কাছে এসে পড়ছেন, এমন সময় মোগল ঘোড়-সওয়ারদের একজন হঠাৎ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সেনাপতির পথ আগলিয়ে দাঁড়াল। তার পর জোরগলায় নালিশ ঠুকতে লাগল যে, দিনকাল যা পড়েছে তাতে মাইনে সে যা পায় তাতে তার খাই খরচও কুলোয় না। জিনিসপত্রের দাম দিন দিন যা আগুন হয়ে উঠছে, তাতে মাইনে আরো খানিক না বাড়ালেই নয়। পথের মাঝে আচমকা ঐরকম একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটাতে গুরগিন খাঁ বিষম রেগে উঠে তাঁর বডিগার্ডকে হুকুম করলেন—ঐ বেয়াদবটাকে ধরে এখনি ওর হাতে হাতকড়া লাগাও। কিন্তু গার্ড এগিয়ে যাবার আগেই চোখের নিমিষে এক কাণ্ড ঘটে গেল। খাপের থেকে ফস করে তলোয়ার বের করে লোকটা গুরগিন খাঁর বুকে পিঠে গলায় কোমরে দমাদম ঘা-কতক কোপ বসিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মরণাপন্ন অবস্থায় গুরগিন খাঁকে ধরাধরি করে এক পালকিতে তোলা হল। তাঁর নিজের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাকে কোনোক্রমে বিছানায় শুইয়ে দিতে গুরগিন খাঁ ইশারায় একটু জল চাইলেন। কিন্তু মুখের জল আর পেটে পৌঁছল না, গলার ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ল। মীর কাশিমের ফৌজে ক্রীশ্চান পল্টনদের দরুন এক পাদ্রী মোতায়েন ছিলেন। গুরগিনের মরণ আসন্ন দেখে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসা হল। তিনি এসে ক্রীশ্চানী কেতায় অন্তিমকালের মন্ত্র আওড়াতে বসলেন। দেখতে দেখতে গুরগিন খাঁয়ের শেষ নিঃশ্বাস বাতাসের গায়ে মিলিয়ে গেল। প্রভুভক্ত ঐ সেনাপতি আমরণ মীর কাশিমের সেবাতেই নিযুক্ত থেকে অপমৃত্যু বরণ করলেন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র তেত্রিশ বছর।

মীর কাশিমকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে খানিকটা মায়াকান্না কেঁদে একটু লোক-দেখানো শোক প্রকাশ করে স্বস্থানে ফিরে গেলেন। কাছে-পিঠে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কারো বুঝতে বাকি রইল না, মীর কাশিম মনে মনে খুবই আরাম বোধ করলেন। সেই রাত্রেই তাঁবু থেকে গুরগিন খাঁর লাশ বের করে নিয়ে গিয়ে এক নামগোত্রহীন কবরে তাঁকে গোর দেওয়া হল। কবরের উপর এক টুকরো পাথর চাপা দিয়েও চিহ্ন রাখা রইল না যে, পরে লোকে চিনে নিতে পারবে কোথায় ছিল গুরগিন খাঁর গোর।

॥ পঁচিশ ॥

যেদিন গুরগিন খাঁয়ের মৃত্যু হল ঠিক সেই দিন ইংরেজ কমাণ্ডার মেজর টমাস অ্যাডামস সদলবলে বাদশাহী সড়কের উপর দিয়ে মার্চ করতে করতে সুতী থেকে পালকিপুরে গিয়ে ছাউনি ফেললেন। তাঁর ভারী-ভারী জিনিসপত্র বড়-বড় কামান-গোলা গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকো-বোঝাই হয়ে চলেছে। পালকিপুর উধুয়ানালার ঠিক উলটো দিকের চার মাইল দূরে একটা নগণ্য গ্রাম।

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে যাবার বাদশাহী রাস্তা উধুয়ানালার কাছে এসে সরু একটা ফালি হয়ে গিয়ে রাজমহল পাহাড় ভেদ করে চলে গেছে। সেখানে রাস্তার একদিক ঘিরে লম্বা এক বিলের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক জলা, আর অন্যদিকে বয়ে চলেছে গঙ্গা। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পথটা যেখানে ফাঁকায় বেরিয়ে পড়েছে সেইখানে উধুয়া বলে একটা ছোট পাহাড়ী নদী—নালা বলাই ঠিক—পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে মাটিতে এসে পড়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। রাস্তাটা যেখানে নালার মুখে গিয়ে ঠেকেছে সেখানে পার হবার জন্যে একটা পাথরের পুল দেওয়া আছে। তারই উপর দিয়ে রাস্তা পশ্চিমে চলে গেছে। ঐ উধুয়ার খাল থেকেই জায়গাটারও নাম হয়েছে উধুয়ানালা।

স্থানটা খাস বাংলা থেকে বিহারে ঢোকবার মুখেই পড়ে বলে রণতন্ত্রের মতে তার দাম খুব বেশি। বাদশাহী সড়ক যার অধিকারে, তার সঙ্গে এক দফা লড়াই না করে তার চোখ এড়িয়ে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা অসম্ভব। তাই অনেক কাল আগে থেকেই ঐ পুলের পাশেই একটা কেল্লা গাড়া আছে। সম্প্রতি মীর কাশিম ইংরেজদের গতিরোধ করবার জন্যে কেল্লার ঠিক সামনেই —উত্তরে গঙ্গার ধার থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে পাহাড়ের গা পর্যন্ত এক মাইল জুড়ে—একটা পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন। সে-পাঁচিল ষাট ফুট মোটা আর দশ ফুট উঁচু। পাঁচিলের উপর আবার আঠারো ফুট উঁচু আর সাত ফুট চওড়া এক প্যারাপেট। তাছাড়া ভিতরে ঢোকবার গেটগুলো ছেড়ে দিয়ে পাঁচিলের ঠিক সামনেই ষাট ফুট চওড়া আর বারো ফুট গাড়া এক খাত। গেট দিয়ে ছাড়া যাতয়াতের অন্য আর-কোনো সোজা রাস্তা নেই।

মীর কাশিম চারদিক ভেবেচিন্তেই জায়গাটাকে মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন। পাঁচিলের উপর খানিক দূর অন্তর অন্তর এক-একটা করে কামানঘাঁটি, তাতে কোথাও দুটো কোথাও তিনটে কোথাও আবার চারটে করেও তোপ বসানো। দক্ষিণ দিকের পাঁচিল যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাহাড় থেকে আলগা প্রকাণ্ড একটা পাথরের টিপি। তার উপরটা ঘেরাও করে নিয়ে মাঝখানে আরো-বড় একটা ঘাঁটি পাতা। একশো দেড়শো বড়-বড় কামান টেনে এনে উধুয়ানালায় ফেলা হয়েছে। লড়াইয়ের বিস্তর সরঞ্জাম আর রাশীকৃত রসদপত্র একজায়গায় জড়ো করা হয়েছে যাতে দরকারের সময় সবই তখনি হাতের নাগালে পাওয়া যায়, কোনো-কিছুরই অভাব না ঘটে। পাঁচিলের ওপারে মীর কাশিমের চল্লিশ হাজার সৈন্য তাদের ক্যাম্প পেতেছে। ক্যাম্পের ভিতর আবার চাঁদনিচকের মতো দোকানপাট। রাতের বেলায় রঙিন রোশনাইয়ে চারদিক ঝলমল। বাইজী, কসবী, নাচওয়ালী, সারেঙ্গী, এসরাজী, তবলচী—কিছুই বাদ যায়নি। সেনাধ্যক্ষ থেকে আরম্ভ করে সামান্য সেপাই পর্যন্ত সবাই নিশ্চিন্ত মনে খাওয়াদাওয়ায় সরাবটানায় নাচগানে আমোদ প্রমোদে লোচ্চামিতে রোজই মত্ত হয়ে থাকে। সকলেই ধরে নিয়ে বসে আছে, উধুয়ানালার মতো জায়গা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ইংরেজ তো ইংরেজ, টুপিওয়ালাদের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষেরও কারো সাধ্যে নেই।

মেজর অ্যাডামস চার মাইল দূরের পালকিপুর ক্যাম্প থেকে উধুয়ানালার পাঁচিলের আকাশ-ছোঁয়া প্যারাপেট দেখতে পেলেন। দেখে তাঁর কি মনে হয়েছিল তা জানবার উপায় এখন আর নেই। বড় কঠিন সমস্যার মধ্যে তিনি পড়েছেন। ঐখানে ইংরেজেরা যদি হারে তাহলে বাংলাদেশের ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও আর তাদের ঠাঁই হবে না। ডেরাডাণ্ডা তুলে সটান দেশের দিকে সরে পড়তে হবে। পলাশীর মাঠে পড়ে ক্লাইভের যে-দশা হয়েছিল উধুয়ানালার সামনে দাঁড়িয়ে মেজর অ্যাডামসের অনেকটা সেই অবস্থা হল। মুখ গম্ভীর করে তিনি তাঁর হাজার গোরা পল্টন আর পাঁচ হাজার দেশী সেপাই নিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। ক্যাম্পের সামনে সুড়ঙ্গ কেটে তাতে শালবল্লার থাম তুলে দিয়ে মধ্যেকার ফাঁকগুলো চাঁচের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। জলা পেরিয়ে পাঁচিলের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা স্রেফ পাগলামির কাজ। করলে, সবাই মিলে চোরাকাদায় ডুবে গিয়ে কোথায় যে তলিয়ে যাবে কেউ তার আর ঠিকানাও করতে পারবে না। একমাত্র গঙ্গার পাড়ে পাড়ে গুনটানার পথে একটু একটু করে এগোনো সম্ভব। অ্যাডামস গঙ্গার পাশেই

পর পর তিনটে কামানঘাঁটি তুলে ফেললেন। নৌকো থেকে বড় বড় তোপগুলো নামিয়ে নিয়ে এসে সেখানে সাজানো হল।

পুরো তিনটে হপ্তা কেবল ঐ করতেই কেটে গেল। পাঁচিলের সবচেয়ে কাছে যে কামানঘাঁটিটা বসল সেটা দেওয়াল থেকে তিনশো গজ দূরে। আপাতত তার চেয়ে কাছে আর এগোনো গেল না। কিন্তু অত বড় বড় হাঁ-ওয়ালা কামান থেকে বোমগোল্লা ছেড়েও সামনের ঐ মোটা পাঁচিলের কিছুই করা গেল না। গঙ্গার দিকের গেটের এক কোণে একটা ছোট্ট চিড়খাওয়া গর্তমতন হল বটে, কিন্তু সেটা কোনো কাজেরই নয়। একটা জোয়ান মদ্দ কুঁকড়িমুকড়ি মেরেও কোনোক্রমে তাতে মাথাটা পর্যন্তও গলাতে পারে না। অবস্থা ক্রমশ চরমে উঠছে দেখে, মেজর অ্যাডামস গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন—অতঃপর কি করা? কিন্তু সর্বত্রই অন্ধকার, কোথাও তো একটু আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছে না। আশা ভরসা তো আর টেঁকে না।

ইতিমধ্যে মীরজা নজফ খাঁ বলে মীর কাশিমের এক পারশিয়ান ক্যাপ্টেন তাঁর অধীনস্থ ছোট্ট একটা দল নিয়ে পাঁচিলের গেট দিয়ে বেরিয়ে জলার ভিতরকার এক অদৃশ্য পথ বেয়ে ইংরেজদের ছাউনিতে বারকতক হানা দিয়ে গেলেন। মীর কাশিমের দলে ইনিই একমাত্র সেনাপতি, যিনি পাঁচিলের আড়ালে বসে আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেননি। নজফ খাঁ খানদানী ঘরের ছেলে। অবস্থা পড়তির দিকে যেতে তিনি দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানে এসে প্রথমে অযোধ্যার নবাবের বিশাল ফৌজে চাকরি স্বীকার করেন। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে তার তেমন বনলো না। তখন তিনি বঙ্গদেশে এসে মীর কাশিমের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার ফৌজে যোগ দেবার প্রার্থনা জানালেন। অনুচরদের সংখ্যা তার খুব কম হলেও তারা সবাই তাদের সদারের মতোই সাহসী বীর, যুদ্ধে নিপুণ। মীর কাশিম তাঁকে উদুয়ানালায় পাঠিয়ে দিলেন। পররর্তীকালে নজফ্ খাঁ ইংরেজদের কৃপায় দিল্লির বাদশা শা আলমের আশ্রয়ে থেকে অনেক উন্নতি করেছিলেন। কালক্রমে বাদশার কমাণ্ডার-ইন-চিফ থেকে শেষ অবধি তার উজিরও হতে পেরেছিলেন। তখন জুলফিকর-উদ্দৌলা টাইটল পেয়ে তিনি দিল্লির ওমরাওদের মধ্যে একজন মাতব্বর হয়ে বসেন।

নজফ্ খাঁর হামলায় ইংরেজদের ক্ষতি যতটা না হয় হয়রানি হয় তার ঢের বেশি। একদিন নজফ্ খাঁর দল অতর্কিতে এসে নবাব মীর জাফর যেদিকে ক্যাম্প পেতে আছেন ঠিক সেই দিকটাতেই হানা দিয়ে বসল। সেখানটায়

হঠাৎ এতই সোরগোল লাগিয়ে দিল যে, ভয়ের চোটে মীর জাফর ঘাটে-বাঁধা বজরায় ওঠবার জন্যে পড়ি-কি-মরি করে গঙ্গার দিকে এমনি ছুট মারলেন যে, ইংরেজদের তেলেঙ্গী সেপাইরা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে না ফেললে সেইদিনই তাঁর ঐখানেই হয়ে যেত। ইংরেজরা লক্ষ করতে থাকে, প্রায়ই পাঁচিল ভেদ করে একদল লোক আসছে-যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই টের পায় না, কোথা দিয়ে তারা আসে কিম্বা কোথা দিয়ে আবার তারা ক্যাম্প ফিবে যায়। চোখেব অগোচর পথ যে একটা আছে সেটা বেশ মালুম হতে থাকে বটে, কিন্তু সেটা যে কোথা দিয়ে গেছে তা তারা কিছুতেই ধরে উঠতে পারে না।

কিন্তু কপালজোর যার আছে পাঁচিল তুলে তাকে কে রুখবে? একসময একজন ইংবেজ পল্টন কি কারণে জানিনে, কোম্পানীর ফৌজ থেকে পালিযে গিয়ে মীব কাশিমেব দলে ভেড়ে। পাঁচিলের ওদিক থেকে সে-ব্যক্তিও রোজই নজব কবে, নজফ্ খাঁব লোকেবা কেল্লা থেকে বেবিয়ে কোথা যেন যায় আবার খানিক পবে কোথা থেকে যেন হাসিমুখেই ক্যাম্পে ফিবে আসে। দেখতে দেখতে জলাব ভিতর দিযে যাওয়া-আসার লুকোনো পথটা সে চিনে ফেলল। তখন কি জানি কি কাবণে, বোধ করি যুদ্ধ আসন্ন দেখে, হঠাৎ তাব মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হল —শেষে কি স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে তাকে অস্ত্র ধরতে হবে? অথচ ইংরেজদের দলে সে সোজাসুজি ফিরেও যেতে পারে না, তারা তার পরিচয় পেলেই হয় তাকে তখনই ফাঁসিকাঠে লট্‌কে দেবে, নয় তো তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে গোলা ঠুকে হাওয়া করে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু দিন দিন অনুশোচনার বেগ তার মনকে এমনি মোচড় দিতে লাগল যে, সে আব একদণ্ডও স্থির হয়ে থাকতে পারে না, সর্বদাই ছটফট করতে থাকে, যেন সর্বাঙ্গে হাজার-হাজার বিছে একসঙ্গে কামড় মাবছে।

একদিন গভীর রাত্রে যা থাকে কপালে বলে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে ঐ গুপ্ত পথ বেয়ে ইংরেজদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠল। পাহারাদার শান্ত্রীরা তার গলার আওয়াজে অন্ধকারেও তাকে ইংরেজ বলে ধরে ফেলল। তখন সে জানাল, মেজর অ্যাডামস তার দোষঘাট সব মাফ করে নিয়ে তাকে আবার যদি দলে ফিরিয়ে নেন, তাহলে সে ঐ জলা পার হবার অদৃশ্য পথটা ইংরেজদের দেখিয়ে দিয়ে, নিজেই তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণের পাথরের ঢিবিব কাছের পাঁচিলটা পর্যন্ত পৌছে দেবে। সে-জায়গায় পাঁচিলের সামনে খাত না থাকায় পার হওয়ার বালাই নেই। তখন এমনি সংকটকাল যে, ভালোমন্দ বাছবিচারের একটুও অবকাশ ছিল না। মেজর অ্যাডামস ভাবলেন, স্বয়ং

ভাগ্যলক্ষ্মীই বুঝি-বা তাঁদের উপর সদয় হয়ে তাঁদের উদ্ধারের জন্যে নিজের দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোকটার সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে তিনি তাঁকে আদর করে কাছে ডেকে নিলেন।

সে রাত্রে অবশ্য আব-কিছু করা গেল না। পরদিন সকাল থেকেই তোড়জোড় চলল। স্থির হল, ক্যাপ্টেন জেম্‌স আরভিং সর্বাগ্রে বোমারুদের দল নিয়ে এগিয়ে যাবেন, তাঁর পিছন পিছন যাবে দু-দল সেপাই-পল্টন। বাকিরা ক্যাপ্টেন মোরানের তত্ত্বাবধানে সুড়ঙ্গের মুখে এগিয়ে গিয়ে এমন ভাব দেখাতে লেগে যাবে যেন দেখলেই মনে হতে থাকে যে, তারা বুঝি তখনি যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে পডবে। কিন্তু কথা রইল, ক্যাপ্টেন আরভিং-এর কাছ থেকে যতক্ষণ না কোনো নিশানা পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত তারা এদিক-ওদিক কোনো দিকেই এক-পা কোথাও নডবে-চডবে না। দূর থেকে মশালের আলো দেখতে পেলে তবেই সংকেত বুঝে নেবে যে, সব ঠিক আছে। তখন গঙ্গার ধার বেয়ে তারা পাঁচিলের দিকে এগোতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে কামান ঘাঁটি-গুলোও এক নাগাড়ে জোর-জোর তোপ দেগে যাবে। মেজর কারন্যাকের সঙ্গে কিছু সেনা পিছনে রিজার্ভ রইল, যখন যেখানে দরকার মনে হবে তিনি তখনি সেই দিকে তাদেব কতক কতক কবে পাঠিয়ে দেবেন। মালপত্র আগলাবার জন্যে সামান্য কিছু লোক ক্যাম্পে রয়ে গেল।

রাত দুটো নাগাদ লোকটা আবার এসে হাজির। সবাই তৈরি ছিল, তখনি যাত্রা শুরু হয়ে গেল। লোকটা তো রাস্তা দেখিয়ে দিয়েই খালাস, কিন্তু যুদ্ধের মালমশলা সঙ্গে নিয়ে সে-রাস্তা পার হওয়া যে কি কঠিন কাজ, সে-কথা তো সে ঘুণাক্ষরেও কাউকে আগে জানিয়ে দেয়নি। গোলা-বারুদ সব মাথায় চড়াতে হল, পাছে স্যাঁৎসেঁতে পথ দিয়ে যেতে যেতে ভিজে গিয়ে সে-সব কাজের বার হয়ে যায়। পাঁচিল টপ্‌কাবার মইগুলোও মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে হল, যাতে না কাদায় ঠেকে সে-সব সেইখানেই আটকে পড়ে থাকে। জলকাদা ঠেলে তারই মধ্য দিয়ে সেপাই-পল্টন খুব সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে চলল। আলো জ্বালার উপায় নেই, কোনোরকম শব্দ করাও চলে না। একটু হাঁচবার-কাশবারও জো নেই, শত্রুপক্ষের কাকপক্ষীও টের পেয়ে গেলে দলকে দলসুদ্ধ সবাইকে সোজা জাহান্নমে যেতে হবে।

কিন্তু ইংরেজদের খুবই বরাতজোর। শত্রুপক্ষের একটা লোকও জেগে নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আমোদ করে তখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে। এমনকি পাহারাদার শাস্ত্রীরাও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ক্যাপ্টেন আরভিং

তাঁর দলবল নিয়ে পা টিপে টিপে একটু করে এগোতে এগোতে অবশেষে পাঁচিলের ধার পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পাঁচিলের গায়ে মই লাগিয়ে তাই বেয়ে পাঁচিলের ছাতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে কয়েকজন শান্ত্রী নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিল। বেয়োনেটেব খোঁচায় তাদের ভবনদী পার করে দিতে দু-মিনিটও সময় লাগল না। তার পর আবাব মইয়ে চড়ে প্যারাপেট টপ্‌কাতে আর কোনো অসুবিধা হল না। কিন্তু ইংরেজদেব দিকের সমস্ত সেপাই-পল্টন পাঁচিলে চড়ে পডবার আগেই সব জানাজানি হয়ে গেল। গভীব নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চোখের সামনে যমদূতের মতো ইংরেজদের ঝক্‌ঝকে বেয়নেট উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের এমনি ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল যে, কিছু করবার শক্তি যেন একেবারে লোপ পেয়ে বসল। দিশেহারা হয়ে তারা এলোপাতাড়ি একবার এদিক আর-একবার ওদিক ছোটাছুটি করেই মবল। তখন পাঁচিলের উপরকাব সব কামানঘাঁটিই একটার-পব-একটা ইংরেজদের হাতে এসে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন আরভিং ততক্ষণে কতক লোকজন নিয়ে সেই পাথরেব ঢিবির উপরকার ঘোরানো বেড়া টপ্‌কে তার মাথায় চড়ে বসেছেন। তার পর আগেকার বন্দোবস্ত-মাফিক এই মোটা এক মশাল জ্বালিয়ে সেটাকে মাথার উপর তুলে ধরলেন। চাবদিক আলোয় আলো হয়ে উঠল। সুড়ঙ্গের ভিতর ক্যাপ্টেন মোরান তৈবি হয়ে বসে ক্ষণ গুণছিলেন। যাহাতক মশালেব আলো দেখতে পাওয়া, তাঁহাতক তিনি দলবল নিয়ে বাঁই বাঁই করে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পডলেন। সঙ্গে সঙ্গে কামানঘাঁটিগুলো থেকে গোলন্দাজরা মিনিটে মিনিটে তোপ দাগতে লেগে গেল। শত্রুপক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তারা কামানগুলো ঠেলে ঠেলে পাচিলের আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে চলল। মোবানের দল অতিকষ্টে পাঁচিলেব সামনের খাত সাঁতরে পাঁচিলের গায়ে গিয়ে উঠল। ওদিকে বাববার দশসেরী গোলা এসে দেওযালেব উপর পড়তে থাকায় গেটের মাথার উপরকার সেই ভাঙা জায়গাটার ফাঁক একটু একটু করে বেড়েই যেতে লাগল। তারই মধ্যে দিয়ে জনকতক লোক আগুপিছু হয়ে ঢুকে পড়ে পাঁচিলের ওপারে গিয়ে ভিতর থেকে গেটেব দরজা খুলে দিল। তখন হাজার-হাজার সেপাই-পল্টন সেই খোলা দরজা দিয়ে পিলপিল করে পাঁচিলের ভিতরে ঢুকে পডল।

তার পর ক্যাপ্টেন আরভিং আর ক্যাপ্টেন মোরানের দল একজোট হয়ে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের উপর বাঘের মত আছড়ে পড়ল। লড়াই যা হল তা

নিতান্তই একতরফা। দেশী সেপাই-জমাদাররা কেউই রাতের লড়াইয়ে বড়-একটা তেমন রপ্ত নয়, তাই পারতপক্ষে তারা রাত্রে কখনো লড়তে চায় না। তারা জানে ভগবান রাত্রিকাল সৃষ্টি করেছেন সারাদিনের খাটুনির পর আরাম করে একটু ঘুমোবার জন্যে। কিন্তু টুপিওয়ালারা এক আজব জাত, তাদের রাত-বেরাতের কোনো জ্ঞান নেই। তাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে লড়া যায় কি করে? কিন্তু ঐ প্রকাণ্ড জলা পেরিয়ে তারা এখানে এলই-বা কি করে—উড়ে নাকি? আর ষাট ফুট মোটা অমন মজবুত দেওয়াল তারা ভাঙলই-বা কি দিয়ে? তাদের গোলাগুলি জিন-দানাদের তৈরি নাকি? টুপিওয়ালাদের রকম দেখে তাদের হাত-পা বসে গেল। বুদ্ধিও আর খোলে না। যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে, চোখের সামনে ইংরেজদের গোলাগুলি সমানে ছুটে চলেছে।

তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মার খেতে লাগল। মারের চোটে জড়ভাবটা যখন খানিক কাটল তখন আর লড়বে কি? তখন একমাত্র চিন্তা—কি করে প্রাণ বাঁচে। সেদিকেও আবার বিপদের উপর বিপদ। পালাবার রাস্তা তো সেই পুলের উপর দিয়ে। সাঁকো পেরোবার মুখেই আগের থেকে একদল সেপাই জমা করা ছিল। তাদের উপর কড়া হুকুম দেওয়া আছে, ফৌজের কোনো সেপাই যদি সেদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে যেন তখনি গুলি করে মারা হয়। তারা অক্ষরে অক্ষরে ঐ আদেশ পালন করল। ইংরেজদের গোলাগুলিতে যত না লোক মরল তার আটগুণ মরল নিজেদেরই সেপাইদের গুলি খেয়ে। অনেকে ইংরেজদের হাতে ধরা দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। অনেকে আবার সামনের নালায় ডুব মেরে সাঁতরে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। কতক লোক পথ হারিয়ে সমস্ত পাহাড়টা ঘিরে বহু দূর ঘুরে তবে পালানোর রাস্তা পেল।

ওরই মধ্যেও তবু মীরজা নজফ্ খাঁ যা-একটু লড়লেন। কিন্তু তাঁর দলে লোক আর কত? বড়-জোর কুড়ি-পঁচিশ জন হবে। তারা একা-একা কত আর যুঝবে? শেষে তারাও ক্ষান্ত দিয়ে সরে পড়ল। মারকার অ্যারাটুন সমরু প্রথমটা সামান্য একটু লোক-দেখানো লড়াই করে চটপট যুদ্ধে ইস্তফা দিলেন। তাঁদের সেপাই পল্টন পালাল বটে, কিন্তু সব বেশ দলবেঁধে সুশৃঙ্খলায়। সাঁকোর কাছের সেপাইরা ঐ তিন ক্যাপ্টেনকে ভালো করেই চিনত, তাই তাঁদের আর তাঁদের দলকে পুল পার হতে দিতে কোনোই ওজরআপত্তি করল না। বাকি সবাই ছত্রভঙ্গ। কে যে কোনদিকে গেল তার আর কোনো হদিসই পাওয়া

গেল না। চল্লিশ হাজারী এক বিরাট ফৌজ যেন একটা ফুঁয়ের চোটেই দেখতে দেখতে কর্পূরের মতো উড়ে গেল। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে আর তার আশে-পাশে প্রায় পনেরো হাজার মৃতদেহ নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। এর তুলনায় ইংরেজদের ক্ষয়ক্ষতি সামান্য পিঁপড়ে-কামড়ের মতো। ঘটনার তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ সাল।

॥ ছাব্বিশ ॥

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ যেমন শত্রুপক্ষের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছিলেন উধুয়ানালার যুদ্ধে মেজর টমাস অ্যাডামসও ঠিক তাই করলেন। এখানে ঐ দু-জন জেনারলের মধ্যে অনেক মিল। তবে অ্যাডামস যদিও ক্লাইভের মতো নাম কিনতে পারেননি, তবু সত্যের খাতিরে এটা না বললেই নয় যে, মেজর অ্যাডামস যদি সেদিন উধুয়ানলার যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারতেন তাহলে ক্লাইভের নাম যে কোথায় ভেসে চলে যেত, তা কে জানে? তার পর রাজমহল সকরিগলি তেলিয়াগড়ি—কোথাও কিন্তু মীর কাশিমের ফৌজের টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না। ঐসব স্থানে লড়বার মতো জায়গা অনেক ছিল, কিন্তু কেউই মনের জোর করে সে-সব স্থানে ইংরেজদের রুখতে এল না। হেসে-খেলেই ইংরেজরা সে-সব জায়গা একটার-পর-একটা দখল করে নিল। তার পর একটু চাঙ্গা হয়ে নিয়েই আবার সেই মার্চ শুরু করে দিল। এইবার সোজা মুঙ্গেরের দিকে।

উধুয়ানালার লঙ্কাকাণ্ডের খবর পেয়ে মীর কাশিম আর মুঙ্গেরে থাকতে সাহস পেলেন না। আগের থেকেই সব ঠিক করা ছিল, দুঃসংবাদ আসতেই মুঙ্গেরের কেল্লার ভার আরব আলী বলে এক সেনাধ্যক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে মীর কাশিম পাটনা রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিলেন যতগুলো ইংরেজ তাঁর হাতে পড়ে বন্দী হয়ে ছিল তাদের সবাইকে। তখন তাঁর আশাভরসা সব গেছে, আছে কেবল বেঁড়ে জাঁকটুকু। মুঙ্গের ছেড়ে যাবার দিনেই তিনি বড়াই করে ইংরেজ কমাণ্ডার মেজর অ্যাডামসকে একটা চিঠি ছেড়ে দিয়ে গেলেন।

সে-চিঠি এইরকম: আজ ক-মাস ধরেই দেখছি মহামান্য বাদশার রাজ্য আপনারা একেবারে ছারখার করে তুললেন। ওরকম করবার জন্যে আপনারা বাদশার কাছ থেকে কি কোনো সনদ-নিশান পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তো আসল দলিলটা, কি নিদেনপক্ষে তার একটা নকল, আমাকে পাঠাবেন। দেখি যদি সেটা ঠিক আছে, তাহলে বাংলার সুবাদারি ছেড়ে দিয়ে আমি বাদশার হুকুম তামিল করে তাঁরই দরবারে গিয়ে হাজির হব। তখন আপনারা

মনের সুখে এখানে রাজত্ব করছেন। আপনাদের সঙ্গে লড়াই করার প্রবৃত্তি আমার এতটুকু ছিল না। প্রথমে আপনাদের এলিসই তো চোরের মতো রাতের বেলায় পাটনা শহরের উপর থামকা হামলা লাগিয়ে দিয়ে দেশের শান্তি নষ্ট করলেন। তার থেকেই তো দেখছি আপনাদের ঐ লড়াইয়ের সূত্রপাত। যাক, যা হবার হয়েছে, কিন্তু বাদশা-বাহাদুরের পরোয়ানা ছাড়া আপনারা যদি আর একটুও অগ্রসর হন, তাহলে নিশ্চয়ই জানবেন, এলিস আব তার সঙ্গীদেব মুণ্ডু কেটে আমি আপনাকে তত্ত্ব পাঠাব। মনেও করবেন না যে, তঞ্চকতা করে রাতের বেলায় আচমকা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে এসে আমার কতকগুলো ভীতু জমাদারকে ভয় পাইয়ে দিয়ে গিয়ে আপনারা বুঝি যুদ্ধ জিতে গেলেন। সাবধান, আনন্দে মেতে উঠবেন না। আল্লার দোয়ায় আমি শিগ্‌গিরই দেখিয়ে দেব যে কি করে আমি আপনাদের ঐ নষ্টামির দাদ তুলি।

পরিপাটি করে চিঠি লিখতে তখনকার দিনে মীর কাশিমের জোড়া লোক বঙ্গদেশে আর একটিও ছিল না। সে-সব চিঠি পড়লেই মনে হবে যেন সব দোষটাই আর সবাইকার, আর তিনি নিজে যেন একটি জ্যান্ত পীর, সোজা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেবে এসেছেন। বক্রোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি যতরকমের অলংকারের বর্ণনা শাস্ত্রে দেওয়া আছে তার সবকটাই তাঁর খুব ভালো করেই জানা। জানা ছিল না শুধু এই যে, ভয় দেখিয়ে ইংরেজদেব কোনো কাজে লওয়ানো কি তার থেকে টলানো—কিছুই করানো যায় না। জানলে হয়তো তাঁর চিঠিগুলোর সুর অতটা উঁচু পর্দায় উঠত না। যাই হোক, মীর কাশিমের তড়পানিতে মেজর অ্যাডামস তিলমাত্রও ভড়কালেন না। তিনি ঐ চিঠির একটা কপি গভর্নর ভ্যানসিটার্টকে পাঠিয়ে দিয়ে, মীর কাশিমকে তার এই জবাব লিখে পাঠালেন—আপনার হাতে পড়া নিরস্ত্র বন্দীদের আপনি সত্যিই যদি খুন করেন তাহলে জানবেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ালেও ইংরেজদের প্রতিহিংসা কখনো আপনাকে ছাড়বে না, আপনার পিছন পিছন ধাওয়া করতে থাকবে। আর নেহাত দৈবক্রমে যদি আপনি আমাদের প্রতিশোধেব হাত এড়াতেও পারেন, তবু সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অভিশাপ থেকে আপনি যে কিছুতেই রেহাই পাবেন না, সেটা নিশ্চয়ই জানবেন। ভালোমানুষ ভ্যান্‌সিটার্ট কিন্তু তখনো উপদেশ ছেড়ে চলেছেন—যুদ্ধকালের বন্দীরা কি মুসলমান আর কি ক্রীশ্চান উভয়েরই অবধ্য। উধুয়ানালার আগে আর পরেও আপনার যে-সব লোক আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে তাদের উপর আমাদের ব্যবহার আপনি স্মরণ করবেন। আমি

প্রত্যাশা করি, আমাদের লোকদের প্রতি আপনিও ঐ একই রকমের ব্যবহার করবেন।

১লা অক্টোবর মেজর অ্যাডামস মুঙ্গের পৌছলেন। আগেই একদল ইংরেজ গোলন্দাজ গিয়ে কেল্লার সামনে কামান পেতে রেখেছে। অ্যাডামস-সাহেব এসে পড়তেই সেখান থেকে অনবরত গোলা ছুটতে লাগল। পরদিন সকালে দেখা গেল গোলার চোটে কেল্লার দেওয়াল যতখানি ভেঙ্গেছে তা দিয়ে সচ্ছন্দে কেল্লার ভিতর ঢোকা যেতে পারা যায়। অ্যাডামস হানাদারির সব ব্যবস্থা করে ফেললেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কোনো দরকার হল না। কেল্লাদার আরব আলী খাঁ নিজেই সদলবলে বেরিয়ে এসে কেল্লা ইংরেজ কমাণ্ডারের হাতে তুলে দিলেন। কেল্লা থেকে তিনশো কামান, হাজারখানেক ছোট-বড় নানা ছাঁদের বন্দুক, রাশরাশ গোলাবারুদ ইংরেজরা এক ধাক্কাতেই পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রসদপত্রও যা হাতে এল তা একটু-আধটু নয়, এন্তার।

গোলার চোটে মুঙ্গেরের কেল্লার যেখানে যেটুকু ভেঙেচুরে গিয়েছিল সেগুলো সব সারানো চলতে লাগল। ক্যাপ্টেন ওয়াইট কেল্লার চার্জে রইলেন। কয়েক দল সেপাই নিয়ে একটা নতুন ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলবার ভার তাঁরই উপর গিয়ে পড়ল। তিনি সে-কাজ এত তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে ফেলতে পারলেন যে, তাতে করে অনুমান হয়, মীর কাশিমের সেপাইরা তাঁর ফৌজে আর ফিরে না গিয়ে ইংরেজের দলেই ভিড়ে গিয়েছিল। নবাব মীর জাফর ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে থাকায় অবশ্য ঐ কাজের অনেকটা সুবিধা হয়েছিল। মীর কাশিম পাটনা পালাবার সময় রাস্তার উপর যেখানে যত পুল-সাঁকো পেয়েছিলেন সে সবই ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো মেরামত করে উঠতে ইংরেজদের খানিকটা সময় লেগে গেল। সব ঠিকঠাক করে অবশেষে ১৫ই অক্টোবর মেজর অ্যাডামস মুঙ্গের ছেড়ে পাটনা চললেন।

ওদিকে পাটনায় বসে বসে মীর কাশিম শুনতে পেলেন যে, তাঁর সাধের মুঙ্গের-কেল্লারও হয়ে গেছে, সেটাও ইংরেজরা দখল করে নিয়েছে। তাঁর পারিষদরা তাঁকে বোঝালেন যে, বেইমান আরব আলী নিমকহারামি করেই ইংরেজদের কেল্লায় ঢুকিয়েছে, নইলে অমন কেল্লা তাদের আর লড়ে নিতে হয় না। তাতে মীর কাশিম ঐ দারুণ শোকে একটু সান্ত্বনা পেলেন কি না জানি নে, কিন্তু তিনি যে মুঙ্গের যাওয়ার খবর পেতেই একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানসুদ্ধ হারিয়ে বসে ইংরেজ বন্দীদের সবাইকে একাধারে কোতল করার হুকুম দিয়ে দিলেন, সে-কথা কি দেশী কি বিদেশী সবাই একবাক্যে লিখে রেখে গেছেন।

জল্লাদ সমরুকে ডেকে তারই উপর ঐ হত্যাকাণ্ড-সমাধার ভার দেওয়া হল। আর কারো উপর চাপালে সে-ব্যক্তি হয়তো সাদা চোখে অত বড একটা পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে পারত না।

ইংরেজ বন্দীদের বেশির ভাগকেই নবাব আলীবর্দী খাঁর বডভাই হাজী আহমদের পুরনো বাডিতে আটক করে রাখা হয়েছিল, চার-পাঁচজনকে পাটনার কেল্লার মধ্যেকার চেহেলসাতুনে, অর্থাৎ চল্লিশ থামওয়ালা দরবার বাডিতে। ডাক্তার উইলিয়ম ফুলারটন তাঁর চিকিৎসার কেরামতি দেখিয়ে মীর কাশিমের সুনজরে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই তাঁকে অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে খানিক ভালো বন্দোবস্তেই কেল্লার মধ্যে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যের মুখে সমরু দু-দল সেপাই নিয়ে গিয়ে হাজী আহমদের বাডি চডাও হলেন। তার আগেই ইংরেজদের ভালো করে একটা ভোজ খাওয়াবার নাম করে তাদের ছুরি-কাঁটা যা-কিছু ছিল সবই ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইংরেজ বন্দীরা তখন সবে চা খেয়ে উঠছে, এমন সময় এলিস, লাসিংটন আর হে-র ডাক পড়ল—ক্যাপ্টেন সমরু এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

এলিসরা যাবার জন্যে উঠে দাঁডাতে আরো পাঁচ-ছ জন ইংরেজ অফিসরও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। সমরু যে ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা সেই ঘরের চৌকাঠ মাডাতেই তিনি দৌডে গিয়ে এক হাতে এলিসের চুলের মুঠি খাবলে, আর-এক হাত দিয়ে তাঁর ঘাডটা কাত করে ধরলেন। তখন তাঁর হুকুমে এক সেপাই দৌডে এসে তলোয়ারের এক কোপে এলিসের গলাটা কেটে ধডের থেকে আলাদা করে ফেলল। তাই দেখে লাসিংটন আর থাকতে পারলেন না, রাগের চোটে ছুটে গিয়ে এক ঘুঁসিতেই ঐ লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিয়ে আরো দুজন সেপাইকে শুধু ঘুঁসিয়ে ঘুঁসিয়েই জখম করে তুললেন। তখন সমরু নিজে এসে তলোয়ার দিয়ে তাঁকে দু-খান করে কেটে ফেললেন। তার পর উইলিয়ম হে আর বাকি ছোকরা সাহেবদের পালা। তলোয়ারের খোঁচায় তাঁদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে অবশেষে তাঁদের ছাগল-ভেডার মতো টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হল। বাডির গায়েই পুরনো একটা শুকনো কুয়ো পড়ে ছিল, জল্লাদরা তারই মধ্যে লাশগুলো ছুঁডে ফেলে দিয়ে মৃতদের সৎকার করল।

ততক্ষণে বাকি বন্দীদের ঘর থেকে টেনে বের করে উঠোনে সারবন্দী করে দাঁড করানো হয়েছে। বাডির ছাদের উপর সমরুর আর-এক দল সেপাই টহল

দিচ্ছিল। তারা ঐ নিরুপায় ইংরেজদের উপর টিপ করে করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। যে-কজন গুলির চোটে মরল, তারা তো একরকম বেঁচে গেল। যারা মরল না, তারা ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু নিস্তার পেল না। সঙ্গে সঙ্গেই সমরু আর তার সেপাইরা তাদের পিছন পিছন তেড়ে গেল। তখন বেচারীরা হাতের কাছে যা পেল—বোতল, পেলেট, ইঁটের থান, পাথরের খোয়া—তাই দিয়েই গুলি আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে জনকতক সেপাই বন্দুক ফেলে দিয়ে বলে উঠল, তারা হালালখোর নয়, নিরস্ত্র ব্যক্তিদের উপর তারা গুলি চালাতে পারবে না। কয়েদীদের হাতিয়ার দেওয়া হোক, তাহলে তারা প্রাণপণ তাদের সঙ্গে লড়ে যেতে রাজী আছে, কিন্তু অমন অসহায় লোকদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাই করা আর যাদের কাজ হোক, সেপাইদের নয়। ঐ কথা শুনে রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠে সমরু সর্বাগ্রে তাদেরই খুন করে ফেলল।

সারা রাত ধরেই ঐ খুনোখুনি কাণ্ড চলল। ভোর হতে মৃতদেহ সব একঠাই করে, কুয়ো ভর্তি করা হল। গলস্টোন বলে এক ছোকরা সিভিলিয়নের প্রাণ তখনো বুকের কাছে ধুকধুক করছিল, তখনো কাতরানির ক্ষীণ আওয়াজ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছিল। তাই দেখে সেপাইরা তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছিল, কিন্তু গলস্টোনের অদৃষ্ট মন্দ। তিনি তাদের সদভিপ্রায় বুঝতে না পেরে চোস্ত ফারসীতে তাদের গাল পাড়তে পাড়তে কোঁতাতে কোঁতাতে তাদের শাসাতে লাগলেন, তারা মনে করেছে কি? ইংরেজরা তাদের সহজে ছেড়ে দিচ্ছে না, শিগ্‌গিরই সবাইকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে ছাড়বে। বেচারা গলস্টোনের জ্যান্তেই কূপ-সমাধি হয়ে গেল। গলস্টোন ভালো ফারসী জানতেন বলে এমিয়ট আর হে নবাবের সঙ্গে কথা চালাবার সুবিধা হবে মনে করে নিজেদের সঙ্গে তাঁকে মুঙ্গেরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমিয়ট চলে যেতে গলস্টোন হে-র সঙ্গে এতদিন মুঙ্গেরেই আটক ছিলেন। তার পর হে-র সঙ্গে একত্রই বন্দী-অবস্থায় পাটনায় আসা, আর একসঙ্গেই দুজনের অনন্তযাত্রা।

তার পর চেহেলসাতুনে যে-কজন ইংরেজ বন্দী ছিল তাদেরও ঐ একই দশা হল। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ জন ইংরেজ পাটনায় ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিল। ডাক্তার ফুলারটনকে আর ধরে রাখা হল না, তিনি ডাচদের কুঠিতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে তাঁকে সেইখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হল। অল্প কয়েক-দিন ডাচদের সঙ্গে বাস করে ফুলারটন একদিন কৌশলে মেজর অ্যাডামসের কাছে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘটনা যা ঘটে গেল সেটা তো

কলকাতার অন্ধকূপহত্যার চেয়ে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যদিচ হলওয়েলেব মতো পাবলিসিটি দেবার কোনো লোক তখন না থাকায় পাটনার হত্যাকাণ্ড লোকসমাজে ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

হাজী আহমদেব পাটনার সে-বাড়ি এখন আর নেই। ঠিক সেই জায়গাতে ইংরেজদের পুরনো গোরস্থান এখনো পড়ে আছে। যে-কুয়োয় এলিসদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল ঠিক তারই উপর ইংরেজরা পরে একটা স্মৃতি-স্তম্ভ বানিয়ে দিয়েছিল। সেটা এখনো পর্যন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

২৮শে অক্টোবর মেজর অ্যাডামস সসৈন্যে পাটনায় পৌঁছলেন। তাব আগেই ইংরেজরা এসে পড়ো-পড়ো দেখে মীর কাশিম পাটনা ছেড়ে কুি মাইল দূরে সরে গিয়েছিলেন। পাটনার কেল্লা খুবই মজবুত, তাকে কাবু করতে মেজর অ্যাডামসকে বেশ-খানিক বেগ পেতে হল। ৬ই নভেম্বরের আগে ইংরেজরা বড একটা-কিছু করে তুলতে পারল না। ঐ দিন কেল্লার দেওয়ালেব খানিক অংশ গোলার ঘায়ে ভেঙে পডায় একটু সুবিধা হয়ে গেল। মেজব আরভিং-এর কর্তৃত্বে একদল পল্টন ঐ ফাঁক দিয়ে কেল্লার ভিতরে ঢুকে পডল। উধুয়ানালার যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে জেম্‌স আরভিং ক্যাপ্টেন থেকে মেজব হয়েছেন। পাটনার যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। খানিকক্ষণ ধরে ইংরেজদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়ে পাটনার কেল্লাদার মহম্মদ আলী দেখলেন আর কিছুই কবা যাচ্ছে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতো তিনি আর অযথা সময় নষ্ট কিম্বা বলক্ষয় না করে মেজর অ্যাডামসের হাতে আত্মসমর্পণ করে ইংরেজদেব পেন্সনভোগীর দলভুক্ত হলেন। তাঁর দেখাদেখি ডেপুটি গভর্নর মীর মেহদী আর অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ইংরেজদের দিকে চলে গেলেন।

মীর কাশিম ভালো করেই বুঝেছিলেন, পাটনার হত্যাকাণ্ডের পরে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁব মিটমাটের আর কোনো রাস্তা রইল না, তিনি আর কখনো তাঁদের ক্ষমা পাবেন না। অবস্থা বুঝে তিনি আগেভাগেই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়ভিক্ষা করে পাঠিয়েছিলেন। রাজবিদূষক মীর্জা শামসুদ্দীন মীর কাশিমের দূত হয়ে নগদ বারো লাখ টাকার ঘুস হাতে কবে ইতিপূর্বেই এলাহাবাদ চলে গেছেন।

পাটনা হাতছাড়া হবার খবর পেতেই মীর কাশিম কর্মনাশা নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন। সমস্ত ধনরত্ন সমেত পরিবারবর্গকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবাব জন্যে রোটাসগডে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে কলকাতার কাউন্সিল এক হুলিয়া বের করে দিয়েছেন—যে-কোনো ব্যক্তি কাশিম আলী খাঁকে ধরে

এনে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে পারবে, সে নগদ এক লাখ টাকার ইনাম তো পাবেই উপরন্তু অন্য অনেক রকমের আনুকূল্যও তার ভাগ্যে জুটতে পারে। আলাদা করে আরো-একটা ইস্তাহার বেরোল—সমরুকে যে ধরে দেবে তারও বকশিশ মিলবে চল্লিশ হাজার সিক্কা টাকা।

কর্মনাশার তীরে উপস্থিত হতে মীর কাশিম নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে এক খত পেলেন। তিনি কাশিম আলী খাঁর সহায় হতে রাজী হয়ে তাকে সত্বর এলাহাবাদ চলে আসতে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। সুজাউদ্দৌলা তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ একখণ্ড কোরানশরিফও পাঠিয়েছেন। তার প্রথম পাতার সাদা কাগজে নিজের হাতে মীর কাশিমকে অভয় দিয়ে তিনি লিখেছেন, সেই দিন থেকে কাশিম আলী নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রতিপাল্য আশ্রিতেরই মধ্যে একজন বলে গণ্য হলেন। চিঠি আর কোরান পেয়ে বিপুল ধনরাশি জিনিসপত্র সাজসরঞ্জাম যানবাহন ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে হৃষ্টচিত্তেই মীর কাশিম চিরকালের মতো কর্মনাশা পার হয়ে গেলেন, তাঁর লীলাক্ষেত্র বাংলা-বিহার তাঁর পিছনে পড়ে রইল। মীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে চলল ক্যাপ্টেন সমরুর কর্তৃত্বে তিরিশ হাজারের এক বিশাল ফৌজ। হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই মানা করলেন—হুজুর যাবেন না, যাবেন না, যাবেন না, কিন্তু মীর কাশিম তা কানে তুললেন না, সোজা এগিয়েই চললেন। ইংরেজরা চারিদিক ছোটাছুটি করে অবশেষে কর্মনাশা পর্যন্ত ধেয়ে গিয়েও মীর কাশিমকে ধরতে পারল না। আর তো এগোবার উপায় নেই, ওপারে যে নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্য। তাঁর সঙ্গে তখনি তখনি ঝগড়া বাধানো কলকাতা কাউন্সিলের একটুও ইচ্ছা নয়।

॥ সাতাশ ॥

১৭৬৪ সাল এসে পড়ল। চার মাস ধরে একনাগাড়ে একটাব-পর-একটা লড়াই করতে করতে মেজর অ্যাডামসেব শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি দেশে ফিবে যাওয়াই স্থির করলেন, নইলে শরীর আব টিকছে না। তাই মেজব নক্‌সের হাতে ইংরেজ ফৌজেব সব ভার তুলে দিয়ে তিনি জাহাজ ধববাব জন্যে কলকাতায় ফিবে গেলেন। সেখানে গিয়ে জাহাজে উঠতে যাবেন এমন সময মাথা ঘুরে পড়লেন। সেই যে পড়লেন আব উঠতে হল না। ১৬ই জানুযারি তিনি কলকাতাতেই মাটি নিলেন। ওদিকে মেজর নক্‌সেরও ঐ একই অবস্থা। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই বর্ষা নেই, দিন নেই বাত নেই, তিনি মার্চ করেছেন তো করেইছেন—ক্ষণে ক্ষণে একটার-পর-একটা যুদ্ধও করে চলেছেন। তিনিও আর পারেন না, তাঁরও শরীর আর বইছে না। ক্যাপ্টেন জেনিংসকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে নক্‌স কলকাতায় রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই অ্যাডামসের মতো তাঁরও শেষশয্যা হল ইংরেজদের পুরনো গোরস্থানে, যেটা আজকালকার সেণ্ট জন্স গির্জেবাড়ির লাগাও কম্পাউণ্ড।

জেনিংস একটিনি জেনারল বলে আর যুদ্ধ চালাতে চাইলেন না, পাছে পাকা কমাণ্ডাব এসে তাঁর কাজের খুঁত বের করতে থাকেন। তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে চুপচাপ একজায়গাতেই বসে রইলেন। কিন্তু কিছু না করে ঐরকম চুপচাপ বসে থাকাটাই হল কাল। সেপাই-পল্টনের হাতে কাজ না থাকলে তারা খইভাজার মতো অকাজ করতে বসে যায়। কিছুদিন অবশ্য আলসেমিতে দিন কাটাতে তাদের মন্দ লাগল না, কিন্তু তার পর ঠায় বসে থাকতে থাকতে তারা একদিন বিদ্রোহই করে বসল। একদিন সকালে জেনিংস প্যারেড গ্রাউণ্ডে পৌঁছে দেখলেন, গোরা পল্টনরা অর্ডার মানতে চাইছে না, ড্রিল করবে না, চেঁচামেচি লাগিয়েছে। তাদের কথা হল, যুদ্ধশেষে নবাব মীর জাফর তাদের যে বকশিশ করবেন বলেছিলেন তা তো তখনো পর্যন্ত হাতে পাওয়া গেল না। ঐ নিয়ে কাউন্সিলের কাছে দরবার করার জন্যে তারা মার্চ করে কলকাতা যাচ্ছে। কিন্তু মীর জাফর টাকা দেবেন কোথা থেকে? তিনি তো মাথার পাগড়িটা পর্যন্ত ইংরেজদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আর

কাউন্সিলররা ? তাঁরা তো কি করে দু-পয়সা নিজেদের পকেটে আসে তারই ধান্দায় দিবারাত্রি ঘুরছেন, সেপাই-পল্টনের সুখদুঃখ বকশিশ-পুরস্কারের কথা নিয়ে কে অত মাথা ঘামায় ?

আরো একটা গোলমেলে ব্যাপার ছিল। ইংরেজ ফৌজের গোরা পল্টনদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ নয়। ফরাসী তো আছেই—দক্ষিণে ইংরেজদের কাছে হেরে গিয়ে তারা দলে দলে ইংরেজ ফৌজে চাকরি নিয়েছে—তাছাড়া জার্মান পর্তুগীজ ডাচও কতক কতক আছে। মীর কাশিমেব চরেরা তাদেব ডবল মাইনেব লোভ দেখিযে ক্রমাগত ফোসলাচ্ছিল, আবাব তারাও তাদের দিক থেকে ইংরেজ পল্টনদের ভিতরে ভিতরে উসকে তুলছিল। যাই হোক, খাস ইংরেজ পল্টনদের জেনিংস একরকম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন, কিন্তু অন্য দু-শো ইওরোপীয়ন রেনী মাদেক বলে এক করিতকর্মা ফরাসীকে তাদের সদাব বানিযে কর্মনাশা পার হয়ে মীর কাশিমেব ফৌজে গিয়ে যোগ দিল। জেনিংস মীর জাফরকে অনেক ধবেকবে আব নিজের অফিসরদেরও কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে খানিক টাকাব জোগাড কবে সেটা সেপাই-পল্টনদেব মধ্যে বেঁটে দিলেন। তারপর সবাই মিলে মেজর কারন্যাকের প্রতীক্ষায বসে রইলেন, অ্যাডামসের জায়গায় তিনিই আবাব ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার হয়েছেন।

ঐ সময় সুবে বাংলার উপর যাঁর লোলুপ দৃষ্টি পডেছিল, তিনি হচ্ছেন অযোধ্যার নবাব, সুজাউদ্দৌলা। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই তিনি ইংরেজদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন। চোখের সামনেই দেখতে পেলেন, তারা কি করে একটু একটু করে কেবল বেড়েই চলেছে। সুবে বাংলা, বিশেষত বিহার-প্রদেশ, নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যের এত গায়ে-গায়ে যে, তিনি যখন দেখলেন মীব কাশিমকে যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজরা তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করে গিয়ে একেবারে কর্মনাশার ওপারেই বসে গেছে তখন তাঁর মনে বেশ-একটু ভয় ঢুকে গেল। তিনি যদিও সেটাকে ঢেকে রাখার খুবই চেষ্টা করছিলেন, তবু পুরোপুরি চাপা দিয়ে উঠতে পারলেন না। কিন্তু তখনি তখনি ইংরেজদের ঘাঁটানোটাও তিনি বুদ্ধির কাজ হবে বলে মনে করলেন না। ইংরেজরাও তাঁর সঙ্গে অযথা গোল পাকাতে আদবেই ইচ্ছুক নয়। হিন্দুস্থানের উজির নবাব সুজাউদ্দৌলা পলিটিক্সের সেই মামুলী খেলাই খেলতে লাগলেন। ইতিপূর্বেও তিনি একবার বেয়েচেয়ে দেখেছিলেন, ইংরেজরা টোপ গেলে কি না। গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরেজরা জিতে গেছে শুনে তিনি তাদের লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, মীর কাশিমের বদলে মীর জাফর আবার

বাংলার মসনদে বসাতে তিনি ভারী খুশি হয়েছেন। মীর জাফর কিম্বা ইংরেজরা যদি তাঁর সাহায্য চান, তাহলে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে বাংলাদেশে যেতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য ইংরেজরা তাতে রাজী হয়নি।

অল্পবুদ্ধি হলেও মীর জাফরও নিজে জানতেন, সুজাউদ্দৌলাকে একবার বঙ্গদেশে ডেকে আনলে তার পর তাঁকে সেখান থেকে বের করা দায় হবে। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা দিল্লির বাদশার উজির, শা আলম তাঁর মুঠোর মধ্যে, সুতরাং তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝগড়াঝাঁটি করা চলে না, খানিকটা তাঁকে হাতে রাখতেই হয়। মীর জাফর আরো জানতেন যে, ইংরেজরা তাঁকে যতই সমাদর করে আবার গদিতে বসাক না কেন বাদশা যদি তাঁকে সুবেদারের সনদ না দেন, তাহলে প্রজারা কেউই তাঁকে নবাব বলে মানবে না। আর উজিরকে ডিঙিয়ে বাদশার কাছ থেকে সরাসরি সনদ আনানো—সে এক অসম্ভব ব্যাপার। মীর জাফর সুজাউদ্দৌলাকে মুখে খুবই তোয়াজ করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে রাজা সিতাব রায়কে মধ্যস্থ মানলেন। সিতাব রায় তখন নবাব সুজাউদ্দৌলার এক বিশ্বস্ত কর্মচারী। অযোধ্যার মুখ্য-মন্ত্রী মহারাজা বেণীবাহাদুর তাঁর প্রাণের বন্ধু। সুজাউদ্দৌলার টাকার লোভ তাঁর রাজ্যলোভের চেয়ে একটুও কম যায় না। সুযোগ পেয়ে তিনি সুবে বাংলার রাজস্ব মীর কাশিম যতটা বাকি ফেলেছিলেন তার সবটা, সনদ দেবার বাদশাহী ফী, আর সেই সঙ্গে উজিরেরও দস্তুরি—সবই মীর জাফরের কাছ থেকে নগদ নগদ চেয়ে বসলেন।

মীর জাফর জানালেন, নগদ টাকা দেশে যা-কিছু ছিল মীর কাশিম তা সবই চেঁচেপুঁছে সাফ করে নিয়ে গেছেন, দেবার মতো কিছুই রেখে যাননি। তখন সুজাউদ্দৌলা ছলনা ছেড়ে খোলাখুলিই জানিয়ে দিলেন, নগদ টাকার যদি অতই টানাটানি, তাহলে তার বদলে বিহার-প্রদেশটা উজিরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ঐ প্রদেশের উপর তাঁর অনেক দিনের ট্যাঁক। একবার সেখানে কায়েম হয়ে বসতে পারলে হয়, তার পর তিনি দেখে নেবেন, কোথায় থাকেন মীর জাফর আর কোথায়-বা থাকে তাঁর মুরুব্বি—ঐ ইংরেজ আড়তদাররা। নিরুপায় হয়ে মীর জাফর সিতাব রায়ের কাছে কাঁদাকাটা করে লিখলেন, এখন তাঁর হাতে টাকা নেই, আর বিহার তিনি সুজাউদ্দৌলাকে ছেড়ে দেন কি করে? ওটা গেলে কি আর থাকে তাঁর? কি নিয়ে তিনি নবাবী করবেন? সিতাব রায় যেন দয়া করে তার একটা বিহিত করেন। সিতাব রায় জানালেন, একদিকে লাখো-লাখো টাকা, আর অন্যদিকে শুধু ফাঁকা কথা—

তাতে কাজ উদ্ধাব হয় কি কবে? ,এর আগেই মীব কাশিমেব দালাল মীরজা শামসুদ্দীন এলাহাবাদে হাজিব হয়ে গেছেন। তাঁব হাতে টাকাব ছড়াছড়ি।

শামসুদ্দীন নবাব-বাহাদুবেব শ্যালক সালাবজঙ্গকে মুরুব্বি পাকড়েছিলেন। প্রচুব টাকা ঢেলে তাঁকে বশ কবে তাঁবই মাবফত সুজাউদ্দৌলাব মন গলাবাব চেষ্টা কবছিলেন। উজিব-সাহেব ভাবলেন, এ একবকম ভালোই হল। শ্বশুব জামাইযেব একজনকে আব একজনেব পিছনে লাগিয়ে বেখে দিতে পাবলে৷ ছোঁ-মাবার সুবিধা তাঁবই, তখন নিলামেব মতো ক্ষণেক্ষণে তিনি দব চডিযে যেতে পাববেন। হালে পানি না পেযে সিতাব বায় শেষে বেণীবাহাদুবকে ধবে পডলেন। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয মীবজ্বা শামসুদ্দীনেব তাবে ছেডে তাঁব প্রতিদ্বন্দ্বী সালাবজঙ্গকে ধবাটাকে আদবেই ভালো চোখে দেখছিলেন না। তাছাডা মীব জাফব আব ইংবেজদেব সঙ্গে তাঁব ভাব বেখে চলাবই ইচ্ছা। তাঁব ধাবণা তাতে সুজাউদ্দৌলাবও মঙ্গল। তিনি সিতাব বায়কে মন্ত্রণা দিয়ে কার্যোদ্ধাবেব এক উপায় বাতলিযে দিলেন। সিতাব বায় তাঁব দেওযান সাধুবামকে সমস্ত অবস্থাটা ভালো কবে বুঝিয়ে পডিয়ে তাঁকে তখনি বঙ্গদেশে বওনা কবিযে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

ওদিকে শামসুদ্দীনও সুজাউদ্দৌলাব দেওয়া আশ্বাসবাণী নিয়ে মীর কাশিমকে আনতে চলে গেলেন কর্মনাশা পেরিয়ে বিবাট এব লটবহর সঙ্গে কবে মীব কাশিম যখন এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছলেন সুজাউদ্দৌলা তখন সেইখানেই বাস কবছিলেন। মুসলমানী আদবকায়দা-অনুসাবে তাঁবই প্রথম শবণার্থীব সঙ্গে দেখা কবতে যাওয়াব কথা। সুজাউদ্দৌলা কেল্লা থেকে বেরিয়ে মীব কাশিমেব ক্যাম্পে চললেন। মীব কাশিম যুদ্ধে তেমন-কিছু না হলেও ডিপ লোম্যাসীতে ধুবন্ধর। তিনি বেশ জানতেন, বাইবেব ভডং ভিতরে-ভিতরে কতখানি না কাজ কবে। পহলে দর্শনধাবী তাবেই তো পিছে গুণ বিচারি? মীব কাশিম তাঁর ক্যাম্পের চাবধাব সাফ কবিয়ে সব মেজেঘসে তকতকে কবে তুললেন। সামনেব জমিতে সরু-সরু রুপোব থাম গেডে তাতেই লটকিয়ে মস্ত বড এক জবিদাব পাল টাঙানো হল। ক্যাম্পে ঢোকাব মুখে প্রায় পাঁচশো গজ পথ লাল শালু দিয়ে মুডিয়ে দিলেন। রাস্তার দুধারে বন্দুক-ধারী লালমুখো ইওরোপীয়ন পল্টন দাঁড কবিয়ে দেওয়া হল। তাবই এপাশে-ওপাশে ইংরেজদের সেপাইদেব মতো একই বকমের সাজে সাজা মীর কাশিমের সেপাইয়ের দল। চাঁদোয়ার নীচে দামী পারশিয়ান কার্পেট বিছানো। একধাবে রুপোব মসনদ, তার উপর মখমলেব বিছানা আর সাটিনের

তাকিয়া। মসনদের দুধারে মীর কাশিমের পারিষদবর্গ দরবারী পোশাকে সেজেগুজে, কানে আতরের তুলো গুঁজে, গলায় মুক্তোর মালা দুলিয়ে, কোমরে দামী-দামী পাথর বসানো তলোয়ার ঝুলিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত জায়গাটা ধুনো গুগগুল লবাণের সুগন্ধে ভরপুর। চারদিকে আতরগোলাপে ছয়লাপ।

সুজাউদ্দৌলা আসতে মীর কাশিম এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে মসনদে বসালেন। ঠিক সামনেই রাখা আছে একুশটা খুঞ্চেভতি মণিমাণিক্য আর কতরকমের দামী-দামী দুষ্প্রাপ্য উপহার-দ্রব্য। একটু দূরে ছ-টা হাতি আর চোদ্দটা আরবী ঘোড়া বাঁধা রয়েছে, সেগুলোও তত্ত্বের সঙ্গে যাবে। তার উপর নজরআনার দরুন একথালা সোনার মোহরও সামনে ধরা আছে। জিনিসপত্রের উপর আড়চোখে একবার প্রসন্নদৃষ্টি বুলিয়ে সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের হাত ধরে টেনে এনে তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে প্রচুর মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সব দেখেশুনে বেশ-একটু মুগ্ধ হয়েই সুজাউদ্দৌলা অবশেষে তাঁর কেল্লায় ফিরে গেলেন। এর আগে তিনি গোরা পল্টন কখনো চোখে দেখেননি। অমন ফিটফাট হয়ে সাজাগোজা দেশী সেপাইও ইতিপূর্বে তাঁর নজরে পড়েনি। একসঙ্গে অতগুলো সেপাই-পল্টনকে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বন্দুকহাতে স্থির হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক বনে গেলেন। সুজাউদ্দৌলা এক ভেবে এসেছিলেন, আর-এক ভেবে ফিরে চললেন। মীর কাশিমের কাজ হাসিল। সবাই দেখল, নবাব-উজির সুজাউদ্দৌলা বাহাদুর তাঁর দিকেই ঢলেছেন।

মীর কাশিমের ইচ্ছা ছিল সুজাউদ্দৌলা যেন ইংরেজদের দম নিতে না দিয়ে তখনি-তখনি তাদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার হাতে তখন একটা খুব জরুরি কাজ ছিল, সেটা শেষ না করে তিনি কোথাও নড়তে চাইলেন না। বুঁদেলা-রাজ হিন্দুপতি অযোধ্যার নবাবদেরই সামন্ত-প্রজা, তাঁদেরই তাঁবের এক মস্ত বড় জমিদার। তিনি আবার বিদ্রোহী হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছেন, এদিকে ওদিকে লুঠপাঠ করে বেশ উৎপাতও লাগিয়ে দিয়েছেন। ঐ নিয়ে তাঁর বার বার তিনবার হল। সুতরাং তখনি তাঁকে কড়কে না দিলেই নয়। মীর কাশিম দেখলেন, দৈবক্রমে তাঁর সামনে এক সুযোগ উপস্থিত। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, সে আর এমন কি কথা হল? নবাব-উজির হুকুম করলে তিনি নিজে তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে হিন্দুপতিকে তখনি শায়েস্তা করে দিয়ে আসতে পারেন, নবাব-সাহেবকে

কোথাও এক-পা নড়তে হবে না। খরচও তাঁর এক পয়সা লাগবে না, লড়াইয়ের সব ব্যয় অধীন কাশিম*আলীর। সুজাউদ্দৌলা একগাল হেসে মীর কাশিমের প্রস্তাবে তখনি রাজী হয়ে গেলেন।

মীর কাশিমের সেপাই-পল্টনদের ইংরেজরা ততটা ভয় না পেলেও দেশী রাজা-রাজড়ারা তো তাদের চেহারা দেখলেই মূর্ছা যান। তার উপর মীরজা নজফ্ খাঁ তখন বুঁদেলা-রাজের সেনাধ্যক্ষের চাকরি নিয়েছেন। তিনি রাজার কাছে মীর কাশিমের সৈন্যদের সংখ্যা আর তাদের দাপটের চোট এমনি বাড়িয়ে বললেন যে হিন্দুপতি লড়াইয়ের কথা মন থেকে দূর করে ফেলে নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়ে দেবার জন্যে নজফ্ খাঁকেই ধরে পড়লেন। নবাবের বশ্যতা স্বীকার করে পুরনো খাজনা বাবদ খানিক টাকা নগদ বের করে দিয়ে, বাকি খাজনার জন্যে মেয়াদী হুণ্ডি লিখে দিয়ে বুঁদেলরাজ তবে সে-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলেন।

সব মিটিয়ে এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে মীর কাশিম যা শুনলেন তাতে তাঁর আনন্দে নেচে উঠতে একটুও মন গেল না। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সিতাব রায় ইতিমধ্যেই নবাব-উজিরের মারফত মীর জাফরের নামে বাংলার সুবাদারির বাদশাহী পরোয়ানা বের করিয়ে নিয়েছেন। মীর জাফর বাদশাকে রাজস্ব বাবদ ফি সাল আটাশ লাখ টাকা দেবার কড়ারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সিতাব রায়ের দেওয়ান সাধুরাম বাদশার পেশকাশ বাবদ মীর জাফরের কাছ থেকে যে পাঁচ লাখ টাকার হুণ্ডি এনেছিলেন, উজির-বাহাদুর সেটাকে তাঁর নিজেরই দস্তুরি বলে পকেটে পুরলেন। সিতাব রায়ের ছেলে কল্যাণসিং হুণ্ডির টাকা নগদানগদি বুঝিয়ে দিয়ে বাদশাহী সনদ মাথা পেতে নিয়ে মীর জাফরের কাছে সেটা পৌঁছে দিতে গেলেন। সুখবর আনার দরুন সেখানে তাঁরও পঞ্চাশ হাজার টাকা বকশিশ মিলল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যাঁর সহায় তাঁর কি আর কার্যোদ্ধারের ভাবনা? আর স্বয়ং বাদশা-বাহাদুর যখন মীর কাশিমকে দু-চোখে দেখতে পারেন না তখন মীর জাফরকে মারে কে? সনদ পেয়ে আনন্দের চোটে মীর জাফর সিতাব রায়কে জিন্দগিভোর বিহারের নায়েব-নাজিমগিরি করার হুকুমনামা পাঠিয়ে দিলেন।

ব্যাপার দেখে মীর কাশিম মুখ চুন করে মাথার পাগড়ি খুলে সুজাউদ্দৌলার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে ফোঁপাতে লাগলেন। তাহলে নবাব-উজির কি আশ্রিতকে ত্যাগই করলেন? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের পাগড়ি তুলে নিয়ে, সেটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়ে, সব দোষটা

বাদশা শা আলমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। বললেন, বাদশা স্বয়ং যখন মীর জাফরকেই সুবাদারি দিতে ইচ্ছুক' তখন উজির আর কি করবেন? কথাটা পুরো না হলেও খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু নগদ পাঁচ লাখ দস্তুরির কথাটা সুজাউদ্দৌলা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না, একদম চেপে গেলেন। মীর কাশিমকে আশ্বাস দিলেন, সুজাউদ্দৌলা একবার যাঁকে আশ্রিত বলে গ্রহণ কবেন তাকে কখনোই আর পরিত্যাগ করেন না।

আসলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম—সুজাউদ্দৌলা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, নামে নবাব-সুবাদাব হলে কি হয় ফাঁসি দেবার ভয় দেখালেও মীর জাফরের কাছ থেকে আর একটা কানাকড়িও আদায় হবে না। ইংরেজরা তাঁকে দোহন করতে করতে তাঁকে একেবারে ফোঁপরা করে ছেড়েছে। তাতেও তারা খুশি নয়। সর্বদাই ওত পেতে বসে আছে, কোথা থেকে কখন নবাবের হাতে টাকা আসে তাহলে তখনি তাতে একটা ভাগ বসাবে। মীর জাফরের নিজের ইচ্ছা থাকলেও ইংরেজরা তাঁকে কদাচ একটি পয়সাও আর কাউকে দিতে দেবে না। আর টাকার বদলে জায়গা দেওয়া? সেটা যে কত বড একটা দুরূহ ব্যাপার তা তো মীর জাফরের চিঠি থেকে বেশ ভালো করেই বোঝা গেছে। মীর কাশিম নিজেও আর কিছু তখনি জায়গা দিতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর তিনশো হাতি-বোঝাই সোনাদানা মণিমুক্তো মোহর-টাকা আছে, যার দাম কমসে কম দশ ক্রোড টাকা। আপাতত সেসব হাতে এসে গেলেও তো কিছুদিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারা যায়. থাক-না পড়ে জায়গা-জমি, সে-সব পরে দেখা যাবে।

সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের সঙ্গে একটা রফা করে ফেললেন। মীর কাশিম যদি যুদ্ধের সমস্ত খরচ বইতে রাজী থাকেন তাহলে সুজাউদ্দৌলা তাঁর হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লডাই করতে প্রস্তুত আছেন। মীর কাশিম দুদিন পুর্বে যাঁকে নিজের পারিষদদের কাছে শঠ ঠগ ইত্যাদি বলে গাল দিয়েছিলেন, যাঁর ভাঁওতা দিয়ে লোকঠকানোর অভ্যাস তাঁর একটুও অজানা ছিল না—ভাগ্যবিপর্যয়ে বুদ্ধি হারিয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই মীর কাশিম সেই লোকেরই হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসলেন। আর না করে উপায়ও ছিল না। তখন কি হিন্দুস্থান আর কি দাক্ষিণাত্য কোথাও এমন একজনও ছিলেন না যাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁকে ঐ অচল অবস্থা থেকে টেনে তুলে তাঁর পায়ের উপব দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। মীর কাশিম তখনি স্বীকার হয়ে গেলেন, যেদিন থেকে তিনি কর্মনাশা পেরিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে

পা ফেলেছেন সেইদিন থেকে যতদিন না পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই খতম হচ্ছে ততদিন তিনি সমানে যুদ্ধের খরচ বাবদ নবাব-উজিরকে মাস মাস এগারো লক্ষ করে টাকা জোগান দিয়ে যাবেন। যুদ্ধশেষে যখন তিনি আবার বাংলার নবাব হবেন তখন বিহারপ্রদেশও উজির-বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে কেবল খাস বাংলাদেশটুকু নিয়েই তিনি খুশি থাকবেন। মীর কাশিম তখন জ্যোতিষগণনা করিয়ে জেনে নিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই আবার বাংলার মসনদে বসবেন, সুতরাং শুধু কথায় দরাজহস্ত হতে হানি কি?

সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন শুনে শা আলম আর বেণীবাহাদুর তাঁকে পইপই করে মানা করতে লাগলেন, তিনি যেন কখনো ঐসব ব্যাপারে মাথা না গলান, কিন্তু একবগ্‌গা লোকদের সদুপদেশ দিয়ে কেউ কি কখনো কোনো কাজ থেকে নিরস্ত করতে পেরেছে? তাছাড়া সুজাউদ্দৌলার প্রকৃতিই এমনভাবে গড়া যে, কোনো-একটা গোলমেলে ব্যাপার দেখলেই সাততাড়াতাড়ি লাফিয়ে গিয়ে তাতে তাঁর হাত লাগানো চাই-ই চাই, নইলে তাঁর খানা হজম হয় না। সুতরাং লড়াই একটা শেষ পর্যন্ত বেধেই গেল।

মার্চ মাসের গোড়াতেই মেজর জন্ কারন্যাক আবার ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার হয়ে বিহারে গেলেন। ক্লাইভের সাগরেদ হলেও কারন্যাক সাহসে তাঁর নখেরও যুগ্যি ছিলেন না। কারন্যাকের মতো ফুলবাবু তখনকার দিনের ইংরেজ জেনারলদের মধ্যে আর একজনও ছিলেন না। সেইজন্যেই যুদ্ধকালে তিনি নিজের থেকে উদ্যোগ-উৎসাহ করে যে কিছু করে তুলবেন, তা তাঁর ধাতে ছিল না। লড়াই বাধলে কি করে যে প্রাণ বাঁচাবেন, তাই নিয়ে তাঁর যত ভাবনা। সব সময়েই তিনি পিছনে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই বড় কোনো যুদ্ধই তিনি কখনো জিততে পারেননি। কালক্রমে তাঁর সাবধানী স্বভাব প্রায় কাপুরুষতারই সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল পরবর্তীকালের দক্ষিণের এক বড় যুদ্ধে। আশ্চর্য এই যে, ক্লাইভের পেয়ারের সবকটা ব্যক্তিই কি ইতরবিশেষ অপদার্থ ছিলেন? আশেপাশে কাজের লোক থাকলে তাঁদের তুলনায় ক্লাইভ নিজে একটু খাটো হয়ে পড়তে পারেন, সেই ভয়েই কি তিনি যতসব অকেজো লোককে নিজের চারপাশে জড়ো করতেন? পলিটিক্স করাতে কারন্যাকের আমোদ লড়াই করার চেয়ে ঢের বেশি। তার উপর টাকার উপরও তাঁর বেজায় লোভ। কি করে যে দাঁও মেরে দু-পয়সা ঘরে তুলতে পারবেন তারই চিন্তায় তিনি

সর্বদা বিভোর। সুতরাং তেড়েফুঁড়ে গিয়ে লড়াই করবার অবকাশই বা তাঁর কোথায় ?

কলকাতার কাউন্সিল কারন্যাককে স্পষ্ট করেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন বিহারে পা দিয়েই কর্মনাশা পেবিয়ে সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে ঢুকে সেইখানেই লডাই লাগিয়ে দেন। কিন্তু কারন্যাক কিছুতেই তা করলেন না। খানিক এদিক-ওদিক ঘুরেঘারে এসে তিনি নানা অছিলা করে পাটনায় কেল্লার ঠিক সামনেই তাঁব আস্তানা গাডলেন। মেজর-সাহেবের হাতে ছ-হাজার লডিযে জোয়ান ছিল। তার ঢের কম লোক নিয়ে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন, মেজব অ্যাডামসও পর পব ছোট-বড সাত-সাতটা লডাই কবে জিতে বেরিয়ে গিযেছিলেন। ঐ তুই কমাণ্ডাবেরই পলিসি ছিল, একেবাবে গোডা থেকেই শত্রুপক্ষেব উপব বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পডে জোব আক্রমণ চালানো। মেজর কারন্যাকের পলিসি ঠিক তার উল্‌টো। তাঁর চেষ্টা, কোনো-একটা নিরাপদ স্থানে মাথা গুঁজে বসে থেকে আত্মরক্ষা করা। আত্মরক্ষার পক্ষে অবশ্য পাটনা জায়গাটা কিছু মন্দ নয়, ভালোই। তাছাড়া মীর জাফরও তাঁব বারো-হাজারী ফৌজ নিয়ে ঐখানেই গিযে চেপে বসেছেন।

নবাব সুজাউদ্দৌলা কাশীর কাছে গঙ্গা পেরিয়ে যুদ্ধ দিতে এপাবে এলেন। তাঁর সঙ্গে চল্লিশ হাজাব যোদ্ধা, আরো চল্লিশ হাজার লোকলস্কর তল্পিদাব— সে এক ইলাহী কারখানা। শা আলমের যুদ্ধে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উজিব তাকে নিজের রাজ্যে একা ফেলে রেখে যেতে সাহস পেলেন না, বাদশাকে ঘিরে কখন যে কে কি অঘটন ঘটিয়ে তোলে, তা কে জানে ? সুজাউদ্দৌলা শা আলমকে বগলদাবা কবে নিয়ে চললেন। মীর কাশিম আব তাঁর দল তো সঙ্গে আছেনই। সবাইকে নিয়ে সুজাউদ্দৌলা কর্মনাশা পেরিযে বিহারে পডলেন। তিনি যে যে পথ দিয়ে গেলেন, সে-সব জায়গায় রসদ সংগ্রহের জন্যে প্রজাদের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার লাগিয়ে দিলেন যে, গোলাম হোসেন তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ঐ কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে তিনি মনে মনে ইংরেজদের জয় কামনা করতে লেগে গেলেন, কেননা তারা আর যাই করুক না কেন, লোকদের ওরকম দগ্ধে দগ্ধে মারে না।

সুজাউদ্দৌলা এবার প্রথমটায় হিন্দুস্থানী যুদ্ধের পুরনো ধারা বদলে দক্ষিণী চাল ধরলেন। হিন্দুস্থানে বরাবরই সামনাসামনি একটা প্রচণ্ড যুদ্ধেই হারজিত যা-কিছু সাব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধে ইংরেজদের হারানো শক্ত হবে

মনে করে সুজাউদ্দৌলা স্থির করলেন মারাঠাদের মতো তিনিও গেরিলাযুদ্ধ করে দেখবেন, তাতে করে ইংরেজদের কাবু করে ফেলতে পারেন কি না। পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে পরপর অনেকগুলো লড়াই জিতে যাওয়াতে চারদিকে ইংরেজদের গায়ের জোরের বেশ-একটু নাম বেরিয়ে গিয়েছিল। দেশী সর্দাররা তাদের সত্যি একটু ভয় করেই চলতে আরম্ভ করেছেন। সুজাউদ্দৌলার ঐ নতুন কায়দার লড়াই সম্বন্ধে তাঁর ক্যাপ্টেনদের কেউ কেউ একটু অনুযোগ করতে গেলে তিনি ধমকে উঠে বললেন, তিনি আহমদ শা আবদালীর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন, তাকে যুদ্ধের ভালোমন্দ শেখাবে ঐ ছেলে-ছোকরার দল? তিনি তাদের কথা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিলেন। পাটনার কাছে ফুলওয়াড়ি বলে এক জায়গায় বসে বসে তিনি গেরিলাযুদ্ধই চালাতে লাগলেন। কিন্তু ইংরেজদের গায়ে একফোঁটা আঁচড়ও কাটতে পারলেন না, বরং তিনি নিজেই একদিন ইংরেজদের হাতে ধরা পড়তে-পড়তে রগ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু এ-রকম করে বেশিদিন আর চলল না। একটা বড় যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত ইংরেজদেরকে দিতেই হল, নইলে লড়াই আর খতম হয় না। সুজাউদ্দৌলা তার দলবল সব ফুলওয়াড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আস্তানার ঠিক মুখোমুখিই তাদের সাজিয়ে ফেললেন। ফৌজের মাঝখানে রইলেন সুজাউদ্দৌলা নিজে আর তাঁকে ঘিরে রইল তার পয়লা নম্বরের ঘোড়সওয়ারী ফৌজ। তাঁর একপাশে পাঠান যোদ্ধা এনায়েৎ খাঁ আর তাঁর বাছাবাছা সেপাইয়ের দল, আর এক-পাশে গোঁসাই হিম্মত-বাহাদুর আর তার তাঁবের গিরিসম্প্রদায়ের যত রাজ্যের নাগা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা আগা-পাস্তলা উলঙ্গ। তাদের এলো জটা মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। সর্বাঙ্গে ছাইমাখা, মাঝে-মাঝে উল্কির মতো নানা রঙের ছোপ। উজির-সাহেবের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছেন তাঁর মন্ত্রী, মহারাজা বেণীবাহাদুর, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কাশীরাজ, বলবন্তসিং। তাঁদের ঠিক পাশেই সমরু আর মীর কাশিমের সেপাই-পল্টন। মীর কাশিম নিজে কিন্তু তাদের পিছনে, অনেকখানি তফাতে। সবার শেষে আছেন বাদশা শা আলম।

ইংরেজদের একদল গোলন্দাজ তাদের ঐ সুড়ঙ্গ ছাড়িয়ে পাটনা কেল্লার গায়েই একটা উঁচু টিবির মতো জায়গার উপর কামান পেতে বসেছে। টিবির নামটা বেশ জমকালো—পাঁচপাহাড়ি—আরশোলা যেমন পাখি আর-কি। কতক কামান পাটনা কেল্লার পাঁচিলের উপরও চড়ানো হয়েছে। বাকি

সৈন্যরা কেল্লার সামনের সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দুক উঁচিয়ে সারবন্দী হয়ে বসে গেছে। সবার পিছনে আছেন মেজর জন্ কারন্যাক।

অত তোড়জোড় সত্ত্বেও পাঁচপাহাড়ির যুদ্ধ (৩রা মে ১৭৬৪) সুজাউদ্দৌলা জিততে পারলেন না। তিনি নিজে লড়লেন বটে একটা সাজোয়ান মরদ যেমন লড়ে। পায়ে বেশ একচোট ঘা খেয়েও লড়াই ছাড়েননি, তেষ্টায় ছাতি ফাটো-ফাটো তবুও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাননি—সমানে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু করবেন কি? এক এনায়েত খাঁ আর তাঁর পাঠানরা আর ঐ ন্যাংটা সন্ন্যাসীর দল ছাড়া, যুদ্ধকালে আর-কেউ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়নি। মীর কাশিম, বেণীবাহাদুর, বলবন্তসিং, শা আলম, কেউই একহাতও লড়লেন না, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশাই দেখে গেলেন। ওদিকে ইংরেজরা সুড়ঙ্গের গর্তে বসে ডিফেন্সিভ অ্যাক্শন চালিয়ে জিতল না বটে, কিন্তু হারলও না। সেপাই-পল্টনদের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়ে শত্রুধ্বংস করার জন্যে হাত নিশপিশ করছিল, কিন্তু মেজর কারন্যাক তাদের কিছুতেই বাইরে বেরোতে দিলেন না।

পাঁচপাহাড়ির যুদ্ধের পরও প্রায় দিন কুড়ি ধরে সুজাউদ্দৌলা পাটনা ফোর্টের আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ালেন। ইংরেজরা সেইরকম ঘেরাও অবস্থাতেই দিন কাটাতে লাগল। কলকাতা কাউন্সিল বারবার মেজর কারন্যাককে সুজাউদ্দৌলার পিছনে তাড়া করে যেতে বলেও কোনো ফল পেলেন না, কাউন্সিলরদের দিকদারি ধরে যাওয়ায় তাঁরা মেজর কারন্যাককে হটিয়ে অন্য কাউকে কমাণ্ডারের পদে বসাবার চেষ্টায় মন দিলেন। কারন্যাক পাটনায় বসে বসে শুধু একটা আপসের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। সুজাউদ্দৌলাও ঐ সুযোগে মীর জাফরকে গোপনে চিঠি লিখে ভজাতে লাগলেন, তিনি ইংরেজদের ছেড়ে উজিরের দিকে চলে গেলে তাঁর ভালো বই মন্দ কিছু হবে না। ইংরেজরা তো তাঁকে গাধা বানিযে রেখেছে, সুজাউদ্দৌলা তাঁকে রাজার হালে রাখবেন। মীর জাফর কিন্তু সুজাউদ্দৌলার কথায় ভুললেন না। ইংরেজদের সঙ্গেও সুজাউদ্দৌলার একটা-কিছু বোঝাপড়া হয়ে উঠল না। তিনি বারবার একই কথা বলতে লাগলেন—বিহার-প্রদেশটা তাঁর চাই-ই চাই, ওটা না হলে তাঁর কিছুতেই চলবে না। ইংরেজরাও বড় কম যায় না। তাদেরও মুখে সেই এক কথা—আগে মীর কাশিমকে আর সমরুকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তার পর অন্য আলাপ-আলোচনা। কথায় কথায় অনেক দিন কেটে গেল, কিন্তু কাজ একচুলও এগোলো না।

॥ আটাশ ॥

এততেও কিন্তু সুজাউদ্দৌলা নিরুৎসাহ হয়ে ভেঙে পড়লেন না। তিনি শিগ্‌গিরই ইংরেজদের আবার একহাতে দেখে নেওয়ার দৃঢ়সংকল্প করে ফেললেন। কিন্তু সামনেই বর্ষা। বাদলার চার মাস তো আর কিছুই করা যেতে পারবে না, তাই সুজাউদ্দৌলা স্থির করলেন, একেবারে সেই শরৎকালেই তিনি আবার বিজয়যাত্রায় বেরোবেন। সেই মনে করে তিনি উত্তরপ্রদেশে তাঁর রাজধানী ফৈজাবাদে আর ফিরে গেলেন না, দলবল নিয়ে বিহার-প্রদেশেই রয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষার সময় ফাঁকা মাঠে ক্যাম্পে পড়ে থাকা তো তেমন সুবিধার ব্যাপার নয়, তাই কোনো-একটা কেল্লা-টেল্লায় আশ্রয় নেওয়ার দরকার। বক্‌সারে এক অতি উত্তম দুর্গ তো পড়েই আছে, তার ভিতর বসে বেশ আরামেই বর্ষা-যাপন করা চলবে। সুজাউদ্দৌলা ফুলওয়াড়ি থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে নিয়ে বক্‌সারের দিকে চললেন।

ইতিমধ্যে কলকাতার কাউন্সিল বিলেত থেকে এক ডেসপ্যাচ পেলেন, কোম্পানীর ডিরেক্টররা মেজর কারন্যাককে তাঁর কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। তিনি পদে-পদে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের বিরুদ্ধে লেগে তাঁকে যে কিভাবে অপদস্থ করেছেন, সেটা তাঁদের কাছে আর চাপা ছিল না। কাউন্সিলের কনসালটেশনের মিনিটস পড়ে আগাগোড়া সবই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরে এ-হেন লোককে তাঁরা আর একদণ্ডও তাঁদের কাজে বহাল রাখতে চাইলেন না। ডিরেক্টরদের ডেস্‌প্যাচ পেতে কাউন্সিলরদেরও খুব সুবিধা হয়ে গেল। তাঁরা বেশ-কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন, মেজর কারন্যাককে কি করে সরানো যায়। তিনি তো পারতপক্ষে কাউন্সিলের কোনো নির্দেশই মানবেন না। তাঁরা তাড়াতাড়ি ডিরেক্টরদের হুকুম মেজর কারন্যাকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, তাঁকে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে আসতে বলে পাঠালেন। কারন্যাক মেজর আলেক্‌জাণ্ডার চ্যাম্পিয়নের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন।

এর দুদিন আগেই মীর জাফরও পাটনা ছেড়ে গেছেন। ইংরেজদের কোনো কথা না জানিয়ে বাদশা আর তাঁর উজিরের সঙ্গে মীর জাফরের কথা

চালাচালি করাটা কলকাতার কাউন্সিল তেমন সুবিধার ব্যাপার বলে মনে করছিলেন না। কিন্তু পছন্দ না হলেও জোর করে কিছু বলতেও পারছিলেন না, কারণ কারন্যাকের তাতে খানিক সায় ছিল। এইবার গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট মীর জাফরকে আর একটুও দেরি না করে তখনি তখনি কলকাতায় চলে আসতে লিখলেন। কারন্যাককেও জানানো হল, তিনি যেরকম করে পারেন ঠেলেঠুলেও যেন নবাব মীর জাফরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু জোরজবরদস্তি কিছুই করতে হল না, নিতান্ত সুবোধ বালকের মতোই বখেড়া আর না বাড়িয়েই মীর জাফর দেওয়ান নন্দকুমার রায়কে সঙ্গে নিয়ে পাটনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মাঝপথে মুর্শিদাবাদে নেবে খানিক জিরিয়ে নিয়ে তিনি কলকাতায় এসে দেখা দিলেন। তাঁকে সশরীরে উপস্থিত হতে দেখে কাউন্সিলররা খানিকটা ধাতস্থ হলেন।

মেজর কারন্যাকের বদলে যিনি এবার ইংরেজ ফৌজের কমাণ্ডার হলেন তাঁর নাম হেক্টর মান্‌রো। মান্‌রো আসলে কোম্পানীর চাকুরে নন। ব্রিটিশ রাজসৈন্যের এক উঁচুদরের অফিসর। বোম্বাইতে তাঁর রেজিমেণ্ট কাজ শেষ করে কদিন হল দেশে ফিরে গেছে। বাকি দুচারজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জাহাজ ধরবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় কলকাতা কাউন্সিল থেকে তাঁর ডাক এল—বঙ্গদেশের ইংরেজদের আপনি দয়া করে রক্ষা করুন। স্বজাতির ঐ কাতর ডাক মান্‌রো অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। স্বদেশযাত্রা স্থগিত রেখে তিনি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে শ-খানেক গোরা পল্টন যোগাড় করে, তাদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। তখনকার দিনে যেসব রাজসৈন্যকে কাজের জন্যে ভারতবর্ষে পাঠানো হত তারা ইচ্ছে করলে চাকরি বদল করে কোম্পানির ফৌজে ভর্তি হয়ে যেতে পারত, পরে আবার ইচ্ছে হলে পুর্বপদেও ফিরে যেতে পারত। মেজর মান্‌রো দিনকতক কলকাতায় থেকে কাউন্সিলরদের আর মেজর কারন্যাকের কাছ থেকে ব্যাপারটা কতক বুঝে নিয়ে, নবাব মীর জাফরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ভদ্রতার সেলাম ঠুকে, সোজা পাটনায় চলে গেলেন।

কাউন্সিলররা কৌশলে মীর জাফরকে কলকাতাতেই ধরে রাখলেন। কিন্তু নবাবের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ। একে বার্ধক্যের ভার, তায় রোগে-রোগে শরীর জরাজীর্ণ। তার উপর উঠতে-বসতে ইংরেজরা কেবলই হুংকার ছাড়ছে—ধনং দেহি, ধনং দেহি—রুপি লেয়াও, রুপি লেয়াও—এক মুহূর্তও তাদের বিরাম নেই। ইংরেজদের খাঁকতি যতই বাড়তে থাকে টাকার জন্যে তারা মীর জাফরকে

ততই বেশি খোঁচাখুঁচি করে। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে, সেটা তো কেউ বলে দেয় না। তাদের মুখে আর-কোনো কথা নেই, আছে শুধু এক বুলি— টাকা কোথায়? টাকা কোথায়? মেজর কারন্যাক পাটনা থাকতেই শুরু করে দিয়েছিলেন—মীর কাশিম দেশ থেকে মাশুল তুলে দিয়ে ইংরেজদের যে ক্ষতি করে গিয়েছেন তার জন্যে মীর জাফরকে কুড়ি লাখ টাকা খেসারত দিতে হবে। ঐ অঙ্কটাই গোড়ায় ছিল দশ লাখ যখন দ্বিতীয়বার ইংরেজরা মীর জাফরকে নবাবী গদিতে বসায়। তখন তারা ঐ টাকাটাই দাবি করেছিল, কিন্তু মীর জাফর ঐ বাবদ এক পয়সাও দিতে রাজী হননি। কলকাতায় পা দিতে-না-দিতেই সেইটেরই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল চল্লিশ লাখে। ধাক্কার চোটে মীর জাফর বিছানা নিলেন। এবার বড় বিষম রোগ—তাঁর শরীরে কুষ্ঠব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

মেজর মান্‌রো পাটনায় পৌছেই দেখতে পেলেন, ফৌজেব মধ্যে বেশ-একটু ইনডিসিপ্লিনের ভাব। অফিসরদের পক্ষে সেপাই-পল্টনদের অর্ডার মানানো ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। প্রায় বিদ্রোহ উপস্থিত। তবে বিরুদ্ধাচরণ গোরা পল্টনরা ততটা করছে না যতটা করছে দেশী সেপাইরা। তারা তো মোটেই শাসন মানতে চায় না। মান্‌রো জানতেন ডিসিপ্লিনই হচ্ছে ইংরেজ ফৌজের প্রধান সহায়। শুধু ওরই জোরে তারা সর্বত্র জয়ী। ওর অভাব ঘটলে তাদের আর কোথাও দাঁড়াতে হবে না। ফৌজের প্রত্যেকটি সেপাই-পল্টন হাসিমুখে অফিসরদের আর অফিসররা তাদের কমাণ্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে চলে বলেই তো ইংরেজদের অত শক্তি-সামর্থ্য। নইলে সামান্য চার-পাঁচ-হাজারী ফৌজ নিয়ে ইংরেজ জেনারলরা প্রতিপক্ষের বিপুল বাহিনীকে সর্বত্র তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারতেন কি? বিপক্ষদলেরও তো সবই ছিল—চতুর্গুণ বেশিই ছিল—ছিল না ঐ ডিসিপ্লিন। অফিসর সেপাই সবাই স্ব-স্ব প্রধান, কেউ কাউকে মানতেই চায় না, একযোগে কাজ করতেই পারে না। মেজর মান্‌রো এও বেশ জানতেন, সূচনাতেই যদি কড়া শাসনে ইনডিসিপ্লিনকে দমানো না হয় তাহলে সেটা তরতর করে বেড়ে উঠে সবই ভুষ্টিনাশ করে দেয়। তিনি ও-বিষয় তৎপর হলেন।

উধুয়ানালার যুদ্ধের পর মীর জাফরের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে যে-টাকা বকশিশ বলে আদায় হয়েছিল সেটার ভাগাভাগিতে দেশী সেপাইরা গোরা পল্টনদের চেয়ে হিসেবে খানিকটা কমই পেয়েছিল। তাছাড়া লড়াইয়ের সময় গোরা পল্টনরা যে বাট্টা (একরকমের মাগ্‌গি ভাতা) পায়, সেপাইদের বাট্টা

সে-পরিমাণে কতকটা কম। অসন্তোষ ঐ-সব নিয়েই। এতদিন ভিতরে-ভিতরে গুমরিয়ে গুমরিয়ে, আরার কাছে মাঞ্জী বলে একজায়গায় সেপাইরা হঠাৎ একদিন প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করে বসল। অফিসরদের কয়েদ করে তারা স্পষ্টই জানিয়ে দিল, তারা ফৌজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলল। তারা ঠিক করেছে, ইংরেজের চাকরি তারা আর করবে না। ছাপরায় যেসব সেপাই ছিল তারা তখনো বিদ্রোহ করেনি, হাতেই ছিল। মেজর মান্‌রো কি মনে করে মাঞ্জীর সেপাইদের ধরে আনবার জন্যে তাদেরই পাঠালেন। কাজটা তিনি বুদ্ধিমানের মতোই করেছিলেন, গোরাদের পাঠালে হয়তো সেইখানেই একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যেত। গোরাদের জায়গায় নিজেদেরই জাতভাইদের আসতে দেখে, মাঞ্জীর সেপাইরা কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়ে আর-কোনো গোল না করে তাদের হাতে ধরা দিয়ে বসল। বন্দী অবস্থায় তাদের ভেলায় চড়িয়ে শোণ নদ পার করে ছাপরায় নিয়ে গিয়ে ফেলা হল।

মেজর মান্‌রো আগের থেকেই ছাপরাতে অপেক্ষা করছিলেন। বন্দী সেপাইরা এসে পৌঁছেছে শুনে তিনি সবাইকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে হাজির হতে হুকুম দিলেন। বিদ্রোহীদের ডোঙা থেকে নাবিয়ে সোজা সেইখানে নিয়ে যাওয়া হল। মেজর মান্‌রো তখন সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন—নবাব বাহাদুর যা বকশিশ দেবেন বলেছিলেন, সেটা একান্তই তাঁর মর্জির উপর নির্ভর করে। সবটা তিনি দিতে পারেননি বলে কেউ বাকিটার জন্যে দাবিদাওয়া চালাতে পারে না। যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল সেটা দাতারই নির্দেশ মতো বেঁটে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে তাই নিয়ে একটা বড়-রকমের নোংরা কাণ্ড ঘটতে পারে তখন স্থির করা গেল যে, আর-কখনো কোনোরকম দান-খয়রাত সেপাই-পল্টনদের করা হবে না, সে সবই এখন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। মেজর-সাহেব সেই সঙ্গেই আরো জানিয়ে দিলেন যে, অতঃপর পল্টন আর সেপাইদের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। কি লড়াইয়ের সময় আর কি ক্যাণ্টনমেণ্টে থাকার সময়, গোরাদের যা সুখসুবিধা সেপাইরাও সব সময় তাই পাবে, দুইয়ের মধ্যে কোনো বিভেদ-প্রভেদ করা হবে না।

সকলেই ভেবে নিয়েছিল উপদেশ দিয়েই বোধ হয় মেজর-সাহেব ক্ষান্ত হবেন। কিন্তু মান্‌রো যে কি ধাতুতে গড়া মানুষ তা তারা তখনো টের পায়নি। তিনি কমাণ্ডিং অফিসরদের অর্ডার দিলেন, বিদ্রোহী সেপাইদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশ জন পালের গোদাকে অন্য সবাইয়ের থেকে আলাদা করে দাঁড় করানো হোক। তার পর তাদের মধ্যে থেকে আবার চব্বিশ জন চাঁইকে বেছে নিয়ে

বিচারের জন্যে কোর্ট-মার্শালে দেওয়া হল। কোর্টে দেশী সেনাধ্যক্ষরাও ছিলেন। সকলে মিলে একই রায় দিয়ে সাব্যস্ত করলেন যে, ঐ চব্বিশ জনই বিদ্রোহ করার আর ফৌজ ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করার দোষে দোষী। শাস্তি বিধান করলেন, তাদের কামানের মুখে বেঁধে, তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া হোক। মান্‌রো এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, নিতান্ত নিরুপায় না হলে তিনি পারতপক্ষে রক্তপাত করতে চান না, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, ওরকম ক্ষেত্রে নরম হওয়া মানেই কর্তব্য অবহেলা করা। কমাণ্ডার হয়ে তিনি তা করতে পারেন না। কোর্টের হুকুম তামিল করতে তিনি তখনি অর্ডার দিলেন।

চব্বিশ জনের মধ্যে প্রথম দফায় চার জনকে বেছে নিয়ে তোপের মুখে বাঁধা হচ্ছে, এমন সময় বন্দী-দলের মধ্যে গোলন্দাজ যারা ছিল তারা জানাল, ফৌজে তাদের স্থান সাধারণ সেপাইদের উপরে, সুতরাং দণ্ড নেবার অধিকারও সর্বাগ্রে তাদেরই, অতএব যে-চারজনকে তোপে বাঁধবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের ছেড়ে গোলন্দাজ সেপাইদের চারজনকে সে-জায়গায় বাঁধা হোক। হেক্টর মান্‌রো তাতে আপত্তি করতে পারলেন না। বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে চারজন গোলন্দাজ নির্ভয়ে তোপের মুখের সামনে দাঁড়াল, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাসিমুখেই মৃত্যুবরণ করল। সেই দৃশ্য দেখে কেউ আর চোখের জল রাখতে পারল না। হঠাৎ সেপাইদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তারা বলছে—যথেষ্ট হয়েছে, এইবার বাকিদের মাফ করে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মেজর মান্‌রো নির্বিকার, অচল-অটল। তিনি বেশ জানতেন, যদি তিনি তখন একবার হুকুম রদবদল করেন, তাহলে আর কখনো তিনি সেপাইদের বাগ মানাতে পারবেন না, তারাই তাঁর উপরওয়ালা হয়ে দাঁড়াবে। তিনি একটুও বিচলিত না হয়ে আরো যোলো জনকে ঠিক ঐভাবে শেষ করতে হুকুম দিলেন। হুকুম তামিল হল। তখন বাকি চারজনকে ছাপরা থেকে আর-একটা স্টেশনে পাঠানো হল, সেখানকার সেপাইদের মধ্যেও বিদ্রোহের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সামনেই সেই চারজন সেপাইকে একসঙ্গে বেঁধে তোপ মেরে ওড়ানো হল। সেই যে সব একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার পর মেজর মান্‌রো যতদিন কমাণ্ডার ছিলেন ততদিন তাঁর ফৌজে বিদ্রোহের নামগন্ধও পর্যন্ত ছিল না।

স্বভাবে মেজর মান্‌রো মেজর কারন্যাকের ঠিক বিপরীত। নাই-আঁকড়ামিপনা তাঁর ধাতে সয় না। শত্রুপক্ষ লড়াইয়ের উদ্যোগ করে ওঠবার আগেই বলা নেই-কওয়া নেই তিনি তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেনই পড়বেন। অনেক

সময় ওটা প্রায় হঠকারিতারই সামিল হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু ক্লাইভের মতো মান্‌রোরও সর্বদা কেমন-যেন একটা বেপরোয়া ভাব। যুদ্ধনীতির কতকটা বিরুদ্ধে গেলেও ঐরকম আগেভাগে তেড়েফুঁড়ে যাওয়াটা এদেশের লড়াইয়ে সত্যিই খুব কাজ দেখত। মেজর মান্‌রোর ফৌজে ঘোড়সওয়ারদের সংখ্যা খুবই কম। তিনি স্থির করলেন, মালপত্তর সঙ্গে বেশি নেবেন না, যাতে সবসময়েই হালকা হয়ে ফরফর করে এদিক-ওদিক উড়ে চলতে পারেন। ভারী-ভারী জিনিস সব পাটনায় ফেলে রেখে, ৯ই অক্টোবর মেজর মান্‌রো বাঁকিপুর থেকে মার্চ শুরু করলেন। সঙ্গে তাঁর ৮৫৭ জন গোরা পল্টন, ৫২৯৭ জন দেশী সেপাই, ৯১৮ জন মোগল রিশালদার—আর আছে হালসনের কুড়িটা কামান।

ওদিকে নবাব সুজাউদ্দৌলা বক্‌সারের কেল্লায় বসে দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে রঙ্গরসে গা ঢেলে দিয়েছেন। ফৈজাবাদ থেকে তাঁর অন্তঃপুরিকাদের আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী নাচওয়ালীদেরও আমদানি মন্দ হয়নি। বর্ষাকালে অন্য কিছু তো আর করবার জো নেই, ঐসব নইলে সময় কাটে কি করে? ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা ওড়ানো, তাশ দাবা পাশা পেটানো তো আছেই, তাতেও খানিকটা সময় কাটে। তার উপর মেড়ার লড়াই মুরগির লড়াই হাতির লড়াইয়ের তামাশাও মাঝে মাঝে বেশ চলছে। কে বলবে ফৈজাবাদ অনেক দূর? সুজাউদ্দৌলা ভেবে নিয়েছিলেন বর্ষায় বোধ হয় ইংরেজরাও একজায়গায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। কিন্তু তারা যে ইতিমধ্যেই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে, সেটা তিনি ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারেননি। পারলে হয়তো অতটা বেহেড আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়ে উঠতেন না।

ঐ সময় হঠাৎ একদিন তাঁর রাগটা কি কারণে মীর কাশিমের উপর গিয়ে পড়ল। তিনি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বক্‌সারে উজির-সাহেবেরই ক্যাম্পে আছেন। মীর কাশিম যখন সুজাউদ্দৌলাকে যুদ্ধের খরচ বাবদ মাস-মাস এগারো লক্ষ করে টাকা দেবার কড়ার করেছিলেন তখন তাঁর মনে মনে স্থির করা ছিল যে, সুজাউদ্দৌলা এই যাবেন আর ইংরেজদের তাড়িয়ে এই বাড়ি ফিরে আসবেন। তাইতেই তো তিনি সহজেই অতটা টাকা কবুল করে বসেছিলেন। এখন উলটো উৎপত্তি হতে দেখে, তিনি বিষম ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ছ-মাস তো পর পর কেটে গেল, উজির-সাহেব ইংরেজদের গায়ে একটা আঁচড়ও পর্যন্ত কাটতে পারেননি। আরো চার মাস অমনি বসে বসেই যাবে। তারপরে

কপালে কি আছে তা কে জানে? মীর কাশিম আর টাকা যোগাতে পারেন না, তাঁর তলা চুঁয়ে এসেছে। সুজাউদ্দৌলাকে সহায় পাবার জন্যে তো বড় কম খরচ তাঁকে করতে হয়নি? উপহার বলেও কি উজির-বাহাদুর কিছু কম নিয়েছেন? মৌকা উপস্থিত বুঝে তাঁর পেটোয়ারাও অল্প-বিস্তর বেশ-কিছু খিঁচে নিয়েছে। তার উপব নিজের খরচও তো আছে? একটা মস্ত বড় ফৌজ তাঁকে সেই থেকে সমানে পুষে যেতে হচ্ছে। সে তো আর অমনি অমনি হয় না?

ইতিমধ্যে মীর কাশিমের বক্সী মীব সুলেমান সাহেব এক এক করে মনিবের টাকাকড়ি হীরে-মুক্তো-জহবত সরাতে লেগে গেলেন। মীর কাশিম প্রত্যহই দেখেন, তার ভালো ভালো হীরের কণ্ঠী, মুক্তোর মালা, পান্নার শিরপ্যাচ, চুনির আঁংটি, নবাব সুজাউদ্দৌলার পারিষদবর্গের অঙ্গে উঠে তাদেবই শোভাবধন করছে। বক্সী-বাহাদুর চালাক লোক। তিনি বেশ বুঝেছেন, তাঁর মনিবের আর বেশি দিন নেই। সুতবাং তারই শিলনোড়া দিয়ে তাঁবই দাঁতের গোড়া ভেঙে উজিব-সাহেবের পাত্রমিত্রদের ভোয়াজে রাখতে পারলে আখেরে কাজ দেখবে। ওদিকে মীর কাশিম ভেবে দেখলেন, তাঁর যে-টাকা তখনও অবশিষ্ট আছে তাতে তাঁর কায়ক্লেশেই দিন চলবে। তিনি হিসেবী মানুষ, তাই তিনি আর টাকা বরবাদ করতে চাইলেন না। কিন্তু সুজা-উদ্দৌলার টাকার খাঁই আকাশজোড়া। তিনি টাকার জন্যে মীর কাশিমকে তাগাদার-পর-তাগাদা লাগিয়ে অস্থির করে তুললেন। মীব কাশিমও ছাডবার পাত্র নন। তবে তখন তিনি তেমন আর কি করতে পারেন? অন্তরঙ্গ-মহলে উজিরকে কেবল কটুকাটব্য করেই তাঁকে চুপ করে যেতে হল। এদেশের নিয়মই হল যে, বিশ্বাস করে কাউকে কিছু বলা মানেই সেটাকে সর্বত্র চাউর করা। প্রাণের জালায় ব্যক্ত-করা মীর কাশিমের কটূক্তিগুলো নবাব সুজাউদ্দৌলার কানে উঠতে বিন্দুমাত্রও দেরি হল না। গতিক দেখে মীর কাশিম অন্যত্র পালাবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ ভেবে খানিক ধনরত্ন তিনি এর আগেই রোহিলখণ্ডে নাজীবউদ্দৌলার দেশে পাচার করে দিয়েছিলেন, এখন যেটুকু বাকি আছে তাই নিয়ে মানে মানে কোথাও সরতে পারলে বাঁচেন।

ওদিকে সুজাউদ্দৌলা মনে মনে স্থির করে ফেললেন, তিনি আগে মীর কাশিমের যথাসর্বস্ব লুটেপুটে নেবেন, তারপর কাশিম আলী খাঁ যথা ইচ্ছা তথা যান, তাতে তাঁর কোনোই আপত্তি নেই। আরো-একটা কারণে মীর

কাশিমের উপর সুজাউদ্দৌলার মন বিগড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে অনেকেই অকারণ বলে মনে করেন। পাঁচপাহাড়ির যুদ্ধে ইংরেজদের কিছু করে উঠতে না পেরে, তিনি তার জন্যে মীর কাশিমকেই দুষতে লাগলেন। ঐ একটা লোকের খাতিরেই তো তাঁর ঐ দারুণ অশান্তি, ইংরেজদের সঙ্গে অবনিবনা। মীব কাশিম থাকতে তাদের সঙ্গে মিটমাটেবও একটা-কোনো হিল্লে করতে পারা যাচ্ছে না। ফল যে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে, তা কে জানে? নবাব-উজির বেগে গিয়ে চতুর্দিকে মীর কাশিমের বদনাম রটিয়ে বেডাতে লাগলেন। মিথ্যে প্রচার করে দিলেন, তিনি যখন পাঁচপাহাডির যুদ্ধের শেষে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন নাকি মীর কাশিম তাঁকে গুলি কবে মারবার জন্যে সমরুকে ঠারেঠুরে ইশারা করেছিলেন। কথাটা এতই অসম্ভব যে, উজিরের মোসাহেবরা ছাডা আব-কেউ তাতে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। তবে কাবো সর্বনাশ কবার আগে তার একটা বদনাম দেওয়া তো সনাতন রীতি, নতুন কিছু নয়। কিন্তু একটা কথা সুজাউদ্দৌলারও স্বপক্ষে বলতে হয়। তিনি নিজেদের মধ্যে যতই বাগারাগি করুন না কেন, রাগেব চোটে জ্ঞান হারিয়ে তিনি মীর কাশিমকে ইংরেজদের হাতে কিছুতেই সঁপে দেননি।

মীব কাশিমের কাছ থেকে বলে-কয়ে যখন টাকা আদায় হল না তখন উজিব-সাহেব একটা কল করলেন। ছল করে তাঁকে বলে পাঠালেন, সুবে বাংলার সুবাদার থাকার সময় মীর কাশিম বাদশা শা আলমের প্রাপ্য রাজস্ব অনেক বাকি ফেলেছেন, বাদশা সে-টাকা উদ্ধার করে দেবার জন্যে এখন তাঁর উজিরকেই ধরেছেন। তার দরুন চার ক্রোড টাকা কাশিম আলী খাঁ যেন তখনি উজিরের হাতে গুণে দেন। শুনে মীর কাশিমের তো চক্ষুস্থির। তিনি বলে পাঠালেন, ও-সবের হিসেবপত্র তো মহারাজা বেণীবাহাদুর রাখেন, তিনি এসে পরীক্ষা করে দেখুন, পাওনা কিছু বেরোয় কি না। সুজাউদ্দৌলা দেখলেন, তাঁব অমন ফন্দিটা মাঠে মারা যাবার যোগাড। তিনি রেগে উঠে বললেন, বেণীবাহাদুর কে? এসব বিষয়ে তাঁর মাথা-গলাবার কি অধিকার? এটা বাদশাব সঙ্গে তাঁর সুবাদারের বোঝাপডা, তাব মধ্যে বেণীবাহাদুর আসেনই-বা কি করে? বাদশার উজিরেরই সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে হবে।

মীর কাশিম বুঝলেন, সুজাউদ্দৌলার খপ্পর থেকে তাঁর আর সহজে নিস্তার নেই। তিনি যখন ধরেছেন তখন টাকা কিছু টেনে না নিয়ে ছাড়বেন না। তখন মীর কাশিমও এক চাল চাললেন। তাঁর আর কোনো সঙ্গতি নেই জানাবার জন্যে তিনি হলদে রঙের এক আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে, মাথায় চোঙার

মতো এক কালো টুপি লাগিয়ে, হাতে দণ্ড নিয়ে, ফকির সেজে ক্যাম্পের সামনে এক গাছতলায় আসন নিলেন। সেদিন বকরীদের পর্ব ছিল। সবাই নতুন কাপড়চোপড় পরে আনন্দে ঘোরাফেরা করছে। তারই মাঝখানে মীর কাশিমকে ফকির সেজে বিলাপ করতে দেখে, সবাইয়ের কাছে দৃশ্যটি অতিশয় দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়াল। নবাব সুজাউদ্দৌলাও মনে মনে ভাবলেন, প্রকাশ্যে না হোক গোপনেও তো লোকে তাঁকে খোঁটা দিতে থাকবে। তখন তিনি নিজে গিয়ে মীর কাশিমকে অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁকে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দমবাজিতে সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের চেয়ে একটুও কম যান না। তিনি মীর কাশিমকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেই সমরুকে ডেকে তাঁর পিছনে লাগিয়ে দিলেন। মীর কাশিমের সমস্ত ইওরোপীয়ন পল্টন আর সেপাইদের উজির-সাহেব তার আগেই হাত করে নিজের ফৌজে ভর্তি করে নিয়েছেন।

সুজাউদ্দৌলার ইশারা পেয়ে সমরু মীর কাশিমের তাঁবুতে চড়াও হয়ে ফৌজের বাকি মাইনের জন্যে হৈ-হল্লা লাগিয়ে দিলে। গোলমালে মাথা ঠিক না রাখতে পেরে মীর কাশিম একটা মস্ত বেকুবি করে বসলেন। তাঁবুর ভিতর থেকে তাঁর লুকোনো টাকার থেকে খানিক টাকা বাইরে বের করে আনলেন। সমরুকে তাই দিয়ে বাকি মাইনে চুকিয়ে দিতে গেলে সমরু দেখল, সে তো রুপোর টাকা নয়, সবই সোনার আশরফি। সেখানে যত লোক ছিল তারা সবাই টের পেয়ে গেল, কাশিম আলী খাঁ তখনো সত্যি ফকির হয়ে পড়েননি, তাঁর হাতে তখনো কিছু আছে। মীর কাশিম সমরুকে ডেকে বললেন, তাঁর যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি আর মাত্র দু-দল সৈন্য রাখতে পারেন, তার বেশি সেপাই রাখার সামর্থ্য তাঁর নেই, সুতরাং সমরু যেন বাকিদের কাছ থেকে হাতিয়ার আর সরঞ্জাম সব ফিরিয়ে নিয়ে তাদের বিদায় করে দেয়। সমরু মুচকি হেসে বলল—কামান-বন্দুক যাদের-যাদের জিম্মায় আছে এখন সে-সব তাদেরই জিনিস হয়েছে, আর তারা নিজেদের জায়গা আগেই খুঁজে নিয়েছে—এই বলে সমরু আর সেখানে দাঁড়াল না, নিজের তাঁবু মীর কাশিমের ক্যাম্পের পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার ক্যাম্পের কাছে পাতল।

পরদিন সুজাউদ্দৌলার সৈন্যরা গিয়ে মীর কাশিমের ক্যাম্প ঘেরাও করে ফেলল। জেনানাও বাদ দিল না। যা-কিছু ছিল সবই সাফ করে উঠিয়ে নিয়ে গেল। উজির-সাহেব তার বারো-আনা আত্মসাৎ করে চার-আনা মাত্র বাদশার তহবিলে জমা দিলেন। তার পর মীর কাশিমকে স্বয়ং সুজাউদ্দৌলার

কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তাঁর বন্দিখানার সর্দার ফতে আলী খাঁকে ডেকে তাঁরই হাতে মীর কাশিমকে সমর্পণ করে দিলেন। ফতে আলী আবার হেফাজতের জন্যে তাঁর ভাইপো আবুল হাসানের কাছে মীর কাশিমকে ঠেকিয়ে দিলেন। আবুল হাসান মীর কাশিমের কাছে লুকোনো টাকা আরো আছে মনে করে, তার সন্ধান পাবার জন্যে তাঁর উপর অকথ্য উৎপীড়ন শুরু করে দিল। একদিন এক-কড়াই ফুটন্ত গরম জলের উপর মীর কাশিমকে বসিয়ে দিয়ে আবুল হাসান তাঁকে গুপ্তধনের হদিস বাতলিয়ে দেবার জন্যে ভীষণ পেড়াপীড়ি করতে লাগল। যন্ত্রণার চোটে মীর কাশিম চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—উজিব-সাহেব তো আমার সবই কেড়েকুড়ে নিয়েছেন, তিনি আর কি চান? আমায় প্রাণে মারতে চান তো এই দণ্ডেই মেরে ফেলুন। আমি আল্লার নামে তার জন্যে তৈরি হয়ে আছি। আর যদি আমায় ছেড়ে দেওয়াই তাঁর মতলব হয়, তাহলে দয়া করে এই বেলা দিন, আমি অন্য কারো আশ্রয়ে চলে যাই। মীর কাশিমের কাতরানি শুনে ফতে আলী খাঁ সেখানে এসে পড়ায় তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন, নচেৎ সেদিন খাঁ-সাহেবের উপযুক্ত ভ্রাতুস্পুত্রের হাতে তাঁর মরণ কেউই ঠেকাতে পারত না।

আজকালকার সভ্য জগতে মানুষের হাত থেকে ভব্যভাবে টাকা শুষে নেবার জন্যে শারীরিক যন্ত্রণা দেবার দরকার হয় না, তার জন্যে নানারকমের ভদ্র উপায় বের হয়েছে। নবাব সুজাউদ্দৌলার যদি সে-সবের সিকি পরিমাণও কলকৌশল জানা থাকত তাহলে মীর কাশিমের ধনদৌলত মেরে নেবার জন্যে তাঁকে অত কষ্টও স্বীকার করতে হত না, আর ইতিহাসের পাতাতে মস্ত করে তাঁর অপবাদও দেওয়া থাকত না। বরং মাথাওয়ালা এক ফাইনানসিয়ার বলে তাঁর গৌরবই রটে যেত। সে যাই হোক, মীর কাশিম তাঁর আর কোনো কাজে লাগবেন না বুঝে নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁকে বিদায়ই করে দিলেন। ক্যাম্প পার করে দিয়ে আসবে বলে একটা খোঁড়া হাতিও তাঁর জন্যে পাঠালেন। তারই পিঠে চড়ে মীর কাশিম সপরিবারে সেখান থেকে চটপট্ সরে পড়লেন, এক মুহূর্তও আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

মীর কাশিম যেদিন ছাড়া পেলেন ঠিক তার পরদিন—অর্থাৎ ১৭৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে—মেজর হেক্টর মান্‌রো সকাল নটায় সসৈন্যে বক্‌সারের মাঠে এসে উঠলেন। মীর কাশিমের ভাগ্যি ভালো যে, তাঁর পালানোর রাস্তাটা ছিল ইংরেজদের আসার ঠিক উলটো দিকে, নইলে পথে তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলে তাঁর যে কি দশা হত তা ভাবতেও পারা যায় না।

উনত্রিশ ॥

বক্‌সার কেল্লার উত্তর দিকে গঙ্গা, দক্ষিণ দিকে একটা ছোট নালাগোছের খাল, নাম যদিও তার থোড়া নদী। কেল্লার পুবে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে, তার সামনেই বুক-প্রমাণ মাটির দেওয়াল গঙ্গার ধার থেকে উঠে নালাটার প্রায় কাছ পর্যন্ত চলে গেছে। দেওয়ালের পাশেই যাতায়াতের সুবিধার দরুন খানিকটা ফাঁক রেখে দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজরা বক্‌সারের মাঠে পড়েই দেখল, তাদের তিন মাইল দূরে ঐ দেওয়ালেরই বাইরে শত্রুপক্ষ সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজদের ঢুকতে দেখে তারা গোলাগুলি ছুঁড়ে আদাব জানালে। তবে তাক ঠিক না হওয়ার দরুন সেসব ইংরেজদের লাইন পর্যন্ত পৌঁছল না। সুজাউদ্দৌলার ফরাসী সেনাধ্যক্ষরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানলেন যে, ইংরেজদের তাড়া করে যাবার ঐটাই উপযুক্ত সময়। তারা সারা রাত মার্চ করে ক্লান্ত হয়ে আছে, তাদের মালমশলাও সব তখনো এসে পৌঁছয়নি, যা পৌঁছিয়েছে তাও খুলে সাজানোর সময় পায়নি—ঐরকম বেকায়দা-অবস্থায় তাদের তেড়ে গেলে, হয় তাদের ভেগে পড়তে হবে, আর নয় তো তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হেরে মরতে হবে। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা সেসব কোনো কথায় কান দিলেন না। সৎপরামর্শ তিনি যে সহজে কখনো নিয়েছেন, এমন কথা তো ইতিহাসে লেখে না। একঘণ্টা ধরে ইংরেজদের গতিবিধি লক্ষ করে তিনি সবাইকে দেওয়ালের পিছনে সুড়ঙ্গে আবার ঢুকে পড়তে অর্ডার দিলেন।

সুজাউদ্দৌলা বোধ হয় প্ল্যান করে রেখেছিলেন যে, ইংরেজদেরকে হারাবার প্রশস্ত উপায় হচ্ছে ডিফেন্‌সিভ অ্যাকশন নেওয়া—অর্থাৎ দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে হামলা না করে, ইংরেজরা খানিক এগিয়ে এলে, দেওয়ালের আড়াল থেকেই তাদের উপর গোলাগুলি চালানো। হেক্টর মান্‌রোও ধরে নিয়েছিলেন, সুজাউদ্দৌলা ঐরকম একটা-কোনো মতলব এঁটেই তাঁর সৈন্যদের সুড়ঙ্গের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাই তিনিও স্থির করলেন, রাত দুটোর সময় তিনি নালার পাশের সেই ফাঁকটা দিয়ে নিঃশব্দে সুজাউদ্দৌলার ক্যাম্পে ঢুকে পিছন থেকে গিয়ে তাঁকে চেপে ধরবেন। সেই মনে করে তিনি শত্রুপক্ষের অবস্থাটা

ঠিক কি—বিশেষ করে তাদের কামান-ঘাঁটিগুলো কোথায়—তাই জানবার জন্যে চর লাগিয়ে দিলেন। স্পাইদের মধ্যে দুজন যখন খবর নিয়ে ফিরে এল তখন রাত প্রায় কাবার, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। চরদের রিপোর্ট হল, সুজাউদ্দৌলার ক্যাম্পে সারারাত ধরে কেউই ঘুমোয়নি, সবাই হাতিয়ারবন্দ হয়ে যে যার জায়গায় বসে জেগেই কাটিয়েছে। দামী-দামী জিনিসপত্র, ধনরত্ন, স্ত্রীলোকের পাল—সবই রাতারাতি অন্যত্র পার করে দিয়ে আসা হয়েছে, ফৈজাবাদ ফিরে যাবে বলে। চরেরা আরো জানালে, উজির-সাহেব বোধ হয় সকাল থেকেই লড়াই শুরু করে দেবেন। কথাটা কিন্তু মেজর মান্‌রোর তেমন বিশ্বাস হল না। সুজাউদ্দৌলা যে ইতিমধ্যে মত বদলিয়ে ডিফেন্‌সিভ অ্যাকশন ছেড়ে অফেন্‌সিভ নেওয়াই স্থির করে ফেলেছেন, কেন জানি নে, মান্‌রো সেটা ঠিক ধরে উঠতে পারলেম না। তিনি তাঁর কাউন্সিল-অভ্‌-ওয়র ডাকলেন। সেখানে সবাই মিলে ঠিক করলেন যে, সেদিনটা যেতে দেওয়া হোক। এক দিন বেশ করে বিশ্রাম নিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠা যাক, তার পরদিন—অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর—সকাল থেকে লড়ে গেলেই চলবে।

২৩শে অক্টোবর কিন্তু পেরোতে হল না। একটু ফরসা হতেই দেখা গেল, সুজাউদ্দৌলার সৈন্যরা সুডঙ্গেব থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের বাইরে গিয়ে তারই সামনে একে একে জমা হচ্ছে। মেজর মান্‌রো ঘোড়ায় চড়ে চারিদিক ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে সব তদারক করে বেড়ালেন, কিন্তু তবুও তিনি ভাবলেন, সুজাউদ্দৌলা বোধ হয় শুধু ড্রিল করিয়ে তাঁদের মনে দাগিয়ে দিতে চান যে, তাঁর কত লোকবল, লড়াই করবার সত্যি ইচ্ছে তাঁর নেই। ইংরেজ ফৌজে মান্‌রোর নীচেই মেজর আলেক্‌জাণ্ডার চ্যাম্পিয়ন। তিনি এদেশে অনেকদিন ধরেই আছেন, এদেশের অনেক লড়াই দেখেছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, লড়াই ঐ দিন না হয়ে যায় না। তাই মান্‌রো যখন তাঁকে ব্রেকফাস্ট খেতে ডাকলেন তখন তিনি গেলেন না, মাঠে-মাঠেই টহল দিয়ে বেড়াতে থাকলেন। মান্‌রো একাই তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

দূরবীন কষে চ্যাম্পিয়ন দেখলেন, শত্রুপক্ষ দেওয়ালের গেট দিয়ে তাদের বড়-বড় কামানগুলোও বাইরে বের করে আনছে। তার পর সব গুছিয়ে নিয়ে তারা যে ইংরেজদের দিকেই এগিয়ে চলল? মেজর চ্যাম্পিয়ন তখনি ঘোড়া ছুটিয়ে মান্‌রোর তাঁবুতে গিয়ে হাজির। চ্যাম্পিয়নকে অমন হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে, মান্‌রো তাঁকে ঠাণ্ডা হয়ে কিছু খেয়ে নিতে বললেন। চ্যাম্পিয়ন জানালেন, খাবার সময় আর নেই। শত্রুপক্ষ যে ঘাড়ে এসে পড়ল। বাস্তবিকই

সুজাউদ্দৌলার সৈন্যরা তখন অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তাই দেখে, মান্‌রো ড্রাম পিটে সকলকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে নিশান দিলেন। কে কোথায় দাঁড়াবে তা আগের থেকেই সব পরিষ্কার করে ছকা ছিল, ড্রাম বেজে উঠতেই সবাই স্ব-স্ব স্থানে গিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

সকাল নটার সময় তোপ দেগে লড়াই শুরু হয়ে গেল। সুজাউদ্দৌলার দিকে উজির-সাহেব নিজেই তাঁর ডান পাশের—ইংরেজদের বাঁ পাশের—সেপাইদের চালনা করছেন। তাঁর সঙ্গে পয়দল সেপাই তো যথেষ্ট আছে, তার উপর আছে ছ-সাত হাজার দুর্ধর্ষ কাবুলী ঘোড়সওয়ার, যারা বছর আড়াই আগে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারের চোটে মারাঠাদের হাড্ডি চুরচুর করে দিয়েছিল। মাঝখানে সমরু, রেনি মাদেক, জঁাতি, আর ইওরোপীয়ন পল্টন, আর তাঁদেরই হাতে তৈরি দেশী সেপাই, যারা এককালে মীর কাশিমেরই ফৌজে থেকে তাঁরই নিমক খেত। তাদের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে সুজাউদ্দৌলার এক খুব সাহসী ক্যাপ্টেন—সুজা কুলী খাঁ—ডাকনাম ঈশা মিঞা। তাঁর তাঁবে পয়দল আর বিশালদার মিলিয়ে ছ-হাজার সেপাই। একেবারে বাঁ পাশে—অর্থাৎ ইংরেজদের ডানদিকে—আছেন মহারাজা বেণীবাহাদুর তাঁর ফৌজ নিয়ে। তাঁকে সাহায্যের জন্যে তাঁর পিছনে আছেন লক্ষ্ণৌয়ের শেখজাদারা, যাঁদের সর্দার হচ্ছেন গোলাম কাদের। সমস্ত বাহিনী গুনতিতে হবে হাজার পঞ্চাশেক। তাদের সঙ্গে আছে পঞ্চাশখানা ভারী-ভারী তোপ আর ছোট-মাঝারি মিলিয়ে শ-দুয়েক কামান।

ইংরেজরা তখনো পুরো লাইন বেঁধে উঠতে পারেনি। অফিসরদের ধরে তাদের কুল্লে ৭০৭২ জন লোক। তারা আগুপিছু দুই লাইনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে লাগল। কতক ভাড়াকরা মোগল ঘোড়সওয়ারকে এক ইংরেজ অফিসরের কর্তৃত্বে পিছনের একটা গ্রামে পাঠানো হল। সেখানে বাক্স-প্যাঁটরা রসদপত্র সাজসরঞ্জাম যা পড়ে আছে, তা সব তারা আগলাবে। খানিক পল্টন-সেপাই মাঠের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল, তাদের লাইনে ফিরে আসতে অর্ডার পাঠানো হল। কিন্তু বড় দেরি করে। তারা কোনোক্রমে লাইনে এসে যোগ দিতে পারল বটে, কিন্তু অনেকখানি ক্ষতি স্বীকার করে। ইংরেজরা সৈন্য সাজাল যেমন তারা সর্বদাই সাজায়, সেই ধারায়। মধ্যিখানে গোরা পল্টন, তার দু-পাশে দেশী সেপাই, আর তাদের মাঝে, আর শেষের দু-দিকে দু-সারি করে কামান। ইংরেজদের সঙ্গে সবসুদ্ধ বাইশটা কামান, কিন্তু

সেগুলো সবই ছোট-ছোট হালকা-গোছের। সুজাউদ্দৌলার তোপের মতো অত দূর তাদের গোলা ছোটে না।

বেলা সাড়ে নটার সময় ইংরেজদের, লাইন বাঁধা হয়ে উঠতে তারা সামনে এগোবার একটু ফুরসত পেল। কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তাদের থেমে যেতে হল, বাঁ দিকের ঠিক সামনেই একটা জলা পড়েছে, তার উপর দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। জলায় তখন জল ছিল না বটে, কিন্তু হড়হড়ে কাদায় ভর্তি। তাতে একবার পা পড়লে সে-পা আর ওঠানো দায়। তাই ডাইনে হেলে লাইন খানিক না বাঁকালে আর তো সামনে এগোনো যায় না। ঐ বাঁকবার সময়েই সুজাউদ্দৌলার দিক থেকে বড়-বড় গোলা ছুটে এসে ইংরেজদের জোর জোর পিটতে লাগল। তবে একটা সুবিধা এই ছিল যে, সুজাউদ্দৌলার দিকের কামানগুলো বড়-বড় আর ভারী-ভারী হলে কি হয়, ইংরেজদের তোপের মতো সে-সব কামান একনাগাড়ে পটাপট দেগে চলতে পারে না, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ইংরেজদের সেপাইরা নির্বিকার-চিত্তে মার খেতে খেতে তারই মধ্যে ডাইনে হেলে আবার লাইন বেঁধে ফেলল।

বেলা দশটা নাগাদ সুজাউদ্দৌলার দল ইংরেজদের এত কাছে গিয়ে পড়ল যে, আর কামান দাগা শানায় না, এবার চার্জ করে যেতে হয়। কাবুলী আর নাগা-সন্ন্যাসী ঘোড়সওয়াররা তিন-তিনবার চার্জ করে গেল, তিন-তিনবারই ইংরেজদের গোলা খেয়ে হটে ফিরে এল। চারবারের বার তবে তারা ইংরেজদের লাইন ভেদ করতে পারল। সেই দেখে ইংরেজদের বাঁ-পাশের সেপাই-পল্টনরা পশ্চিম থেকে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের উপর গুলি চালাতে লাগল। ঘোড়সওয়ারদের অনেকেই তাতে মরল বটে, কিন্তু তবুও একদল পাশ কাটিয়ে ইংরেজ-লাইনের পিছনে গিয়ে পড়ল। ঐ সময় বড় কোনো জেনারলের মতো সুজাউদ্দৌলাও যদি আর-একদল সৈন্য তখনি তাদের সাহায্যে পাঠাতেন তাহলে ইংরেজদের বাঁ পাশটা নির্ঘাত ছারখার হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হল না। যারা পিছনে গিয়ে পড়ল তারা ইংরেজদের গুলির তোড় সহ্য করতে পারল না। তারা সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেল, আর-একটু এগিয়ে গেলেই যে গ্রামটা পড়ে, সেখানে ইংরেজদের মালপত্র সব মজুত করা রয়েছে। লুঠের সন্ধান একবার পেলে দেশী সৈন্যদের দিইয়ে তো আর লড়াই করানো দায়, তারা গন্ধে-গন্ধে ঠিক সেদিকে ছুটবেই ছুটবে। ইংরেজদের যে খুদে ফৌজ সেদিকে পাহারা দিচ্ছিল সেটাকে হটিয়ে দিতে কাবুলী আর

নাগাদের একটুও দেরি হল না। ইংরেজদের সমস্ত মালই তাদের হাতে পড়ে দেখতে দেখতে লোপাট হয়ে গেল, একটা টুকরোও কিছু বাঁচল না।

ইতিমধ্যে ইংরেজরা ভাঙা লাইন জোড়া দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আর তো একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, চার্জের বদলে একটা কাউণ্টার-চার্জ করতেই হয়। মুশকিল হল—বাঁদিকের সামনে জলা, সেদিকে পা-ফেলা যায় না, মাঝখানে সমরুদের গোরা পল্টন আর তাদেরই তাঁবের সেপাই, সঙ্গে কামানও অনেক। সেদিকেও তেড়ে যাওয়া কঠিন। পিছনে রয়েছে কাবুলী আর নাগা ঘোড়সওয়াররা। তারা লুটপাট শেষ করে পিছন থেকে ঠেলা মারছে। বাধ্য হয়ে ইংরেজদের ডানদিকে বেয়ে এগোতে হয়, নয় তো তাদের যায়-যায় অবস্থা, একজায়গায় জট পাকিয়ে ডাহা গোলাগুলি খেয়ে মরতে হয়। ডানদিকে ইংরেজদের সামনেই একটা বাগানের মধ্যে সুজাউদ্দৌলার একদল সৈন্য মোতায়েন করা আছে। মান্‌রো দেখলেন, ঐ বাগানটা যে-কোনো প্রকারে দখল করে নিতে না পারলে তিনি গেছেন। ক্যাপ্টেন রেনি মাদেক বাগানের কাছের কামানঘাঁটি থেকে গোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইংরেজদের বড্ডোই মার লাগাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করা এখনি চাই।

মেজর মান্‌রো প্রথমে ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল ফিক্‌কে বাগানটা দখল করে কামানগুলো কেড়ে নেবার জন্যে পাঠালেন। কিন্তু দুবার চেষ্টা করেও ফিক্‌ হঠে এলেন, কিছুই করতে পারলেন না। তখন মান্‌রো ফিক্‌কে সরিয়ে দিয়ে লেফটন্যান্ট নিকলকে ঐ কাজে পাঠালেন, ক্যাপ্টেন হারপার তাঁর সাহায্যে পিছু পিছু চললেন। ঐ দুজন ছোকরা জোয়ান মিলে সেই বাগানটা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সেখানকার লোকেদের বেশ কাবু করে এনেছেন, এমন সময় ডান পাশের আহীরওউলি গ্রাম থেকে বেণীবাহাদুরের ফৌজের একদল সেপাই এগিয়ে গিয়ে তাঁদের খুব মার লাগাতে লাগল। তাই দেখে তখন মেজর চ্যাম্পিয়ন ডান পাশের সমস্ত সেপাই আর কামান একত্র করে সেদিকে দৌড়লেন। নিকল আর হারপারের সেপাই-পল্টনদের সঙ্গে মিশে গিয়ে লাইনবন্দী হয়ে এগোতে লাগলেন। বাগানের ভিতর থেকে গোলা ছুটে আসতে লাগল, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন সে-সবের তোয়াক্কা না করেই এগিয়ে চললেন। তার পর কামান পেতে দে মার তো দে মার। শত্রুপক্ষ তার সামনে আর দাঁড়াতে না পেরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। বাগানটা ইংরেজদের দখলে এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাতাশটা বড়-বড় কামানও।

ঐ প্রথম ইংরেজদের যা-একটু জিত হল। এতক্ষণ তো তারা পদে পদে হেরেই মরছিল। যদিও জিতটা বলে বেড়াবার মতো এমন একটা-কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু তাতেই ইংরেজদের মিয়ানো ভাবটা খানিক কেটে গিয়ে তার জায়গায় একটু ফুর্তির চমক দেখা গেল। উৎসাহের চোটে মান্‌রো নিজে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সৈন্যদের আগে আগে চললেন, তাদের তাওয়ানোর জন্যে বলতে লাগলেন—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, তোমাদের জয় কে ঠেকায় ব্রাদার? তার পর মাথার টুপি তুলে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে থ্রি চিয়ার্স দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তারস্বরে চিৎকার করে উঠল—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! বাস্তবিক ঐখান থেকেই হাওয়াটা যেন একটু একটু করে বদলাতে লাগল। একেবারে ঘোর নিরাশার মধ্যে মিটমিটে একটু আশার আলো দেখা গেল। প্রায়ই দেখা যায়, দান একবার ভালো পড়লে খানিকক্ষণ ধরেই তার জের চলতে থাকে। মান্‌রো তাঁর সমস্ত ফৌজকে একত্র হয়ে ডাইনে এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। ইত্যবসরে ইংরেজদের বাঁ পাশের সেপাই-পল্টনরাও জলাটাকে বাঁ দিকেই রেখে ডান পাশ ঘেঁষে একটু একটু করে সামনে বেড়ে চলল।

বাগানের কাছ থেকে শত্রুদের তাড়ানোর পর মেজর চ্যাম্পিয়নের দলের থেকে কাছ-ছাড়া হয়ে নিকল আর হারপার সোজা বেণীবাহাদুরের ফৌজের দিকে ধাওয়া করলেন। গঙ্গার ধারে কতগুলো পোড়োবাড়ি পড়েছিল, বাগান থেকে হটে গিয়ে তাদেরই আড়ালে বেণীবাহাদুরের সেপাইরা গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। লক্ষ্ণৌয়ের নামকরা লড়িয়ে শেখজাদারা আগের থেকেই তাদের অধ্যক্ষ গোলাম কাদেরের কর্তৃত্বে বেশ নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বিশ্রাম করছিল। ইংরেজরা গুটি গুটি করে এগিয়ে গিয়ে কখন যে কাছে এসে পড়েছে, সেটা তারা কেউই টের পেল না। বুঝতে পারল যখন তারা সেইসব পোড়োবাড়ির ছাতে চড়ে শেখজাদাদের উপর ইঁটের থান আর তাল-তাল কাদার চাপড়া ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। তখন খেয়াল হতে তারা লাইনবন্দী হয়ে ইংরেজদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে দিল। কিন্তু তাদের পুরনো ধাঁচের গাদাবন্দুক, তাই নিয়ে ইংরেজদের নতুন ধরনের মাস্‌কেট-রাইফেলের সামনে দাঁড়াবে কতক্ষণ? ইংরেজদের গুলি মুহুর্মুহু ছুটছে, একমিনিটও তার বিরাম নেই। ইতিমধ্যে আরো খানিক ইংরেজ পল্টন-সেপাই আর খানকতক তোপও সেই জায়গায় এসে পড়ল। গোলাম কাদের কিন্তু সিংহের বিক্রমে লড়ে গেলেন। লড়াতে লড়াতে অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

যেই তিনি পড়লেন অমনি শেখজাদাদের দল সেখানে আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না, পিছনে মুখ ফিরিয়ে সবাই মিলে টেনে পালাল।

গোলাগুলির আওয়াজে বেণীবাহাদুরের মাথা কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। তাছাড়া তাঁর মাথা পোলিটিকাল চালবাজিতে যেমন খেলে, যুদ্ধবিগ্রহে ঠিক তেমনটি নয়। আর সাহস জিনিসটাকেও তার একটা সদ্‌গুণ বলে কেউই বর্ণনা করে যাননি। চোখের সামনে গোলাম কাদেরকে মাটিতে গড়াতে দেখে আর শেখজাদাদের একটানা দৌড় দিয়ে পালাতে দেখে, বেণীবাহাদুর বড়ই বিভ্রমে পড়ে গেলেন। এ ক্ষেত্রে তার কি করা উচিত-না-উচিত, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তার এক হাবিলদার গালিব খাঁর পরামর্শ চাইলেন। গালিব লোকটা একটু রসিকগোছের। তিনি বললেন, মহারাজা-বাহাদুর যদি নাম কিনতে চান তো লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিতে পারেন, তবে প্রাণ বাঁচানোই যদি তার মনোগত বাসনা হয়, তাহলে আর একদণ্ডও দেরি না করে, মহারাজ-বাহাদুরকে এইবেলাই পথ দেখতে হয়। বেণীবাহাদুর মুখে আস্ফালন করলেন বটে তিনি লড়াই করতেই চান, কিন্তু ছ-ফুট লম্বা হুমদো-হুমদো লালমুখো ইংরেজদের বেয়নেট হাতে নিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে আসতে দেখে তার আর মতি স্থির রইল না। পালাতে পারলে লড়াইয়ের সুযোগ আবার একবার পাওয়া যায়—এই নীতিবাক্য স্মরণ করে তিনি বাসার দিকে পা বাড়ালেন। তাই দেখে তাঁর ফৌজও ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। রসিকপ্রবর গালিবও তার দুই পুত্রসহ মহাজনের পদানুসরণ করলেন।

সমরুদের পিছনেই সুজা কুলী খাঁ ওরফে ঈশা মিঞা তার ছ-হাজারী ফৌজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দূর থেকে তাঁর বাঁ-দিক বেয়ে গোলাগুলির এক প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসতে তিনি ভেবে নিলেন, বেণীবাহাদুর নিশ্চয়ই ইংরেজদের ঘায়েল করে বসেছেন। জয়ের গৌরব বেণীবাহাদুর যে একা ভোগ করবেন, সেটা তাঁর সহ্য হল না। তিনিও তাল ঠুকে তাঁর দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, সত্যি কি ঘটেছে তার একটু খোঁজখবর নেওয়াও আবশ্যক মনে করলেন না। বেণীবাহাদুর বাঁ-দিকে জিতেছেন, তিনি এবার ডানদিকে জিতবেন—এই মনে করে তিনি সমরুদের মুখের উপর দিয়েই ইংরেজদের লাইনের দিকে দৌড়তে লাগলেন। তাতে সমরুরা এতক্ষণ যে গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছিল সেটা একেবারেই থেমে গেল, নইলে নিজেদের দলেরই লোক নিজেদের গোলা খেয়ে মরে। ইংরেজরা ঐ গোলমালের সুযোগ নিয়ে ডবল জোরে তাদের

গোলা চালিয়ে গেল। ঝোঁকের মাথায় ইংরেজদের চার্জ করতে গিয়ে ঈশা মিঞা টাল সামলাতে না পেরে তাঁর অর্ধেক পরিমাণ সেপাইসুদ্ধ জলায় পড়ে গেলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোরকমে কাদার গাদ ঠেলে শুকনো ডাঙায় উঠবেন-উঠবেন করছেন, এমন সময় ইংরেজদের দিক থেকে এক গোলা ছুটে এসে তাঁকে সেইখানেই কাত করে ফেলল।

সুজাউদ্দৌলা আগেই ইংরেজদের গোলাগুলির চোট সামলাতে না পেরে একটু পিছু হটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে আর একটা নতুন লাইন বেঁধে ইংরেজদের দিকে আবার এগোবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তার কাবুলী আর মোগল ঘোড়সওয়াররা তাকে ছেড়ে তার নিজেরই ক্যাম্পে চড়াও হয়ে, যা কিছু দামী-দামী জিনিসপত্র সেখানে ছিল, তা সবই লুটপাট করে নিয়ে আত্মসাৎ করতে লেগে গেল। ওদিকে নিরল আর হারপারের দলও শেখজাদাদের আর বেণীবাহাদুরের সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাফ করে দিয়ে, পিছন দিক বেয়ে সুজাউদ্দৌলার ক্যাম্পে গিয়ে পড়ল। কাবুলী আর মোগলদের তখন পেট পুরেছে, ইংরেজদের আসতে দেখেই তার সব বেঁধেছেঁদে নিয়েই চটপট চম্পট দিল। তখন চারদিকে এমন একটা আতঙ্ক লেগে গেছে যে, কেউই আর লড়াইয়ে নামতে চায় না, প্রাণের ভয়ে সবাই টেনে সটকান দিচ্ছে। সমরু, মাদেক, জাতি—এঁরাও একা একা আর লড়াই করা বৃথা মনে করে অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।

সুজাউদ্দৌলা আর তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে নিতান্ত অনুগতেরা কজন মিলে ঐ টেনে পালানো বন্ধ করবার খুবই চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তখন ঐ প্রচণ্ড হট্টগোলে কে কার কথা শোনে? সবাই ভাবে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের নাম! সংকটকালে অমনি করেই সুজাউদ্দৌলার অত বড় ফৌজ তাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। সামান্য কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে রইল না। সুজাউদ্দৌলা যেদিকে তাকান সেদিকেই দেখেন মৃতদেহের ছড়াছড়ি। দু-দণ্ড আগেও যেখানে তাঁর নিশ্চিত জয় ছিল, সেখানে হল কিনা মোক্ষম পরাজয়। মাথা নিচু করে নবাব সুজাউদ্দৌলাও শেষে পলাতকদের দলে যোগ দিলেন। সকাল নটার সময় আরম্ভ করে দুপুর বারোটা পর্যন্ত—এই তিন ঘণ্টার মধ্যেই সব খতম। শুধু দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কামড়ে পড়ে থাকার দরুনই ইংরেজরা হেরে হেরেও বক্সারের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত জিতে গেল। মুসলমান লেখকেরা আর সুজাউদ্দৌলার ফরাসী সেনাধ্যক্ষরা লিখেছেন যে

ইংরেজরা একসময় এমন হার হারছিল যে, মেজর মান্‌রো নাকি সব আশা-ভরসা ত্যাগ করে লড়াই ছেড়ে সকলকে নিয়ে পালাবারই মতলব ভাঁজছিলেন। কথাটা বিশ্বাস হয় না। মান্‌রো মানুষটার চরিত্র যা দেখা যায়, তাতে করে পালানোটা তাঁর ধাতে সইবার কথা আদবেই নয়। তিনি যুদ্ধ করতে করতে মরবেন, এমনকি দৈবগতিকে শত্রুর হাতে বন্দীও হতে পারেন, কিন্তু কদাচ যুদ্ধ ছেড়ে পালাবেন না।

বিপদ কখনো একলা আসে না—এমনি একটা কথা অনেকেরই মুখে শোনা যায়। সুজাউদ্দৌলার সেপাইদের পালাবার পথটা যুদ্ধস্থল থেকে দু-ক্রোশ দূরে থোড়া নদীর উপর দিয়ে চলে গেছে। তখন নদীতে তেমন জল না থাকলেও সবটা হড়হড়ে কাদায় ভর্তি হয়ে আছে, তার উপর দিয়ে হাটা চলে না। তাই পেরোবার জন্যে পাশাপাশি নৌকো সাজিয়ে একটা পুল মতো বাঁধা হয়েছে। সুজাউদ্দৌলা তার উপর দিয়ে পার হবার খানিক পরেই সে-পুলও গেল ভেঙে। রাশরাশ লোক তার উপর দিয়ে ডুড়ুমদাড়াম করে পালিয়েছে, নৌকোর পুল কত আর ভার সহ্য করতে পারবে? যারা তখনো ওপারে পৌছতে পারেনি, নাকোর উপরেই দাঁড়িয়েছিল, পুল ভেঙে যাওয়ায় তারা কাদায় ছিটকে পড়ে তার থেকে আর উঠতে পারল না। মৃতদেহের পাশে মৃতদেহ, আবার তার উপর মৃতদেহ পড়ে স্তূপীকৃত হয়ে গোটা আর-একটা পুলই তৈরি হয়ে গেল। বাকি যারা পিছনে পড়েছিল, তারা তারই উপর দিয়ে কোনোক্রমে টলতে টলতে পার হয়ে চলল। নদী পর্যন্ত গিয়ে মানরো সুজাউদ্দৌলার পিছনে আর তাড়া করে যেতে পারলেন না, ইংরেজদের ঐ মড়ার ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে গা ঘিনঘিন করে উঠল। তারা সবাই আস্তে আস্তে বক্‌সারের কেল্লায় ফিরে গেল। ইংরেজদের জিনিসপত্র যা-কিছু ছিল তা সবই খোয়া গেছে। কেল্লা থেকেও বিশেষ-কিছু পাওয়া গেল না, কাবুলী সেপাইরা সবই চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে। হাতে এল কেবল একশো-বাহাত্তরটা ভালো-ভালো কামান, আর সামান্য কিছু সাজসরঞ্জাম, যার দাম হদ্দমুদ্দ লাখ-খানেক কি লাখ-দেড়েক।

পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজরা জিতেছিল লড়াই না করেই। উধুয়ানালার যুদ্ধ স্রেফ একটা একতরফা ব্যাপার। তাতে ইংরেজদের সামান্য একটু লড়তে হয়েছিল বটে, কিন্তু অপরপক্ষ থেকে বাধার মতো কোনোই বাধা পায়নি। রাতের বেলায় আচমকা আক্রমণের ফলে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে গিয়ে আতঙ্কেই দফাসারা তো লড়বে আর কি? বক্‌সারের যুদ্ধে ইংরেজদের প্রত্যেকটি ক্ষেপে

জোর লড়ে, এক-পা এক-পা করেই এগোতে হয়েছিল। সুজাউদ্দৌলার হাতে তাদের তো শেষই হয়ে গিয়েছিল, জিতে বেরোল শুধু চরিত্রবলে। অদম্য সাহস, কষ্ট সহ্য করার অশেষ ক্ষমতা, কর্তব্যে একনিষ্ঠ হয়ে লেগে থাকা, আর কঠোর ডিসিপ্লিন—এই সবেরই গুণে—আর সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে সবার উপর হেক্টর মান্‌রোর মতো এক চৌকস জেনারল ছিলেন বলে।

বক্‌সারের যুদ্ধে নবাব সুজাউদ্দৌলাকে হারিয়ে ইংরেজদের প্রেসটিজ চড়চড় করে বেড়ে গেল। সুজাউদ্দৌলা নিজে একটা ধুরন্ধর যোদ্ধা, তাঁর সৈন্যবল প্রচুর, যুদ্ধের উপকরণও কিছু মন্দ নয়। তার উপর মীর কাশিমের দৌলতে ইওরোপীয়ন অফিসর, গোরা পল্টন, আর তাদের হাতে তৈরি দেশী সেপাইও তিনি বড় কম পাননি। অর্থবল তাঁর এত বেশি যে, ইংরেজদের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। এ-হেন লোককে তিন ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্তরকম হারিয়ে দেওয়াতে ইংরেজদেব সর্বত্র জয়জয়কার পড়ে গেল। অযোধ্যার নবাবেরা তিনপুরুষে দিল্লির বাদশাদের উজির, দেশী সমাজে তাঁদের খাতির প্রায় বাদশারই সমান। ধনে মানে প্রতিপত্তিতে নবাব সুজাউদ্দৌলার সমকক্ষ হিন্দুস্থানে তখন এক নাজীবউদ্দৌলা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তবে নাজীবউদ্দৌলার তখন হয়ে এসেছে—প্রায় শেষ অবস্থা, আর সুজাউদ্দৌলার তখন একাদশে বৃহস্পতি লাগার দশা। সেই সুজাউদ্দৌলাই কিনা বক্‌সাবের যুদ্ধে একমুঠো টুপিওয়ালাদের কাছে হেরে গিয়ে ছন্নছাড়া ভবঘুরে? লোকে ইংরেজদের যে অতঃপর খানিকটা সমীহ করে চলবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আর আছে?

পলাশীর যুদ্ধের পরেও ইংরেজরা ব্যবসাদারের কোঠা থেকে বেশি-কিছু উঁচু স্তরে উঠতে পারেনি, তখনো তারা যে আড়তদারকে সেই আড়তদার। আর তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রও ছিল সুবে বাংলার—অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার—চতুঃসীমার মধ্যে। উড়িষ্যা বলতে তখন অবশ্য কেবল মেদিনীপুর জেলাকেই বোঝাত, কারণ আসল উড়িষ্যা তখন মারাঠাদের কবলে। নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের ঐ সুবে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করে একেবারে নির্মূল করারই মতলব নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেবেছিলেন। জিততে পারলে অবশ্য তাদের যে সমুদ্র-পার করে দিয়ে আসতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের ঘাঁটাতে গিয়ে ফলে হল যাকে বলে খাল কেটে ঘরে কুমির ডেকে আনা। সুখ করতে গিয়ে শেষে সোয়াস্তিটুকুও গেল। বক্‌সারের যুদ্ধ জিতে ইংরেজরা কেবলমাত্র সুবে বাংলারই হর্তাকর্তা হয়ে বসল না, তাদের অধিকার

প্রায় এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তার পর সেখান থেকে ক্রমশঃ সমস্ত উত্তরাপথে ঢোকবার পাসপোর্টও তাদের হাতে এসে গেল। দিল্লির বাদশাও সুজাউদ্দৌলার হাতছাড়া হয়ে গিয়ে ইংরেজদেরই হাতধরা হয়ে পড়লেন।

তার পর থেকে ইতিহাসের যে-স্রোত ভারতবর্ষে বইতে লাগল, সেই স্রোতে মোগল পাঠান মারাঠা জাঠ শিখ সবাই এক এক করে ভেসে গিয়ে কোথায় তলিয়ে গেল, আর ঐ একই স্রোত আবার ইংরেজদের সবরকটা গ্রহকেই ঠেলে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে তুঙ্গে চড়িয়ে দিল—কেউই আর তাদের রুখে উঠতে পারল না।

॥ ত্রিশ ॥

এবার উপসংহারে বক্সার-যুদ্ধের পরবর্তী কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে এই প্রবন্ধের সংগতি রক্ষা করা দায় হয়ে উঠবে। তবে সে-কাজটা সংক্ষেপে সারলেও চলবে, কেননা আসল প্রসঙ্গের সঙ্গে ঐসব ঘটনার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু তা না হলেও তবু সম্পর্ক যেটুকু আছে, সেটাকে নেহাত দূরসম্পর্ক বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। দিলে, বক্তব্যটা একটু খাপছাড়া হয়েই থাকবে বলে ভয় আছে। তাইতেই পুঁথি আরো খানিকটা বাড়াতে হচ্ছে।

ভালোমানুষ ব্যক্তিদের এমনি অদৃষ্ট যে সব সময়েই তাঁরা কোণঠাসা হয়ে থাকেন। হেনরী ভ্যান্‌সিট্যার্ট কিছুতেই আর নিজেকে কলকাতা কাউন্সিলে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে তিনি অনেক আগেই কাজ ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন, শুধু মীর কাশিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তাঁকে কিছুদিন থেকে যেতে হল। বক্সারের যুদ্ধ শেষ হবার মাস দেড়েক পরেই ভ্যান্‌সিট্যার্ট কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে চললেন। মাঝ-দরিয়ায় ক্লাইভের সঙ্গে তার দেখা। দ্বিতীয় বার কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ক্লাইভ তখন বঙ্গদেশে চলেছেন। তখন তিনি আর কর্নেল ক্লাইভ নন, একেবারে লর্ড রবার্ট ক্লাইভ, ব্যারন অভ্ প্ল্যাশী।

ক্লাইভ এদেশ থেকে যা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে বুদ্ধিমানের মতো তার খানিকটা দিয়ে তিনি কি স্বনামে আর কি বেনামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলো স্টক কিনে ফেলেছিলেন। ফলে দেখতে দেখতে কোম্পানীর সব ব্যাপারে, বিশেষ করে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়ে, তিনি একটা মস্ত বড় পাণ্ডা হয়ে পড়লেন। বিলিতী সমাজে তখন গায়ের জোরের চেয়ে ভোটের জোরের বেশি কদর হতে আরম্ভ হয়েছে। পারলামেন্টের মতো অন্যান্য বৃটিশ প্রতিষ্ঠানেও হাত তুলেই জয় করতে দেখা যাচ্ছিল, হাত চালাবার আর তত দরকার হচ্ছিল না। ক্লাইভ যে ফন্দি বের করেছিলেন তাতে কোম্পানীর স্টকহোলডারদের মিটিংয়ে তাঁর দিকে হাত তোলার লোকের কোনোই অভাব রইল না।

এই সময় বাংলাদেশ থেকে একটার-পর-একটা করে যুদ্ধজয়ের খবর পেতে পেতে, খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে, কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মাথাটা একটু গুলিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কোন-না চুটিয়ে ব্যবসা করে যাবেন তা নয়, তাঁদের কর্মচারীরা বাড়তে বাড়তে কোম্পানীকে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলছে, তা কে জানে? তাঁরা হলেন জাতব্যবসায়ী, রাজত্ব করা কি তাঁদের সাজে? সত্যিমিথ্যে নানারকমের বার্তা পেতে পেতে কোম্পানীর স্টকহোলডাররাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ক্লাইভকে গিয়ে ধরে পড়লেন, তিনি যদি দয়া করে ঐ ডামাডোলের বাজারে গভর্নর হয়ে আবার বঙ্গদেশে ফিরে যান, তাহলে সবদিক রক্ষা পায়, নচেৎ কোনদিন পার্লামেণ্ট বিরক্ত হয়ে উঠে নির্ঘাত কোম্পানীকে কোম্পানীই উড়িয়ে দিয়ে বসবেন।

যাবার ইচ্ছে ক্লাইভের যদিও ষোলআনা ছেড়ে আঠারোআনা, তবু স্বদেশে ভালো করে খুঁটি না গেড়ে তিনি বিদেশে আর একপাও বাড়াতে রাজী নন। সামনেই স্টকহোলডারদের নতুন ডিরেক্টর বাছাই করবার সময় এসে পড়ছে, কে কে ডিরেক্টর হন তা না দেখে, ক্লাইভ হ্যাঁ না স্পষ্ট কিছুই বলতে চাইলেন না। অবশেষে ইলেকশন হয়ে যেতে দেখা গেল, ভোটে জিতে যেসব ব্যক্তি ডিরেক্টর হয়েছেন, তাদের অনেকেই উপর ক্লাইভের হাতধরা লোক। ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, যে দুজন হলেন, তাঁরা ক্লাইভের বিশেষ অনুগত বন্ধু। এই বার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই লর্ড ক্লাইভ জাহাজে চড়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে পাড়ি মারলেন।

পাকা গভর্নর না আসা পর্যন্ত ভ্যানসিটার্টের জায়গায় জন্ স্পেনসার একটিনি করলেন। ভ্যানসিটার্টের মতো স্পেন্সারও বেঙ্গল-সিভিলিয়ান নন, বম্বে-সিভিলিয়ান, সবেমাত্র কলকাতায় পদার্পণ করেছেন। স্পেনসারের বঙ্গদেশের হালচাল ততটা রপ্ত ছিল না বলে কলকাতার কাউন্সিলে জন্ জনস্টোন নামের এক মেম্বরের খুব প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর গলার জোর প্রচুর ছিল, তারই বলে তিনি সব বিষয়েই মেম্বরদের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন, খুবই তার নাম ডাক। গায়ের জোরের মতো গলার জোরও যে মানুষের একটা মস্ত বড় সম্পদ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তখন পুরনো কাউন্সিলররা বড় একটা কেউ কলকাতায় ছিলেন না, তাই সহজে আগেকার চেনামুখ আর চোখে পড়ে না। অনেকেই রিটায়ার করে গেছেন, কেউ-কেউ কাজে ইস্তফাও দিয়েছেন, দু-চার জন আবার ছুটিতে দেশে আছেন। বছর (১৭৬৪) কাবার হবার আগেই ওয়ারেন হেস্টিংসও কাজ ছেড়ে দিলেন। যদিও সেই সময়ের

অন্য অনেকেরই তুলনায় তিনি তেমন-কিছু পয়সা করে উঠতে পারেননি, তবু অল্পে সন্তুষ্ট থাকা তাঁর স্বভাব হওয়ার দরুন তিনি ঐ ভাগাড়ের শকুনিদের মধ্যে আর থাকতে রাজী হলেন না, ঘরেই ফিরে গেলেন। জন্‌স্টোনের দাপদাপানি আরো বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে দেখতে দেখতে নবাব মীর জাফরের স্বাস্থ্য এমনি ভেঙে পড়ল যে, শরীর আর টেঁকে না। তিনি মুর্শিদাবাদ ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। আর তাঁকে পেড়াপীড়ি করা চলে না দেখে, স্পেন্‌সার-সাহেব তখনকার মতো তাঁকে রেহাই দিলেন, অর্থাৎ স্বস্থানে ফিরে যেতে দিতে আর আপত্তি ওঠালেন না। মীর জাফর নন্দকুমারকে সঙ্গে নিয়ে ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সেখানে ফিরে গিয়ে মীর জাফর মাস দেড়েক বেশ ভালোই ছিলেন। সেটা জলহাওয়ার গুণে, কি সুচিকিৎসার ফলে, না তাঁর ত্রাণকর্তা ক্লাইভ শিগ্‌গিরই গভর্নব হয়ে আবার বঙ্গদেশে ফিরে আসছেন, তারই স্ফূর্তিতে—কিছুই জোর করে ঠিক বলা যায় না। তবে দেখা গেল যে, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে বসে আবার নন্দকুমারের সঙ্গে রাজকার্যের পরামর্শ চালাচ্ছেন, হিসাবপত্রেরও মোকাবিলা কবছেন।

তবে বুড়ো বয়সে সহজে তো আর ভাঙা শরীর জোড়া লাগে না। নতুন বছরের (১৭৬৫) জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে মীব জাফরের শরীর আবার খারাপ হতে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার আর তাঁকে সেরে উঠতে হবে না। তাই বাংলার নবাবী গদির একটা বিলিব্যবস্থার জন্যে তিনি বড়ই উতলা হয়ে পড়লেন। তাঁর থাকবার মধ্যে আছে, একদিকে মীরনের ছ-বছর বয়েসের এক শিশুপুত্র, মীর সৈইদ, অন্যদিকে তাঁর নিকে-করা বেগম মুন্নীবিবির বড়ছেলে, নজমউদ্দৌলা, বছর সতেবো যাঁর বয়েস। ঐ দুজনের মধ্যেই টানাটানি পড়ে গেল—কাকে রেখে কাকে ছাড়া যায়?

মুন্নীবিবি কুলে কিঞ্চিৎ খাটো হলেও বুদ্ধিতে অনেক পুরুষমানুষকেও হার মানান। মুমূর্ষু মীর জাফরের সাধ্য কি যে তাঁর প্রভাব এড়ান? নবাবকে দিইয়ে মুন্নীবেগম বড় বড রাজপুরুষদের সবাইকে ডাকিয়ে পাঠালেন, নবাব-দরবারের ইংরেজ রেসিডেন্ট ন্যাথানিয়ল মিড্‌লটনকে আর কাশিম-বাজারের ইংরেজ কুঠির সর্দারদেরও আনিয়ে নিলেন। জালের পর্দার আড়াল থেকে তিনি সব দিকে চোখ রেখেছেন। সবাইকার সামনেই বাদশার দেওয়া সুবেদারির খেলাতী পোশাক বের করে মীর জাফর সেটা নজম-

উদ্দৌলাকে পরিয়ে দিয়ে, হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বাংলার মসনদের উপর বসিয়ে দিলেন। সভাসদরা সকলেই একে একে পকেট থেকে নজরআনা বের করে তাঁর সামনে ধরতে লাগলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়াতেই মীর জাফর একেবারে শয্যা নিলেন। সেই হল তাঁর অন্তিমশয্যা। কৃতকর্মগুলো এক এক করে মনে পড়ে তার বিবেককে মোচড় দিতে লাগল কি না জানিনে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নন্দকুমারের পরামর্শে পাপমোচনের ভরসায় তিনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ দেবী কিরীটেশ্বরীর পাদোদক মাথায় ঠেকিয়ে যে গণ্ডূষ করলেন, সেটা কিন্তু সকলেই দেখল। সেই তাঁর শেষ জলগ্রহণ। তাতে তার পাপক্ষয় হয়েছিল কি না, সেটা অবশ্য ইতিহাসের কোনো বই থেকে জানতে পারা যায় না। পাপপুণ্যের রহস্য ভেদ করা তো ঠিক ইতিহাসের কাজ নয়?

ধীরে ধীরে মৃত্যু এগিয়ে এসে মীর জাফরকে পৃথিবীর সব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে গেল। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫ বেলা সওয়া-একটা। তখন মীর জাফরের বয়েস আন্দাজ পঁচাত্তর বছর। গোর দেবার জন্যে আগের থেকেই একটা আনকোরা জায়গা ঠিক করা ছিল। আলীবর্দী খাঁ আর সিরাজ-উদ্দৌলার কবরখানায় যে তাঁকে মাটি দেওয়া হয়, সেটা মীর জাফরের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। তাই তাঁর পছন্দকরা নতুন জায়গাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। আর মাত্র তিন মাস কাল জীবিত থাকলে ক্লাইভের সঙ্গে তাঁর একবার শেষ চোখের দেখা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু যা হবার নয় তা আর হয় কি করে?

মীর জাফর আলীবর্দী খাঁ আর সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বেইমানি করলেও ক্লাইভের উপর তার প্রাণের টান কিন্তু শেষ পর্যন্ত টনটনে ছিল। মৃত্যুর আগে সাঙ্গোপাঙ্গ ডাকিয়ে এনে তিনি তাদের সামনে ক্লাইভের উদ্দেশে এক মৌখিক উইল করে তাঁকে পাঁচ লাখ টাকা দান করে গেলেন। ওর মধ্যে ভিতর থেকে মুন্নীবিবির কোনো হাত ছিল কি না, তা কে জানে? তবে অত টাকা যে মীর জাফরের সিন্দুকে ছিল না, সেটা অবশ্য জানা কথা। কলকাতায় ফিরে ক্লাইভ যখন সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ যান তখন মুন্নীবিবিই সে-টাকা জেনানার ভিতর থেকে বার করে এনে নজমউদ্দৌলার হাত দিইয়ে ক্লাইভের হাতে তুলে দেন। সে যাই হোক, ক্লাইভের তখন গনগনে অবস্থা—একে লর্ড তায় টাকার আণ্ডিল—সামান্য পাঁচ লাখের জন্যে তিনি ছুঁচো মেরে হাতগন্ধ করতে চাইলেন না। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অনাচার-অপচার সাফ করার

জন্যেই তো তিনি দেশের সুখশান্তি ছেড়ে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এসেছেন, তিনি কি বলে আর ঐ টাকাটা পকেটস্থ করবেন? ক্লাইভ সে-টাকা দিয়ে একটা ফাণ্ড খুলে, তার সমস্ত আয় দুস্থ আর মৃত ইংরেজ সৈন্যদের পরিবারবর্গের সেবায় উৎসর্গ করে দিলেন।

ক্লাইভ বঙ্গদেশে এসে পড়বার আগেই—যদিও তখন সবাই জানে তিনি এসে পৌঁছলেন বলে—গভর্নর স্পেন্সার তাঁর কাউন্সিলরদের সঙ্গে একজোট হয়ে তাড়াহুড়ো করে নজমউদ্দৌলাকে নবাব বলে মেনে নিয়ে, তাঁকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন। এই জন্যে নতুন নবাবকে কাউন্সিলর-সাহেবদের জল খেতে যে-টাকা বের করে দিতে হয়েছিল, তার পরিমাণ প্রায় বিশ লাখ। জনস্টোন কাউন্সিলের মেম্বরদের পক্ষ থেকে অগ্রণী হয়ে ঐ লেনদেন ব্যাপারে নবাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিলেন বলে গভর্নর স্পেন্সারের সঙ্গে সমান ভাগ দু-লাখ তো পেলেনই, তার উপর আরো সাঁইত্রিশ হাজার টাকাও তিনি হাতাতে পেরেছিলেন। তার ছোট-ভাই, যিনি না কাউন্সিলর, না কোম্পানীর কোনো কর্মচারী, তিনিও মৎফরক্কা বাট হাজার মেরে দেওয়াতে লোকে সন্দেহ করে, সেটাও সিনিয়র জনস্টোনেরই গর্ভে গিয়েছিল। আসলে মজার কথা এই যে, ঐ মহাত্মাই একদিন সাধুগিরি ফলিয়ে মীর কাশিমের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার কথা তুলে, বক্তৃতার চোটে গভর্নর ভ্যানসিটার্টকে চোখে সরষে ফুল দেখাবার জোগাড় করেছিলেন।

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, মাত্র তেরো দিন আগে ডিরেক্টরদের হুকুম এসে গিয়েছিল যে, কোম্পানীর কোনো কর্মচারীই ডিরেক্টরদের সম্মতি ছাড়া এদেশের রাজারাজড়া নবাব-বাদশা আমীর-ওমরা কারো কাছ থেকে চার হাজার টাকার বেশি দামের উপহার, জমিজিরাৎ, জাইগির, খাজনাজমা ইত্যাদি নিতে পারবে না, আর ঐ মর্মে তাদের প্রত্যেককেই দু প্রস্থ করে মুচলেকা সই করে দিতে হবে, তার একটা থাকবে কাউন্সিলের দপ্তরে, আর একটা চলে যাবে লণ্ডনে ডিরেক্টরদের অফিসে। কিন্তু কর্মচারীরা ভাবলে, ডিরেক্টররা তো সেই সাত হাজার মাইল দূরে, এখন হাতের কাছে যা আসছে তাকে তো আসতে দাও, মুচলেকা-ফুচলেকা ওসব পরে দেখা যাবে। এক আকাট মুখ্যু ছাড়া কে-আর সেধে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে?

৩রা মে ক্লাইভ কলকাতায় নেমে ঠিক তার দুদিন পরেই কাউন্সিলের মিটিং ডাকলেন। ইতিমধ্যে কাউন্সিলের কনশলটেশনের পুরনো মিনিটস্ সব আগাগোড়া পড়ে তৈরি হয়ে নিলেন। মেম্বররা মনে করেছিলেন, গভর্নর

ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে তাঁরা এতদিন যেমন ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করে এসেছেন ক্লাইভের সঙ্গেও ঠিক সেই রকমই করতে পারবেন। কিন্তু সভা ভালো করে জমবার আগেই ক্লাইভ সবাইকে ধরে এমন এক জবরদস্ত দাবড়ানি দিয়ে বসলেন যে, তাতেই সবইকার থোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল। মানুষ তো চিরকালই শক্তের ভক্ত। তার পর থেকে যে দু বছর ক্লাইভ কলকাতার গভর্নর ছিলেন কাউন্সিলরদের কাছ থেকে তাকে আর কেমন-কিছু বেগ পেতে হয়নি।

ক্লাইভ কলকাতায় পা দেওয়া অবধি পুরো ডিক্টেটরি চালে চলতে আরম্ভ করে দিলেন। যাঁরাই তাঁদের উপরওয়ালাদের হাত করতে পারেন তারা সবাই এক-একটা ছোটখাটো ডিক্টেটর হয়ে বসেন, এটা সব দেশে সব সময়েই দেখা যায়, মুখে কেউ সেটা স্বীকার করুন বা নাই করুন। তার উপর ক্লাইভ নিজেকে তো সবার চেয়ে এত উঁচু স্তরের লোক বলে মনে করতেন যে, কি দিশি আর কি বিলিতী, কাউকেই তিনি বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাইতেন না, সবাই যেন তাঁর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস।

তা ছাড়া অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতো ক্লাইভও বেশ ভালো করেই জানতেন, ডেমক্র্যাসি অটোক্র্যাসিরই আর এক নাম। জুলুমবাজি ঘোড়দৌড়ে দুটোই সমান-সমান জুড়িছোটে। তাই তিনি কাউন্সিলে বসেও কাউন্সিলরদের একেবারে অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। কাউন্সিলের প্রথম দিনকার সভার বর্ণনা দিয়ে ক্লাইভ তাঁর প্রাণের বন্ধু জন কারণাককে যে চিঠি লিখেছিলেন তার শেষের দিকে তিনি আক্ষেপ করে বলছেন—হায় রে হায়! ইংরেজদের সুনামের কি দশাই না হল? কোথায় গিয়ে সব ডুবল? যাই হোক, আমি যতদিন গভর্নর আছি অনাচার আর একতিলও বাড়তে দিচ্ছি না। হয় এসব নির্মূল করে ছাড়ব নয় এই কাজেই প্রাণপাত করব। পড়ে মনে হয়, এ যেন ঠিক মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতনের প্রতিজ্ঞা। ক্লাইভের ঐ খেদোক্তির উপর টিপ্পনী কেটে কিন্তু অনেক ইংরেজও লিখেছেন, এ যে শুনি ভূতের মুখে রামনাম? আসল কথা এই যে, নিজের পেট ভরা থাকলে মানুষ তখন অপরকে শোধরাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়, তখন নিজের দোষ অপরের মধ্যে দেখলে কিছুতেই সেটা আর সে বরদাস্ত করতে পারে না।

কারন্যাক তখন উত্তরপ্রদেশে ক্যাম্পে আছেন। কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হয়েও তাঁর চাকরি যায়নি। স্বয়ং ক্লাইভ যাঁর মুরুব্বি তাঁর চাকরি খায় কে? কথাই তো আছে, খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। খুঁটির জোর থাকলে এই সংসারে অনেক মেড়াকান্তকেই তো তরে যেতে দেখা যায়।

কারন্যাকের চাকরি তো গেলই না, উপরন্তু তাঁর পদোন্নতি হল। তিনি এখন আর কর্নেল নন, একেবারে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল। মেজর মান্‌রো তাঁর কাজ শেষ করে স্বদেশে ফিরে যাওয়াতে কারন্যাকই আবার কোম্পানীর ফৌজের সর্বেসর্বা।

এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ পৌঁছেই ক্লাইভ মীর জাফরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছিলেন। পেয়ে তিনি যে মনে মনে খানিকটা আরাম বোধ করেছিলেন, সে-কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। কারণ মীর জাফরকে আর ঘাড়ে করে বেড়ানো ইংরেজদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল। ক্লাইভ যে-সংকল্প করে পুনবার বঙ্গদেশে এসেছেন মীর জাফর নবাব থাকলে তাঁর সে-সংকল্প কাজে ঘটিয়ে তোলা খুবই কষ্টকর হত। ক্লাইভ ঠিক করে রেখেছিলেন, এবার বাইরে নবাবী ঠাট বজায় রেখে ভিতর থেকে তিনিই রাজত্ব করে যাবেন। তখনো আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজদের পুরোদস্তুর রাজা হয়ে দেখা দেবার সময় আসেনি। জোর করে তা দেবার চেষ্টা করলে শুধু এদেশের নয় ইওরোপেরও রাজন্যবর্গ সবাই একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাবেন—এই ছিল ক্লাইভের দারুণ ভয়।

মীর জাফরের দেহান্তের খবর পেতেই তিনি স্থির করে নিলেন, মীরনের শিশুপুত্র মীর সৈইদুকে নবাবের গদিতে বসিয়ে তিনিই তাঁর গার্জেন হয়ে বাংলার সুবেদারি চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তাঁর মনের সাধে বাদ সাধলেন গভর্নর স্পেন্‌সার আর তার কাউন্সিলররা। কিন্তু তাঁদের দোষ কি? মীর সৈইদুকে নবাব করলে তাঁদের পকেটে তো একটি পাইপয়সাও আসত না, কারণ সৈইদুর এমন-কেউ সহায় ছিলেন না যে, যিনি একসঙ্গে অত টাকা নগদ বের করে দিতে পারেন। কাউন্সিলরদের কেউই তো ক্লাইভের মতো লাট হয়ে বসেননি, তাঁরা কোন্ বুদ্ধিতে ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পিছনে ছোটাছুটি করেন? দুদিন পরেই ক্লাইভ কাউন্সিলরদের কাণ্ডকারখানা জানতে পেরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁরা যে তাঁর সমস্ত প্ল্যানই মাটি করে দিয়ে বসে আছেন।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় নেমেই ক্লাইভ নজমউদ্দৌলার এক চিঠি পেলেন, তাতে নতুন নবাব লিখছেন যে, তিনি লর্ড ক্লাইভকে সেলাম জানাতে কলকাতায় আসছেন। আসলে তিনি আসছেন মহম্মদ রেজা খাঁকে যাতে তাঁর ঘাড় থেকে নামাতে পারেন তারই চেষ্টায়। স্পেন্‌সার যখন নজম-উদ্দৌলাকে বাংলার গদিতে বসান তখন তাঁর সঙ্গে একটা লিখিত-পড়িত কড়ার

করে নিয়েছিলেন যে, কাউন্সিলের পছন্দমাফিক লোক ছাড়া নবাব আর কাউকে নায়েব-স্থবা অর্থাৎ ডেপুটি গভর্নর করতে পারবেন না। নজমউদ্দৌলার বড়ই ইচ্ছা, নন্দকুমার তাঁর ডেপুটি হয়ে বসেন, মীর জাফরও মরবার আগে সেই উপদেশই দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাউন্সিল তাতে রাজী হননি। নন্দকুমার বাইরে ইংরেজদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রেখে চললেও ভিতরে-ভিতরে যে তাদের উচ্ছেদ কামনা করেন, সেকথা ইংরেজদের কাছে তখন আর গোপন ছিল না, ধরা পড়ে গিয়েছিল। স্থতরাং নন্দকুমারকে তাদের পছন্দ হবার কথা নয়। পাছে ঐ নিয়ে নন্দকুমার কোনো গোলোযোগের সৃষ্টি করেন তাই তাকে ধরে-বেঁধে কলকাতায় এনে ফেলা হয়েছিল। কাউন্সিল নন্দকুমারের বদলে যাঁকে নায়েব-স্থবা করা স্থির করলেন তিনি হলেন ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ রেজা খাঁ। রেজা খাঁর অন্য আর কি কি সদ্‌গুণ ছিল তা জানিনে, কিন্তু সর্বদোষহারিণী টঙ্কা-দেবীর যে তাঁর উপর অশেষ কৃপা ছিল, সেটা সকলেরই জানা কথা। তাঁর প্রসাদে রেজা খাঁর হাতে আর-কিছু না থাক পয়সার যাদুমন্ত্র যে ছিল, তার প্রমাণ অতি শিগ্‌গিরই টের পাওয়া গেল। অচিরেই দেখা গেল, ঐ যাদুবলেই তিনি কাউন্সিলরদের বশ করে ফেলেছেন। নিলামের ডাকে নন্দকুমার তার ত্রিসীমানার কাছ ঘেষতেও পারলেন না।

ক্লাইভ কলকাতায় আসছেন জেনে রেজা খাঁও তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উৎস্থক হয়ে উঠলেন। নবাবের কাছে কলকাতা যাবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু আরজি মঞ্জুর হল না। ক্লাইভ কলকাতায় এসে পড়তে রেজা খাঁ সরাসরি তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি গভর্নর-সাহেবের দর্শনপ্রার্থী। আসল নবাব তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। স্থবেদার আর নায়েব-স্থবা দুজনে একসঙ্গেই কলকাতায় পৌছলেন।

সতেরো বছরের ঐ ছোকরা-নবাবের চেহারা দেখে, আর তাঁর কথাবার্তা শুনে, ক্লাইভ খানিকটা ধাতস্থ হলেন। ঐ মেদামারা হাঁদা-গঙ্গারামকে বাংলার মসনদে নবাব হয়ে বসতে দেখে তাঁর রাগটা পড়ে এল, স্পেন্‌সারদের বন্দোবস্তটাকে তিনি আর নাকচ করে দিলেন না। তবে জেরা করে লেনদেন ব্যাপারটার আসল ঘটনা নজমউদ্দৌলার কাছ থেকে তন্নতন্ন করে বের করে নিলেন। রেজা খাঁও যে নায়েব-স্থবার পদের জন্যে কাউন্সিলরদের বিশ লাখ টাকার নজরআনা দিয়েছেন, সে-কথাটাও চাপা রইল না, বেরিয়ে পড়ল। ক্লাইভ কিন্তু রেজা খাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবে নজমউদ্দৌলা তাঁকে রাখতে চান না বলেই ক্লাইভ তাঁকে তাঁর নতন পদ থেকে একেবারে হটালেন

না, তবে চেনা লোক মহারাজা দুর্লভরাম ওরফে রয় দুলুভকে রেজা খাঁর সঙ্গে কাজে জুড়ে দিলেন, অর্থাৎ তাঁর পিছনে লাগিয়ে রাখলেন। ক্লাইভ গভর্নর হয়ে আসছেন শুনেই দুর্লভরাম তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন, সে-চিঠি ক্লাইভ কলকাতায় পা দিতেই হাতে হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিটা সেকালের ফার্সী ঢঙে লেখা হলেও একালের কাজ-আদায়ের চিঠিগুলোর মডেল হতে পারে: বিধাতার আশীর্বাদ স্বর্গ থেকে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে এসে যেমন শুকনো পোড়ামাটিকে সরস তাজা করে তোলে, শীতের খড়খড়ে হাওয়ার পর মধুবসন্তের ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে থাকলে তা যেমন পৃথিবীকে নানা ফুলেফলে সাজিয়ে দিয়ে চারদিক গন্ধেবর্ণে উজ্জ্বল করে তোলে, তেমনি আপনার এখানে আগমনসংবাদ পেতেই আমার মরন্ত প্রাণে ফিরে আবার ভরসার জোয়ার ডেকে গিয়ে আমায় পুনর্বার জীবন্ত করে তুলেছে।

এর পর ক্লাইভ চটিয়ে তার মনের ঝাল ঝাড়লেন কাউন্সিলরদের উপর। কাউন্সিলের সভায় বসেই নজমউদ্দৌলা আর রেজা খাঁর কাছ থেকে টাকা বাগাবার জন্যে তাদের উপর ঝেড়ে তাইশ শুরু করে দিলেন। অন্য সবাই কিছু না বলে মাথা হেঁট করেই রইলেন। কিন্তু জনস্টোন কনশলটেশনের বইটা টেনে নিয়ে তারই এক পাতায় মিনিট লিখলেন—এসব বিষয়ে তাঁদের শিক্ষাগুরু মান্যবর লর্ড ক্লাইভ নিজেই। তিনিই তাদের যে-পথ দেখিয়েছেন, সে-পথেই তারা চলেছেন, অন্যায় কিছু করেছেন বলে তো মনে হয় না। অবশ্য এর পর জন্ জনস্টোন যে আর চাকরিতে টিঁকে থাকতে পারলেন না, সে কথা বোধ হয় খুলে বলে না দিলেও বুঝে নিতে কারো কষ্ট হবে না। কোম্পানীর নিয়মাবলীতে যদিও বলা-কওয়া ছিল যে, কাউন্সিলররা তাঁদের সত্যিকার মনোভাব সর্বদা নির্ভয়ে সভায় ব্যক্ত করতে পারবেন, কিন্তু করলে ফল যে কি হবে, তার কোনো ইঙ্গিত নিয়মাবলীর কোনো ধারাতেই দেওয়া ছিল না। তা করতে গেলে পরিণাম যে কি ঘটে, সেটা তো চোখের উপরেই দেখা গেল।

তবে ঐ সঙ্গে একটা কথা বলার দরকার যে, ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে যেমন টাকা খেয়েছিলেন, তেমনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে, যুদ্ধের সমস্ত-কিছু ঝুঁকি নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি মীর জাফরের কাজ হাসিল করে দিয়েছিলেন। স্পেন্সার-জনস্টোনরা কেবল মীর জাফরের ওয়ারিশানী বন্দোবস্তে সায় দিয়েই লাখো-লাখো টাকা অমনি-অমনিই পকেটে পুরে ফেললেন। আর রেজা খাঁকে নায়েব-সুবা করে যে টাকাটা তাঁরা লাভ করেছিলেন, সেটাকে সাধুভাষায় যা বলেই বর্ণনা করা যাক না কেন, সাদা

বাংলায় তার নাম যে ঘুষ, সে-বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আর সে-ঘুষ আবার ডিরেক্টরদের এ-বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সব জেনেশুনেই নেওয়া। ক্লাইভের সময় এক ধর্মবোধ ছাড়া ওসব বিষয়ে অন্য কোনো মানা ছিল না। কিন্তু ধর্মবোধ তো কেবল সামান্য লোকেদেরই পক্ষে বাধা, ক্লাইভের মতো ভাগ্যবানদের কাছে সেটা কোনো কাজেরই নয়।

বঙ্গদেশে ইংরেজদের সরকারী কাজ পরিপাটী করে চালাবার জন্যে ডিরেক্টররা আগের থেকেই কাউন্সিলের এক সিলেক্ট কমিটিরই উপর পুরো ভার দিয়ে রেখেছিলেন, এখন ক্লাইভ সে-কমিটি নিজের অনুগত লোক দিয়েই পুরো করে নিলেন। দেখা গেল কাজ করছেন সিলেক্ট কমিটি, কিন্তু আসলে কার হুকুমে যে কাজ চলছে, সেটা বুঝতে ছেলে-বুড়ো কারো বাকি রইল না। ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে হালের ডেমোক্র্যাটিক সভাসমিতির আদল বড় কম আসে না। কিন্তু তা না হলে কাজও-বা চলে কই? অথচ নামেরও তো একটা মোহ আছে, সেটাকেও তো কিছু একেবারে ছেঁটে ফেলে দিতে পারা যায় না? ক্লাইভের কপালগুণে তিনি দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে বসবার অল্প দিনের মধ্যেই কাউন্সিলও অনেক খালি হয়ে গেল। পুরনো মেম্বরদের কেউ-কেউ রিজাইন করলেন, কেউ কেউ ডিসমিস্‌ড হলেন, ওর মধ্যে একজন আবার আত্মহত্যাও করে বসলেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কজন সিভিলিয়ন আনিয়ে নিয়ে কাউন্সিল ভর্তি করে ফেললেন। তাঁরা নতুন লোক, ক্লাইভের মুখ চেয়েই তাঁদের দিন কাটতে লাগল, সুতরাং এর পর ক্লাইভের আর তেমন কোনোই অসুবিধা রইল না। তিনি বঙ্গদেশের ইংরেজ-মহলে একছত্র চক্রবর্তী হয়েই বসে রইলেন।

॥ একত্রিশ ॥

ইতিমধ্যে মেজর মান্‌রো কাজ অনেকটা গুছিয়ে আনতে পেরেছিলেন। বক্‌সারের যুদ্ধ খতম হবার পর তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি, লড়াইটাকে উত্তরপ্রদেশে সুজাউদ্দৌলার নিজের সুবেদারিতে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজদের একটা সুবিধাও হয়ে গিয়েছিল। বক্‌সারের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার সময় নবাব সুজাউদ্দৌলা বাদশা শা আলমকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলে যাওয়াটা একটুও বিচিত্র নয়, কারণ শা আলম রণাঙ্গন থেকে অনেকটা তফাতেই গিয়ে তাঁর আস্তানা গেড়েছিলেন, পারতপক্ষে লড়াইয়ে নাবেননি। উজির তাঁকে ফেলে পালালেন দেখে, বাদশা যেন একটু খুশিই হয়ে উঠলেন। ইদানীন্তন উজিরের বগলদাবা হয়ে থাকতে তাঁর সত্যিই বড় কষ্ট হচ্ছিল, উজিরের হাত থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তাঁর প্রাণ ছটফট করছিল। গর্বে আত্মহারা হয়ে উঠে সুজাউদ্দৌলা বাদশাকে আর বাদশা বলেই জ্ঞান করছিলেন না, নিজেকে বাদশার সমকক্ষ ভেবে নিয়ে শা আলমকে বেশ-খানিকটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেই চলছিলেন।

বক্‌সারের মাঠেই শা আলম ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন। আর যাই হোক ইংরেজরা তাঁকে বরাবরই প্রচুর সম্মান দেখিয়ে এসেছে, কখনো আকারে-ইঙ্গিতেও তাঁকে এতটুকু হেনস্তা করেনি। গঙ্গা পেরিয়ে কাশীতে পৌঁছে তিনি ইংরেজদের ছাউনির পাশেই নিজের ক্যাম্প পাতলেন। মেজর অ্যাডামস যেমন মীর জাফরের নামেই মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন, মেজর মান্‌রো এবার ঠিক সেই রকম বাদশা শা আলমের নামেই সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে বাখা স্থির করলেন। ইংরেজরা বাইরে থেকে দেখতে চকচকে পালিশ-করা জাত, ওদিক দিয়ে কেউ তাদের ধরতে-ছুঁতে পারবে না। অতঃপর উত্তরপ্রদেশে ইংরেজরা যা কিছুই করতে লাগল কাগজে-কলমে তা সবই বাদশার নাম দিয়ে, বাদশারই পক্ষ হয়ে। ইংরেজরা যেন শুধু তাঁর আজ্ঞাধারী কর্মচারীমাত্র।

শা আলম শিগ্‌গিরই এক প্রক্‌লামেশন ঝেড়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, সুজাউদ্দৌলা রাজদ্রোহী, বাদশা তাঁকে উজিরগিরি থেকে বরখাস্ত করেছেন।

অযোধ্যার সুবেদারিও সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে ফেবত নিয়ে বাদশা আপাততঃ ঐ সুবার ভাব নিজেরই হাতেই রাখলেন। আশে-পাশের জাইগিরদার জমিদার তালুকদারদেরও লিখে দেওয়া হল, সুজাউদ্দৌলাকে তারা যেন একপয়সাও আর খাজানা না দেন, ইংবেজদের উপরই খাজানা আদায় জমিজমার বিলিবন্দোবস্তের আমমোক্তারনামা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ প্রজাদের কাছে কিন্তু ইংরেজদের মান-সম্মান ঝাঁ-ঝাঁ করে বেড়ে চলল। কাশীর মতো জায়গায়, যেখানে যুগযুগান্তর ধরে মন্দিরে-মন্দিরে ধনরত্ন গাদা হতে-হতে পাহাড়প্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে, আর যেখানে লক্ষ্মীর কৃপায় ভাগ্যবান শেঠ-সওদাগরেব সংখ্যা গুণে ঠাওর কবে উঠতে পাবা যায় না, সেখানে লুঠের লোভ সামলানো হিন্দুদের পক্ষে ততটা কঠিন না হলেও মুসলমান সেপাইদের আর গোরা পল্টনদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু মেজর মান্‌রোর কড়া নজর থাকার দরুন একটুও এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। কাশীতে নেবেই তিনি ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন, কোনো সেপাই-পল্টন যদি তাদের ওপরওয়ালা অফিসরকে না জানিয়ে শহরে একবারও ঢোকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ইনডিসিপ্লিনের জন্যে দস্তুরমতো চাবকানি তো খাবেই, উলটে চাকরিও থাকে কি না সন্দেহ। আর যদি কাউকে লুঠতরাজ করতে দেখা যায়, তাহলে তো আর কথা না বাড়িয়ে তখনি তাকে গাছে লটকে দিয়ে তার ফাঁসি। লুটপাটের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে কাশীর মহাজনরা আপনা থেকেই মেজর মান্‌রোব হাতে ফৌজেব খরচ বাবদ চার লাখ টাকা তুলে দিলেন।

সুজাউদ্দৌলা অনেক চেষ্টা করেও ইংরেজদের সঙ্গে একটা কোনো আপসরফা করে উঠতে পারলেন না। মেজর মান্‌রো হচ্ছেন সেই ধাঁচের লোক যাঁরা যুদ্ধকার্য বেশ ভালোরকম চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু শান্তিস্থাপনের কলকৌশল যাঁদের একেবারেই আসে না। ফলে পুরোদমেই লড়াই চলতে লাগল। মানুষ একবার ভাগ্যহত হলে তার পক্ষে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ানো খুবই শক্ত। সুজাউদ্দৌলার অদৃষ্ট মন্দ দেখে তাঁর সেনাধ্যক্ষদের অনেকেই একে একে ইংরেজদের দিকে চলে গেলেন। অমন যখন অবস্থা তখন যুদ্ধ চালাবার সমস্ত বিলিব্যবস্থা ঠিক করে দিয়ে মেজর মান্‌রো কলকাতায় ফিরে চললেন, দেশ থেকে তাঁর ডাক এসেছে। নতুন কমাণ্ডার জেনারল কারন্যাক না এসে পৌঁছনো পর্যন্ত মেজর সার্‌ স্টবার্ট ফ্লেচর তাঁর হয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন।

মেজর ফ্লেচর আর তাঁর সঙ্গী মেজর স্টিবার্ট দুজনে মিলে সুজাউদ্দৌলাকে

হারাতে হারাতে তাঁকে একেবারে দেশছাড়া করে তবে ছাড়লেন। আত্মীয়স্বজন ধনদৌলত আর কতক নিতান্ত অনুগত সেপাইশাস্ত্রী নিে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের দেশে পালিয়ে গিয়ে আপাততঃ প্রাণে বাঁচলেন মানরো যাবার মাসখানেকের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশে ইংরেজদের রাস্তা সাফ। তখন কলকাতা থেকে জেনারল কারন্যাক এসে শুধু বুড়ি ছুঁয়ে রেখে দিয়ে, ফৈজাবাদে সুজাউদ্দৌলার বিরাট অট্টালিকা দখল করে সেইখানেই বসে গেলেন। সার উত্তরপ্রদেশে তখন ইংরেজদের আর একটিও শত্রু অবশিষ্ট নেই। সুতরাং ফপরদালালি করা ছাড়া কারন্যাকের হাতে অন্য কোনো কাজ রইল না। তাঁর বরাবরই একটু রাজকীয় ধবনের নাটকীয় হাবভাব। নবাব সুজাউদ্দৌলার মসনদে বসে গা এলিয়ে দিয়ে আয়েশ করতে করতে কারন্যাক নবাবী কেতায় দরবার চালাতে লাগলেন, আর যুদ্ধ করার চেয়ে যে-কাজ তাঁর আরো ভালো আসে সেই পলিটিক্স করার কাজেই ঢেলে মনোনিবেশ করলেন।

সাধারণ প্রজারা একাদিক্রমে ইংরেজদের অনুগত হয়ে পড়তে লাগল। অত বড় একটা ওলোটপালোট কাণ্ড ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও প্রজাদের উপর একটুও অত্যাচার নেই, তাদের টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তির উপর হাত দেওয়া নেই, কথায়-কথায় শির লেয়াও বলে কোথাও একটুও হাঁকডাক নেই—সবাইকে নির্ভয়ে আপন আপন কাজ করে যেতে দেওয়া হচ্ছে—এরকম তাজ্জব ব্যাপার আগে কখনো ঘটতে দেখা যায়নি। ব্যাপারটা এমনি সৃষ্টিছাড়ারকমের যে, সামান্য একটু লেখাপড়া-জানা লোক থেকে আরম্ভ করে ভারী-ভারী বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোকেরা পর্যন্ত সবাই, তা সে কি হিন্দু আর কি মুসলমান, তাঁদের চিঠিপত্রে কেতাব-পুঁথিতে, সরকারী রিপোর্ট-আখবরাতে ইংরেজদের এই অদ্ভুত কাণ্ডের কথা উল্লেখ করে গেছেন। কতক ব্যক্তি তাদের শত্রুদের বেকায়দায় ফেলবার জন্যে ইংরেজ কমাণ্ডারের দপ্তরে খবর জানাতে গিয়েছিল, দুশমনরা কোথায় কোথায় তাদের টাকাকড়ি ধনরত্ন গায়েব করে রেখেছে, কিন্তু তাতে তো কেউ কর্ণপাত করেই না, বরং ঐসব খবর আনার জন্যে ধমক লাগাতে থাকে দেখে, তারা অবাক হয়ে আস্তে আস্তে চুপ মেরে গিয়ে দূরে সরে গেল।

খানিক জিরিয়ে নিয়ে জেনারল কারন্যাক প্রজাদের কাছ থেকে বাদশার নামে খাজানা আদায়ের দিকে মন দিলেন। এদিক দিয়ে একটা মস্ত সুবিধা ঘটে গিয়েছিল। মহারাজা বেণীবাহাদুর ইতিপূর্বেই মনিব বদলিয়ে ইংরেজদেরই মুরুব্বি পাকড়িয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেরই

অন্ধিসন্ধি ফিকিরফন্দি হাড়হদ্দ মহারাজ-বাহাদুরের একেবারে নখাগ্রে। তাঁকে হাতে পেয়ে কারন্যাক বর্তে গেলেন। তাঁর সামনে তখন এক মস্ত বড় সমস্যা— বাদশা শা আলমের কাছে উত্তরপ্রদেশের সুবাদার করতে কাকে সুপারিশ করা যায়? এমন লোক অবশ্য চাই যিনি ইংরেজদের অনুগত হয়ে থাকবেন, তাদের বিরুদ্ধে কখনো যাবেন না। কারন্যাক ঐ পদের জন্যে মহারাজা বেণীবাহাদুরকেই সব চেয়ে উপযুক্ত লোক মনে করে তাঁর নাম কলকাতায় কাউন্সিলের কাছে লিখে পাঠালেন যাতে তাঁরা বাদশাকে সেই মতো সুপারিশ করেন।

কারন্যাক দিশি রাজা মহারাজা নবাব উজিরদের অনুকরণে মত্ত শোব-শরাবতে দিন কাটিয়ে চলেছেন, এমন সময় খবর এসে গেল, সুজাউদ্দৌলা মারাঠা সৈন্য নিয়ে তার রাজ্য উদ্ধার করতে আসছেন। হিন্দুস্থানের সর্দারদের কাছে সাহায্য চেয়ে চেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে সুজাউদ্দৌলা অবশেষে মারাঠা সর্দার মলহররাও হোলকারকে ধরে পড়লেন। টাকার লোভে মলহররাও সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। কড়ার হল, লড়াইয়ের খরচের দরুন সুজাউদ্দৌলা দৈনিক তিরিশ হাজার টাকার জোগান দিয়ে যাবেন, আর যুদ্ধশেষে মলহররাওকে নগদ পনেরো লাখ টাকা বকশিশ করবেন। সুজাউদ্দৌলা ধরেই নিয়েছিলেন যে, এইবার ইংরেজরা নিশ্চয়ই হারবে। তিরিশ হাজারের মারাঠী ফৌজ নিয়ে মলহররাও ইংরেজ তাড়াতে গেলেন। সঙ্গে চললেন সুজাউদ্দৌলা আর তার সেপাইয়ের দল, যদিও পরিমাণে সেটা তখন খুবই খাটো হয়ে এসেছে।

সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আবার লড়তে আসছেন শোনবামাত্র মহারাজা বেণীবাহাদুর সুবেদারির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাতারাতি তাঁর পুরনো মনিবের ক্যাম্পে পালিয়ে গেলেন। তখনকার মতো সুজাউদ্দৌলা তাঁকে কিছু না বললেও পরিণামে ফল যে মহারাজা-বাহাদুরের পক্ষে খুব ভালো ফলেছিল, তা আদবেই বলতে পারা যায় না। ইংরেজদের সঙ্গে পরে সুজাউদ্দৌলার একটা মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর তিনি যখন নিজেকে আবার তাঁর মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তখন তিনি বেণীবাহাদুরের উপর এর শোধ তুলেছিলেন। প্রথমে তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে সুজাউদ্দৌলা তাঁকে গারদে পুরলেন, তার পর পাছে তিনি কয়েদখানায় বসে-বসেও ইংরেজদের সঙ্গে সড় করতে থাকেন, সেই ভয়ে তাঁকে একেবারে কাজের বার করে দেবার জন্যে লোহার শিক গরম করে তাই ঢুকিয়ে তাঁর চোখ দুটো ফুটো করে দিয়ে তাঁকে জন্মের মতো অন্ধ করে ছেড়ে দিলেন।

নিতান্ত হীন অবস্থা থেকে ঐ ব্রাহ্মণসন্তান লেখাপড়া কিছু না শিখেও কেবল টনটনে কাণ্ডজ্ঞানের জোরে মুখামন্ত্রীর পদ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। এখন অদৃষ্টের ফেরে আমীর থেকে আবার ফকির হয়ে তিনি জ্যান্তে-মরা অবস্থায় কোনোক্রমে দিন কাটাতে লাগলেন।

মারাঠাদের সহায় পেয়েও সুজাউদ্দৌলা তেমন-কিছু করে উঠতে পারলেন না। প্রথমটা মারাঠারা লুটপাট করে ইংরেজদের খানিকটা বিব্রত করে তুলেছিল বটে, কিন্তু শেষটায় কানপুরের চব্বিশ মাইল দক্ষিণে কোরা বলে এক জায়গায় ইংরেজদের হাতে বেদম মার খেয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক সব ছড়িয়ে পড়ল। তারপর কল্পি বলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে তারা আর-একবার চেষ্টা করে দেখল যে, ইংরেজদের ভাগানো যায় কি না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, কল্পিতেও তারা হেরে ঢোল হয়ে গেল। তখন ল্যাজ গুটিয়ে মুখ চুন করে স্বস্থানে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। সুজাউদ্দৌলাকে আল্লার নামে ছেড়ে দিয়ে সবাই একে একে পালাল, কেউই আর তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তিনি ফরাক্কাবাদে নবাব আহমদ শা বঙ্গশের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নবাব আহমদ শা বঙ্গশ সুজাউদ্দৌলাকে লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য না করলেও তাঁকে সত্যিকার একটা সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন। সুজাউদ্দৌলাকে বুঝিয়ে বললেন, অন্যের কাছে সাহায্য নিতে গিয়ে তাঁর হাতে যে-কটা টাকা অবশিষ্ট আছে তা সবই যাবে, কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হবে না। ভাড়া-করা সেপাইরা মুখে দেখাবে যে নবাবের জন্যে তারা যেন মরে আছে, কিন্তু কাজের বেলায় যে কাণ্ড করবে তাতে নবাব-বাহাদুরের মুখ একটুও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। তার পর এই উপদেশ দিলেন—যদি লড়াই করার ইচ্ছা আপনার এখনো থাকে, তাহলে এমন খানিক সৈন্য সংগ্রহ করুন যাদের উপর আপনি সত্যি সত্যি নির্ভর করতে পারেন। তাদের নিয়েই লড়ে দেখুন, অদৃষ্ট ভালো থাকলে তাতেই হয়তো জিতে বেরিয়ে আসতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে, আর লড়তে যাওয়াটা নিতান্ত গোঁয়ারতুমির কাজ হবে, তাহলে কাউকে মধ্যস্থ না মেনে আপনি নিজেই সোজা ইংরেজদের কাছে চলে যান। লোকপরম্পরায় যা শোনা গেছে তাতে তো এই মনে হয় যে, ইংরেজদের কাছে গেলে তারা আপনাকে অন্তত প্রাণে মেরে বসবে না, বরং আপনার মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তারা সসম্মানেই গ্রহণ করবে। আপনার হাতে টাকাকড়ি যেটুকু আছে তাও তারা কেড়েকুড়ে নেবে না, বরঞ্চ যদি

আপনি তাদেরই উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেন, তাহলে তারা সেটা রক্ষা করবারই চেষ্টা করবে।

সুজাউদ্দৌলা আহমদ শা বঙ্গশের কথাটা ভালো করেই ভেবে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যে সব বড-বড সর্দারের কাছে তিনি আনুকূল্য ভিক্ষা করে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সবাই একে-একে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন সুজাউদ্দৌলা স্থির করে ফেললেন, তিনি আহমদ শা বঙ্গশেরই উপদেশ মতো চলবেন। তাই ঠিক করে তিনি ইংরেজ কমাণ্ডারের কাছ থেকে কোনোরকম আশ্বাস না চেয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বঙ্গশ যা বলেছিলেন ঠিক তাই হল। কারন্যাক অত্যন্ত সমাদর করেই সুজাউদ্দৌলাকে গ্রহণ করলেন, মন দিয়েই তাঁর প্রত্যেকটি কথা স্থির হয়ে শুনলেন। আলাপ আলোচনার ফলে মিটমাটের কথা অনেকটা দূর এগোল বটে, কিন্তু সেখানেই নিষ্পত্তি করে ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলতে কারন্যাক পারলেন না। ক্লাইভ শিগ্‌গিরই ওদিকে আসছেন, শেষকথাটা তাঁরই জন্যে তোলা রইল। ক্লাইভ না এসে পড়া পর্যন্ত সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদেরই ক্যাম্পে বাস করতে লাগলেন।

ক্লাইভ ১লা অগস্ট (১৭৬৫) কাশীতে এসে নামলেন। ইংরেজ সেপাই-পল্টন উনিশ বার তোপ ছুঁড়ে রাজকীয় সম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার পর তিনি সুজাউদ্দৌলাকে নিয়ে কনফারেন্সে বসলেন। চটপট কাজ সারতে ক্লাইভের মতো ওস্তাদ খুবই কম ছিল। তিন দিনের মধ্যে তিনি সমস্ত ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করে ফেললেন। দেশী লোকেরা তো অবাক বনে গেল। অত বড একটা মহাযজ্ঞের ব্যাপার অত সহজেই সারা হয়ে গেল? তিন দিন কেন, তিন মাস লাগলেও তারা একটুও আশ্চর্য হত না। কিন্তু কোনো কাজ আধাখেঁচড়া করে রাখাটা ক্লাইভের ধাতে একেবারেই সইত না।

সুজাউদ্দৌলাকে তার রাজত্বের প্রায় সবটাই ফেরত দেওয়া হল। কেবল এলাহাবাদ আর কোরা—এই দুটো জেলা—বাদশা শা আলমের খাসে রাখা হল। তাতে সুজাউদ্দৌলার বলবার অবশ্য কিছুই ছিল না, কারণ ঐ দুটো অঞ্চল এক সময় তাঁর নিকট-আত্মীয় মহম্মদ কুলী খাঁরই জাইগিরভুক্ত ছিল, তাঁর কাছ থেকেই তো ছল করে সুজাউদ্দৌলা সেটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কাশীরাজ বলবন্তসিংও কদিনেই ইংরেজদের খুব অনুগত হয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁরও বুঝতে বাকি ছিল না, সংসারযাত্রায় তরিয়ে দেবার মালিক হয়েছেন এখন ইংরেজরাই। কারন্যাক ক্লাইভকে বলে-কয়ে তাঁর রাজত্ব সুজাউদ্দৌলার অধিকার থেকে বার করিয়ে দিলেন। সুজাউদ্দৌলা যা পেলেন তা তাঁর

আশার অতীত। তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাবার ভরসা করেই অতটা এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বটে, কিন্তু অতটা রাজ্য যে আবার ফেরত পাবেন, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। একটুও কোনো ওজর-আপত্তি না তুলে, তিলমাত্র কথা-কাটাকাটি না করে, ক্লাইভ যা যা বললেন সবই সন্তুষ্টচিত্তে তিনি মেনে নিলেন। এমন কি যুদ্ধের খেসারতের অঙ্ক নিয়েও তিনি দরকষাকষি করলেন না, এক কথায় পঞ্চাশ লাখ টাকা বের করে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। কেবল একটা বিষয়ে সুজাউদ্দৌলা একেবারে অটল অচল রইলেন। তাঁর এলাকার মধ্যে তিনি ইংরেজদের ব্যবসার কুঠি খুলতে দিতে একেবারে নারাজ। তিনি জানতেন, ইংরেজদের কুঠি খোলা মানে একটা ছোট-খাটো রাজত্ব বসানো। সব নষ্টের মূল ঐ কুঠিবাড়ি। ইংরেজদের ঐ প্রস্তাবে সুজাউদ্দৌলাকে যখন কিছুতেই লওয়ানো গেল না তখন অগত্যা ক্লাইভের মতো লোককেও ঐ প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিতে হল।

লড়াইয়ে হারানোর চেয়ে লড়াই জেতবার পরও শত্রুকে ক্ষমা করলে তাকে যে কতটা বেশি বশে আনা যায়, কতটা বেশি আপন করতে পারা যায়, তার এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সুজাউদ্দৌলা। ইংরেজদের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সুজাউদ্দৌলা সেই যে সেদিন থেকে ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন সে-আনুগত্য তাঁর মৃত্যুকাল (২৬শে জানুয়ারী ১৭৭৫) পর্যন্ত পুরো বজায় ছিল। মাঝে মাঝে সুজাউদ্দৌলা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন বলে ইংরেজরা সন্দেহ করলেও, সে-সন্দেহের সত্যিকার কোনো ভিত্তি ছিল না। কিন্তু সে যাই হোক, এতে যে তাঁর নিজের চরিত্রের কোনো উন্নতি হয়েছিল, তা কিন্তু বলতে পারা যায় না, কারণ সুজাউদ্দৌলা নিজের রাজত্বে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে তাঁর আশেপাশের সর্দারদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের হারিয়ে দেবার পরও তাঁদের প্রতি যে আচরণ করেছিলেন তাকে কিছুতেই সদাচারের পর্যায়ে টেনে এনে ফেলতে পারা যায় না।

অনেকে অনুমান করেন যে, তার কারণ হচ্ছে আর কিছু নয়, ইংরেজদের ঐ উদারতাটা আসলে খাঁটি সোনা ছিল না, তাতে ডিপ্লোম্যাসীর খাদ অনেক পরিমাণে মেশানো ছিল। তাঁরা বলেন, ক্লাইভ তাঁর দূরদৃষ্টির দরুন বেশ বুঝেছিলেন যে, সুবে বাংলাকে মারাঠাদের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে উত্তর-প্রদেশকে একটা বাফার স্টেটে পরিণত না করলেই নয়, আর ঐ বাফার স্টেট ভালো করে চালাবার শক্তি ধরেন একমাত্র নবাব সুজাউদ্দৌলা। ইংরেজরা

তখনো সুবে বাংলায় নিজেদের কোর্ট ছেড়ে খুব বেশি দূর অগ্রসর হবার জন্যে তৈরি হয়ে ওঠেনি। ক্লাইভের উদ্দেশ্য সত্যি সত্যিই যদি তাই ছিল, তাহলে তাঁর ঐ মতলব যে হাসিল হয়েছিল সে-কথা বলতেই হয়। কারণ, সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব থাকায় মারাঠারা বঙ্গদেশে ঢুকে ইংরেজদের উপর কোনো উৎপাত করতে পারেনি। যখন তাদের সঙ্গে ইংরেজদের উত্তরাপথ দক্ষিণাপথ দু-পথেই সংঘর্ষ উপস্থিত হল তখন কোথায় ক্লাইভ আর কোথায়-বা সুজাউদ্দৌলা? ইংরেজরা নিজেই তখন সর্বত্র এমন জোরালো হয়ে উঠেছে যে, প্রবল পরাক্রান্ত হয়েও মারাঠারা তাদের কোথাও একচুলও হটাতে পারেনি। তবুও একটা কথা থেকে যায়। আসলে তখন এদেশের লোককে সদ্ব্যবহার দিয়ে বশ করা যেত না। দয়া করাকে তারা মনে করত দুর্বলতার লক্ষণ। তারা বশ হত হয় ভয়ে, নয় স্বার্থের খাতিরে। অবশ্য দু-চারজন এমন পাওয়া যেত যারা এর ব্যতিক্রম, কিন্তু প্রায় সবাই ছিল ঐ রকমই। সুতরাং সুজাউদ্দৌলা যে তাঁর প্রতিবেশী সর্দারদের মারকাট করে ভয় দেখিয়ে, কি টাকার লোভ দেখিয়ে, বশে রাখার চেষ্টা করবেন তাতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই।

সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কাজ শেষ করে ক্লাইভ বাদশা শা আলমের সঙ্গে দেখা করার জন্যে কাশী ছেড়ে এলাহাবাদ যাত্রা করলেন। বাদশা তখন সেইখানে অবস্থান করছেন। ইংরেজরা সুজাউদ্দৌলাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন শুনে বাদশা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন না, কারণ উত্তর-প্রদেশের সুবেদারির সমস্তটাই তিনি নিজের হাতে রাখতেই চেয়েছিলেন, আর কাউকে যে ওটা দেওয়া হয়, সেটা তাঁর একটুও মনোগত ছিল না। কিন্তু তিনি করবেন কি? তাঁর না আছে জনবল, না আছে ধনবল। নামে বাদশা হলেও কাজে ফকিরেরও অধম। ইংরেজদের বন্দোবস্তে রাজী না হয়ে উপায় কি? যে-রোগ সারবার নয় তাকে তো মুখ বুজে সয়ে যেতেই হয়। শা আলমকে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ আর কোরা অঞ্চল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। যাই হোক, ঐ দুই জেলার আয়ও বড় ফেলনা যায় না—বছরে আটাশ লাখ টাকা।

তার পর উঠল সুবে বাংলার দেওয়ানির কথা। ব্যাপারটা জটিল বলে তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দরকার। পুরাকালে যখন মোগল সম্রাটরা বেশ বলবান ছিলেন তখন তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের সুবেদারিতে যাঁকে বসাতেন তাঁকে সেই প্রদেশের রাজস্বের আদায়-অনাদায়ের ভার দিতেন না। সে-ভার যাঁর উপর চাপাতেন

তাঁর সরকারী নাম হত দেওয়ান। সুবেদারের কাজ ছিল সুবার অ্যাড্‌মিনিস-ট্রেশন চালানো আর দেওয়ানের কাজ ছিল তার খরচ জোগানো। মালগুজারির টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে তাঁর প্রথম কর্তব্য ছিল রাজস্ব থেকে বাদশার প্রাপ্য অংশ দিল্লিতে পাঠানো, তার পর বাকি টাকা থেকে সুবাদারের মাইনে চোকানো আর তাঁর সরকারের খরচ মেটানো। বাকি যা থাকত সেটা দেওয়ানজীর নিজের পকেটেই যেত। কাজের ঐ ভাগ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য ছিল যাতে সুবেদার বা দেওয়ানের কারো যেন অতিবাড় না হয়, একজন যেন অন্যজনের উপর ব্রেক কষতে পারেন। তাছাড়া আরো-একটা বাদশাহী রীতি ছিল, সুবেদার দেওয়ান কাউকেই বেশিদিন একই প্রদেশে না-রাখা। বড-বড রাজকর্মচারীদের দাবিয়ে রাখার ওটাও ছিল একটা মস্ত উপায়। বাদশা আওরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা মোটের উপর মন্দ চলেনি।

কিন্তু আওরংজীবের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য চারদিক থেকে ভেঙে পডতে লাগল। তখন বিভিন্ন প্রদেশের সুবেদাররা নবাব হয়ে বসে স্বাধীনভাবে চলতে-ফিরতে লাগলেন। তাঁরা দিল্লিব বাদশাকে কখনো সামান্য-কিছু রাজস্ব পাঠান, কখনো আবার একেবারেই কিছু দেন না। ঐ-রকম করেই দিন চলছিল। দিল্লীশ্বরের তখন এমন সামর্থ্য ছিল না যে, প্রদেশে-প্রদেশে—বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো এক সুদূর প্রান্তে—সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে ঐসব নবাবকে শায়েস্তা করেন। সেই সময় থেকেই নিজেদের সুবেদারির মধ্যে রাজস্ব আদায়ের ভার নবাবরা নিজেদেরই হাতে তুলে নিলেন। ঘর-সর্বস্ব নিজের আর তার চাবিকাঠিটা হবে অন্যের—এই রকম ডিভিসন অভ্‌ লেবার—নবাবরা আদবেই মানতে রাজী ছিলেন না। সুতরাং প্রদেশে-প্রদেশে সম্রাটের দেওয়ান পাঠানোর ব্যবস্থাটা একেবারেই উঠেই গেল।

বঙ্গদেশে ঐ কাণ্ডটা ঘটিয়েছিলেন, নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ। তিনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। সেই থেকে দিল্লির বাদশারা না পেরেছেন এখানকার সুবেদার কি দেওয়ান নিযুক্ত করতে, না পেরেছেন নিয়মমতো নিজেদের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করতে। তাই পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জিততে দেখে, বাদশা আলমগীর শানির উজির ঘাজীউদ্দীন মনে করলেন, ইংরেজ কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করে দিলে দিল্লির বাদশার রাজকর ঠিকঠাক আদায়ের আর কোনো ভাবনা থাকবে না, কারণ ইংরেজদের একটা গুণ আছে যে, তারা তাদের কড়ার মতো দেয়টা কড়ায়-গণ্ডায় ঠিক চুকিয়ে দেয়। তিনি

ক্লাইভকে কোম্পানীর তরফ থেকে বাংলার দেওযানি দেবাব এক প্রস্তাব করে পাঠালেন। অবশ্য সেটা বাদশার উপর টানের দরুন যে নয়—নিজেরই পেট পোরাবার জন্যে—সেটা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না।

ক্লাইভের মনে তখন এক মস্ত বড় আকাঙ্খা। তিনি চেয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ডের রাজা যেন স্বহে বাংলার রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নেন। তাহলে এদেশের ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের সমস্ত খরচ বৃটিশ গভর্মেন্টই জুগিয়ে যাবেন, কোম্পানীর কাছ থেকে টিপে টিপে টাকা আদাযের অসুবিধা আর থাকবে না। ঐ নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট্‌কে লিখেও ছিলেন। তাই ফট্‌ করে তখন উজিরের কথায় দেওযানি নিযে তাঁর সমস্ত প্ল্যান মাটি করতে তিনি রাজী হননি। তাছাড়া কোম্পানী দেওয়ানি নিলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের পদে-পদে রেযারিষি মন-কষাকষি চলতে থাকবে, সে ভয়ও ছিল। যতক্ষণ ক্লাইভের পেটোয়া মীর জাফর বাংলার নবাব হয়ে আছেন ততক্ষণ নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের কোনো বিরোধ ঘটে, সেটা ক্লাইভের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং কথাটা তখনকার মতো ধামাচাপা পড়ে যায়।

১৭৬১ সালে কথাটা আবার উঠিয়েছিলেন বাদশা শা আলম নিজে, যখন তিনি পাটনায বসে বাংলার নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব নিয়ে দর কষছিলেন। হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট তখন কলকাতায় ইংরেজ গভর্নর। কোম্পানীর দেওযানি নেওয়ায় মীর কাশিমের যে বিষম আপত্তি, সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন, তাই বাদশাকে খুশি করে তাঁর কাছ থেকে দেওয়ানি নিয়ে, নির্বিবাদী ভ্যান্‌সিটার্ট মীর কাশিমের সঙ্গে ঐ বাবদ একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করতে কিছুতেই এগোলেন না। ক্লাইভ যেমন ঐ বিষয় নিয়ে মীর জাফরকে ঘাঁটাতে গররাজী হযেছিলেন, ভ্যানসিটার্টও মীর কাশিমের খাতিরে ঠিক তাই হলেন। তার উপর ভালোমানুষ ভ্যান্‌সিটার্ট একটু ভীতু মানুষ, আর দেওয়ানগিরিরও অনেক ঝকমারি, অনেক ফ্যাসাদ। তার ঝক্কি-ঝামেলা সামলানো তাঁর কর্ম নয়। ওদিকে কোম্পানীর ডিরেক্টররাও কথাটা শুনে, ডেস্‌প্যাচ লিখে তাঁদের এদেশস্থ কর্মচারীদের স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, জমিদারি জাইগিরদারি দেওয়ানি—ওসবে তাঁদের হাত দিতে যাওয়া অত্যন্ত মূর্খামির কাজ হবে। ওসব তাঁরা জানেনও না, বোঝেনও না। তাঁরা যা বোঝেন সেই ব্যবসা যদি তাঁদের কর্মচারীরা মন দিয়ে চালিয়ে যান, তাহলেই তাঁরা সন্তুষ্ট, আর-কিছু তাঁরা চান না।

কিন্তু বক্‌সারের যুদ্ধের পর চাকা গেল একেবারে ঘুরে। এক সময়

ইংরেজরা হাতে পেয়েও যা পায়ে ঠেলেছিল, সেটাই এখন ফিরে পাবার জন্যে তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা গেল। এর একটা কারণ ছিল। বাংলার রাজত্ব বৃটিশ গভর্মেণ্টের নিজের হাতে নেবার কোনোই সম্ভাবনা নেই দেখে, ক্লাইভ মন্দের ভালো মনে করে বাংলাব দেওয়ানিটাই কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার দিকে মন লাগালেন। ডিরেক্টররা তখন সবাই প্রায় তাঁর হাতের লোক, তাঁদের দিক থেকে এ-সম্পর্কে পুর্বের মতো কোনো আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। ওদিকে বাংলার নবাব নজমউদ্দৌলা বুদ্ধিবিবেচনাহীন একটা অপোগণ্ড মাত্র। ইয়ারবর্গের মজলিশে তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেন, শতপানেক কসবী বাইজী রাখার মতো খরচের টাকা হাতে পেলে তিনি আর-কিছু চান না। আগের মতো এখন নবাবের তোয়াক্কা রাখারও কোনো দরকারই ইংরেজদের আর রইল না। সুতরাং এখন দেওয়ানি হাতে নিতে কি আর আপত্তি থাকতে পারে? ববং সেটা নেবার জন্যে খানিকটা ঝোঁক হবারই কথা।

তাই শা আলম কোম্পানীকে দেওয়ানি দেবার প্রস্তাব করতেই ক্লাইভ সেটা লুফে নিলেন। কিন্তু দরকষাকষি করতেও ছাড়লেন না। বাদশা চান, বছবে বত্রিশ লাখ, ক্লাইভ হাঁকেন, কুড়ি লাখ। বাদশার তখন চাল নেই চুলো নেই, নিতান্তই পড়ন্ত অবস্থা। তিনি কতক্ষণই বা যুঝবেন? অবশেষে কারন্যাক ক্লাইভকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওটাকে ছাব্বিশ লাখে দাঁড় করালেন। কারন্যাক অবশ্য কাজটা অমনি-অমনি করেননি, বাদশার ঐ দীনহীন অবস্থাতেও তাঁর কাচ থেকে দু-লাখ টাকা বকশিশ আদায় কবেছিলেন। তার আগে কাশীরাজ বলবন্তসিং-এর কাছ থেকেও পঞ্চাশ হাজার জোগাড হয়েছিল। এরকম টাকা নেওযা কোম্পানীর হালে পাশ-করা নিয়মের বিরুদ্ধে গেলেও কারন্যাক সব টাকাটাই হজম করতে পেরেছিলেন, পাইপয়সাটুকুও তাঁকে উগরে দিতে হয়নি। খুঁটির জোর যে-ব্যক্তির আছে তার কাছে আইন-কানুনের দোহাই দিয়ে কি কাজ? চক্ষুলজ্জাটুকুও তার না থাকলে চলে, লোকে তাকে কিছু বলতেই সাহস পায় না। যেখানে ক্লাইভের মতো মহাপুরুষ কারো মুরুব্বি সেখানে তাঁর তো একদম সাতখুন মাফ। কোম্পানীর ডিরেক্টররা প্রধানতঃ বাংলাদেশের দুর্নীতির জঞ্জাল সাফ করবার জন্যেই ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার গভর্নর করে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর ন মাস গভর্নরি করে ক্লাইভ যখন দেশে ফিরে গেলেন তখন দেখা গেল, জঞ্জাল যা ছিল, তার চতুর্গুণ বেড়েই গেছে। বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করবার

এযাবৎ নেহাৎ কম হয়নি, কিন্তু ফল তো কোনো কালেই তেমন-কিছু ফলল না—না তখন, না এখন।

১২ই অগস্ট ১৭৬৫। বাদশা শা আলম পারিষদবর্গ নিয়ে ইংরেজদের ছাউনিতে উপস্থিত হলেন। দিল্লির তখ্‌ৎ-ই-তাউসের বদলে আবার একটা ডাইনিং টেব্‌ল টেনে বের করে তার উপর একটা চেয়ার পেতে বাদশার বসবার মসনদ করা হয়েছে। তাতেই বসে বাদশা শা আলম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ ক্লাইভের হাতে তুলে দিলেন। মোগলাই রেওয়াজ মাফিক লর্ড ক্লাইভ তিন তিন বার কুর্নিশ করে সেটা মাথায় তুলে ধরলেন। সুবে বাংলার ভাঁড়ারের চাবি অবশেষে ইংরেজদেরই হাতে গিয়ে পড়ল। কিন্তু শা আলম যে-ভরসায় দেওয়ানি কোম্পানীকে লিখে দিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। তিনি ভেবেছিলেন, দেওয়ানি হাতে পেলে ইংরেজরা তাঁর প্রাপ্য টাকা ঠিকঠাক দিয়ে যাবে। গোড়ার কবছর তিনি নিয়মিত পেয়েও ছিলেন ঠিক, কিন্তু তার পর পুরো টাকাটা আর কখনো পাননি। একটা-না-একটা ওজর আপত্তি তুলে সেটাকে ক্রমাগতই কমানো হতে থাকে, অনেক সাধ্য-সাধনা করলেও আর বাড়ে না। ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে ঐ টাকা পাওয়া নিয়ে দরবার করার জন্যে নানা উপহারদ্রব্য আর টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়ে শা আলম যে ইংরেজকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, সে-দূতের হাত থেকে সে-টাকা ক্লাইভ নিজেই বাগিয়ে নিয়েছিলেন। শা আলমের পাঠানো জিনিস তিনি নিজের নাম করেই ইংল্যাণ্ডের রাজা-রানীকে উপহার দিয়েছিলেন। শা আলমের কাজ যে উদ্ধার হয়নি, সে কথা না বললেও চলে। তবে একথা বলতেই হয় যে, ইংরেজরা দেয় টাকার তবু খানিক-খানিক দিয়ে গিয়েছিল, একেবারে মূলে হাবাত করেনি। নিতান্ত বেকায়দায় না পড়লে এ-দেশীয় নবাব-সুবেদার-বাহাদুররা তো কেউই কখনো ইচ্ছাসুখে একটা কানাকড়িও তাঁর হাতে ঠেকাননি।

যাই হোক, দেওয়ানি পাবার পর থেকেই শুধু বাংলাদেশে নয়, এক এক করে সারা ভারতেই, ইংরেজদের আস্তে আস্তে এমনই শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল যে, যতদিন না তারা এদেশের কর্তৃত্ব একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ততদিন পর্যন্ত সেই শ্রী অক্ষুণ্ণই রইল। সেই সঙ্গে ঐ শ্রীবৃদ্ধির ফলভোগ ইংল্যাণ্ডও যা করেছিল তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়।

॥ বত্রিশ ॥

পুরো এক যুগ পরের কথা। ৭ই জুন ১৭৭৭ সাল। দিল্লির থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে আগ্রার কাছ-বরাবর একটা ছোট্টো শহর। শহরের বাইরে রাস্তার ধারে একটা শতছিদ্র তাঁবুর মধ্যে অত্যন্ত হীন অবস্থায় একটি লোকের মৃত্যু হল। কে বলবে যে ঐ লোকই একদিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন? সে-দিনকার ক্রোড়-ক্রোড় টাকার মালিক আজ একেবারেই নিঃস্ব ফকির। শব-জড়াবার নতুন কাপড়টুকু কেনবার মতো পয়সাও ঘরে নেই। শেষ সম্বল গায়ের পুরনো শালখানা বিক্রি করে সৎকারের খরচ জোগাড় করতে হল। নামহীন নিশানহীন সামান্য একটা কুৎসিত কবরে তাঁর গোর হয়ে গেল। সে-কবর যে কোথায়, তা আজ আর কেউই দেখিয়ে দিতে পারে না—কেউই তা আজ জানেও না, চেনেও না।

বক্‌সার থেকে পালিয়ে মীর কাশিম ঘুরতে ঘুরতে কোনোক্রমে রোহিলখণ্ডে গিয়ে উঠলেন। তখনো তাঁর হাতে কিছু টাকা আর সোনাদানাও খানিক অবশিষ্ট ছিল। তাই বিলিয়ে তিনি হিন্দুস্থানের সর্দারদের একজোট করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা দল খাড়া করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই এ-কাজে পা বাড়াতে চাইলেন না। মীর কাশিম দক্ষিণদেশ থেকে নিজাম আর মারাঠাদেরও ডাক দিলেন, কিন্তু তাঁরাও কোনো সাড়া দিলেন না। অবশেষে তিনি দুরানীরাজ আহ্‌মদ শা আবদালীর শরণাপন্ন হয়েও বিফলমনোরথ হয়ে ফিরলেন। হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, সোনাদানা সবই বিক্রি হয়ে গেল, সহচরেরা প্রায় সবাই তাঁকে ছেড়ে অন্য আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু মীর কাশিম তবুও দমে গেলেন না। তিনি ছক কেটে গণনা করে জেনেছিলেন, ভাগ্য তাঁর শিগ্‌গিরই ফিরছে। তিনি নিশ্চয়ই আবার বাংলার নবাবী মসনদ ফিরে পাবেন, এমন কি বাদশাহী তখ্‌তে বসাটাও তাঁর পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। অত বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তাঁর এ-বুদ্ধিটুকু হল না যে, বিধাতার অমোঘ বিধানের কাছে গ্রহ-নক্ষত্রের তুষ্টি-রুষ্টিতে কি-বা আসে যায়? আশার নেশায় মশগুল হয়ে পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে মীর কাশিম বারো বছর ধরে সারা হিন্দুস্থান চষে

ফেললেন, কিন্তু একটুও কোনো উপায় বের করে উঠতে পারলেন না। দৈন্যদশা একেবারে চরমে উঠল। ভাগ্যে নজফ্ খাঁ তাঁর পূর্বেকার মনিবের জন্যে ঐ অসময়ে সামান্যরকমের একটা পেনসন জোগাড় করে দিতে পেরেছিলেন, নইলে তাঁকে একেবারে অনাহারে শুকিয়েই মরতে হত।

অবশেষে দিল্লির দরবারে একটু স্থান পাবার জন্যে মীর কাশিম শা আলমকে ধরে পড়লেন। কাকুতি-মিনতি করে গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁকে একখানা আর্জি লিখেও পাঠালেন, কিন্তু বাদশা তাতে কান পাতলেন না। শা আলম তখন ইংরেজদের বলে বলে হয়রান হয়ে গিয়ে শেষে মারাঠাদের উপর ভর করে এলাহাবাদ থেকে দিল্লিতে এসে বসেছেন। ইংরেজদের উপর তাঁর মনটা খুব প্রসন্ন না থাকলেও তিনি তাদের ঘোর শত্রু মীর কাশিমকে ঠাঁই দিয়ে তাদের আর ঘাঁটাতে চাইলেন না। বাদশার পারিষদবর্গের প্রায় সবাই অপদার্থের দল, তাঁরাও মীর কাশিমের মতো এক কর্মিতকর্মা ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্যে টেনে আনাটা আদবেই সুবুদ্ধির কাজ হবে বলে বিবেচনা করলেন না, সুতরাং তাঁরা বাদশাকে এ-বিষয়ে একটুও উৎসাহ তো দিলেনই না, বরং নানারকম বাধারই সৃষ্টি করতে লাগলেন। মীর কাশিম তাই আর দিল্লিতে ঢোকার সাহস না পেয়ে তার খানিকটা দূরেই আত্মগোপন করে রইলেন। মজদ্উদ্দৌলা বলে এক উপমন্ত্রী যে টাকার লোভে তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যে ফিকিরফন্দি করতে লেগে গেছেন, সে-কথা মীর কাশিমের অজ্ঞাত ছিল না।

কোথাও কোনো উপায় করতে না পেরে মীর কাশিম শেষে ইংরেজদেরই সঙ্গে আবার ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংরেজদের তখন বোল-বোলাও অবস্থা। ক্লাইভের দো-ভাগা শাসনপদ্ধতি, অর্থাৎ দেশী আবরণের আড়ালে বিলিতী রাজত্ব, ধোপে না টেঁকায়, ইংরেজরা তখন প্রকাশ্যেই দেওয়ানগিরির নামে বঙ্গদেশ শাসন করতে শুরু করে দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় বাংলার রাজধানী উঠে এসেছে। রাজস্ব আদায়ের ভার দিশি নায়েবদের উপর ছেড়ে দিয়ে আর নিশ্চিন্ত না থেকে, ইংরেজরা সেটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়াতে আয়ও বেড়েছে, প্রজাদেরও খানিকটা সুবিধা ঘটেছে। মহম্মদ রেজা খাঁর অত্যাচারের হাত এড়াতে পেরে তারা একটু নিশ্চিন্তেই বসবাস করতে পারছে। তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক খিদের জ্বালায় মরে গিয়ে দেশের ভার অনেকটা লাঘব করে দিয়ে বাকিদের জন্যে একটু সুবিধাই করে দিয়ে গেছে।

মীর কাশিম গভর্নর-জেনারল হেস্টিংসকে বেশ নরম করেই একটা চিঠি দিলেন। তাতে নিজের দোষক্ষালনের জন্যে সমস্ত দোষত্রুটি মীর জাফরের ঘাড়ে চাপালেন। গণনার ফলে তখনো তাঁর মনে প্রচণ্ড ভরসা, এইবার একটা-কিছু সুবাহা নিশ্চয়ই হবে। এক সময় গভর্নর ভ্যানসিটার্টের দিকে থাকায় হেস্টিংস মীর কাশিমেরও সহায় হয়েছিলেন। কিন্তু এখন তো তিনি একটা কাউন্সিলর নন, মহামান্য গভর্নর-জেনারল। তাই মনে মনে তাঁর যাই থাকুক, বাইরে তিনি ইংরেজ জনমতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পেলেন না। মীর কাশিমের চিঠির কোনো জবাবই তিনি দিলেন না।

সর্বত্র হতাশ হয়ে অর্থাভাবে ঘোর দৈন্যে দিন কাটিয়ে মীর কাশিম শেষে রোগে পড়লেন। দুর্দশার আর অন্ত নেই। বছরখানেক ধরে রোগশয্যায় পড়ে পড়ে মীর কাশিম অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করলেন। শেষে একদিন গভীর রাত্রে মৃত্যু সদয় হয়ে চুপিচুপি এসে তাঁর সর্বাঙ্গে তার স্নিগ্ধ-শীতল হাত বুলিয়ে, তাঁর ইহলোকের সব দুঃখকষ্টের সমস্ত শোকতাপের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে গেল।